উপেন্দ্রকিশোর-১৫০

বৈশাখ ১৪২০

সন্দেশ

৺উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত।

সম্পাদক সন্দীপ রায়

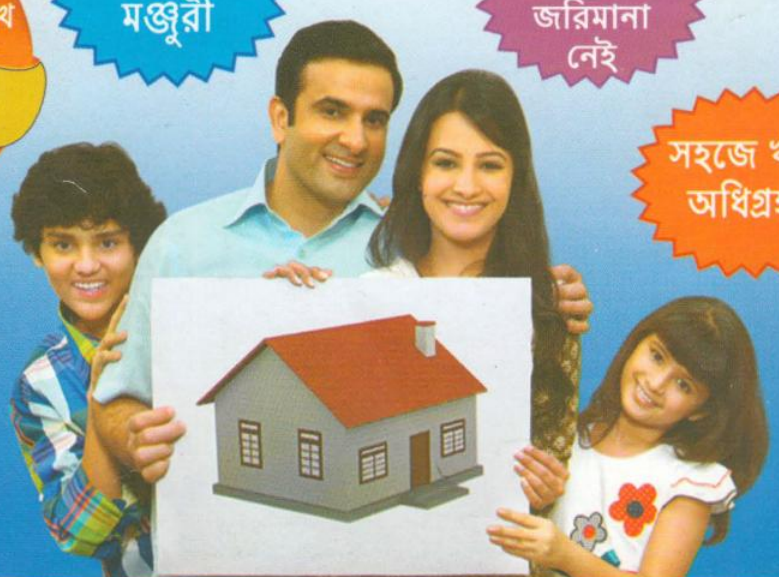

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যাঙ্কার
শুভ নববর্ষ
১৪২০
গৃহ ঋণ
@9.95%* বার্ষিক
সর্বনিম্ন ইএমআই প্রতি লাখে
₹ 874
দ্রুত মঞ্জুরী
অগ্রিম পরিশোধে জরিমানা নেই
সহজে ঋণ অধিগ্রহন
GRIHA SANDHAN
an initiative for easy housing
আমাদের অনুমোদিত প্রকল্প সম্বন্ধে জানবার জন্য নির্বাচিত শাখায় 'গৃহসন্ধান' কিয়স্ক পরিদর্শন করুন।
আমাদের দ্বারা অনুমোদিত ১৬৯ টি খ্যাতিসম্পন্ন গৃহ প্রকল্পের থেকে দ্রুত অনুমোদনের জন্য আপনার নিজস্ব বাড়ী নির্বাচন করুন। বিষদ বিবরনের জন্য ১৮০০ ৩৪৫ ৬৫৬৪ টোল ফ্রী নম্বরে ফোন করুন।
Koelcompr/13-14

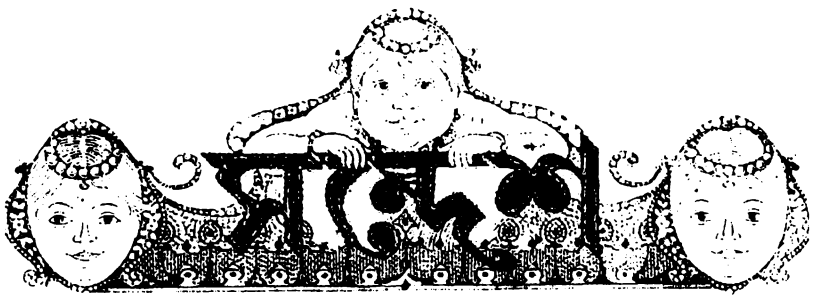

নববর্ষ সংখ্যা ১৪২০

তৃতীয় পর্যায় ● বর্ষ-৫৩

মে- জুলাই ২০১৩ ● বৈশাখ - আষাঢ় ১৪২০

উপেন্দ্রকিশোর ১৫০

উপেন্দ্রকিশোর / প্রণব মুখোপাধ্যায় ৩

উপেন্দ্রকিশোর রায়ের কথা/ সুবিমল রায় ৪

উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেবেলা/ প্রসাদরঞ্জন রায় ১৫

চিত্রশিল্পী উপেন্দ্রকিশোর এবং মুদ্রণশিল্পী ইউ.রে./ শুভেন্দু দাশমুন্সী ১৮

অন্য উপেন্দ্রকিশোর / শ্রী কাকেশ্বর কুচকুচে ২০

পুরাণকথার চিরকালীন কথক/দেবাশিস সেন ২৩

মহাপুরুষ উপেন্দ্রকিশোর / যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২৭

টুনটুনি আর হিয়ামনের গপ্পো/ নবনীতা দেব সেন ৩১

মজন্তালির মজার কথা/সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত ৩৪

ধারাবাহিক উপন্যাস

নীল পাথর / শুভ্র দত্ত ৪০

বুরুন্ডির সবুজ মানুষ / হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত ৬৭

গল্প

খুলি/ রাজেশ বসু ৪৬

পুতুলের বাড়ি/রমেন গাঙ্গুলী ৫৩

বারোমাস / অরুণিমা রায়চৌধুরী ৫৬

শ্যামাপদবাবুর ভূতের গল্প/আশিস কর্মকার ৫৮

জি এম/ বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪

কাগজ ফুলের গাছ/ ভবানীপ্রসাদ দে ৭৪

জল ছেড়ে/ শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ৮৫

প্রবন্ধ ফিচার

সমীর সরকার/ দেবব্রত ঘোষ ৩০

ভালো ভূতেদের গল্প /ঈশা দাশগুপ্ত ৭৮

খেলা

সাঁতারের সোনার মেয়ে নাটালি দ্যু তয়/ পরিমল রায় ৮৩

খবরাখবর / প্রবাল সেন ৮৮ , ৯১

ছড়া কবিতা

রেললাইনের হাতি/ অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ৫২

মধুর হাসি / নারায়ণ আচার্য ৫২

ইলিশ ইলিশ/ পঙ্কজ সাহা ৭৭

কথা ছিলো/ দীপঙ্কর বিশ্বাস ৭৭

টুংটাং/ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

দামোদরের বালুতীরে/ জীবন সর্দার ৮৯

নববর্ষের চিঠি ১৪

বই চেনো ৯২

বার্ষিক সূচী ৯৪

প্রচ্ছদ : সুকুমার রায়

সম্পাদক : সন্দীপ রায়

সহ-সম্পাদক : প্রণব মুখোপাধ্যায়

ছবি এঁকেছেন : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, হর্ষমোহন চট্টরাজ, সুদীপ্ত দত্ত ও রাহুল মজুমদার

সন্দেশ কার্যালয়-১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০২৯ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
শ্রী সমীর রায়, নীলাঞ্জনা এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা -৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

স্বত্বাধিকারী - সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড
যোগাযোগ : ১৯, বিপিন পাল রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৬ মো : ৯৮৩৬২৫০৮২৯

দারুণ খবর

শারদীয়া সংখ্যায় থাকছে 'ভূত ভবিষ্যৎ'-এর চিত্রনাট্য।
লিখেছেন তোমাদের সম্পাদক স্বয়ং।

আরও দারুণ খবর

আগামী ২৮-৩১শে ডিসেম্বর সন্দেশের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন হতে চলেছে নন্দনে।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
এসো ভাই বসো ভাই
জগদানন্দ রায়
বাংলার পাখি ১০০.০০
১০০.০০
দীনেশচন্দ্র সেন
রামায়ণী কথা ১০০.০০
এডওয়ার্ড লিয়র
তাজ্জবি সব কাণ্ড ৫০.০০

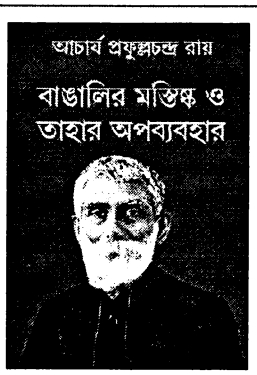

প্রফুল্লচন্দ্র রায়
বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার ৪০.০০
জগদীশচন্দ্র বসু
অব্যক্ত ১৫০.০০
অতুলপ্রসাদ সেন
গীতিগুঞ্জ ১৫০.০০
রোহিণীনন্দন সরকার
জৈমিনি ভারত ৩০০.০০

দীনেশচন্দ্র সেন
পদাবলী মাধুর্য ১০০.০০
সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
কালীঘাটের পুরাতত্ত্ব
৮০.০০
প্রশান্ত সেন
বেতাল পঞ্চবিংশতি
৮০.০০
পঞ্চতন্ত্র (পুনর্লিখন) ৮০.০০

শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
২০০.০০
বঙ্কিমচন্দ্র সেন
গীতা-মাধুরী ২৫০.০০
নাম-মাধুরী ১৫০.০০
জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে
২০০.০০

পাতাবাহার বিক্রয়কেন্দ্র **অপূর্ব** স্টল নং ১০-১১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৭৩ ফোন: ৯০৫১১৯৩৩২৭

'১৫০

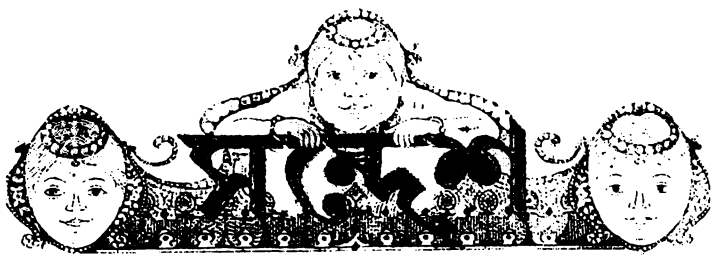

উপেন্দ্রকিশোর

প্রণব মুখোপাধ্যায়

গড়পারের এক মস্ত বাড়ি, সুরেলা অন্দর
তারের কাঁপন, নামে ওঠে তাঁর বেহালার ছড়।
কলম কালি প্রেস মেশিনের সরব ওঠানামা
গল্পের সব বই সেজেছে পরে নতুন জামা।
নতুন রঙে নতুন কত সৃষ্টি সুখের গান
ক্যানভাস আর ইজেলে তাঁর ছবির অবস্থান।
আবিষ্কারের নেশায় নেমে মুদ্রণ বিজ্ঞান
বদলে দিল পুঁথির দেহ, অশেষ অবদান!

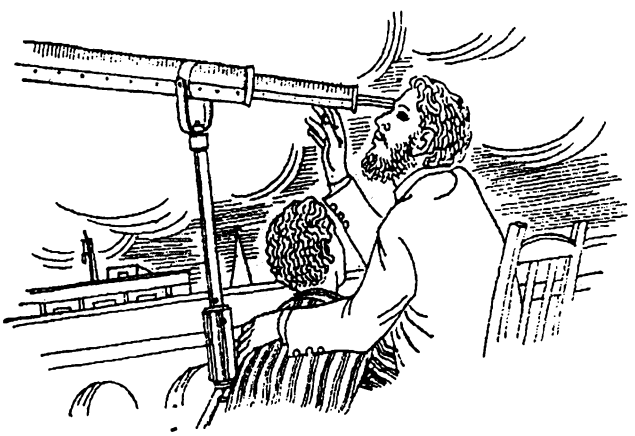

তরতরিয়ে ছন্দে তালে রামায়ণের চলা
আবার কখন চোখ রেখেছেন আকাশ পরকলায়।
ছাদের মাথায় মধ্যরাতে জ্বলন্ত ছাপ ছোপ
অন্ধকারে ঘুরেছে তাঁর অবাক টেলিস্কোপ,
সেসব নিয়ে ছুটল যে তাঁর ব্যস্ত কলমখানি
আকাশজোড়া কালপুরুষ আর নীহারিকার বাণী।

গল্প পুরাণ রেখায় লেখায় জাগল দেবলোক
শ্মশ্রুধারী মুখখানি তাঁর, স্বপ্নালু দুই চোখ।
নতুন যুগের নতুন সকাল ঘুচায় ঘুমঘোর
কিশোরমনের বাতি জ্বালেন উপেন্দ্রকিশোর।

ছবি: সত্যজিৎ রায়

'১৫০

উপেন্দ্রকিশোর রায়ের কথা

সুবিমল রায়

তোমরা 'সন্দেশ' পত্রিকায় স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায়ের লেখা অনেক ভাল ভাল গল্প পড়েছ আর তাঁর আঁকা ভাল ভাল ছবি দেখেছ। তিনিই 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে 'সন্দেশ' যখন প্রথম ছাপা হয়ে সকলের হাতে গেল, তখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যেমন খুশি হল, বড়দের মনেও তেমনি আনন্দ হল। ছেলে-মেয়েরা যাতে আনন্দ পায়, যাতে তাদের জ্ঞান বাড়ে আর বুদ্ধি খোলে, 'সন্দেশ' পত্রিকায় তিনি সেইরকম ব্যবস্থা করেছিলেন। তখনকার ছেলেরা এখন বুড়ো হয়ে এসেছে, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের কথা তারা ভুলতে পারে নি। তাঁর গলার গান আর বেহালার সুর শুনে মানুষের মন আনন্দে ডুবে যেত।

ইংরাজী ১৮৬৩ সনে ১২ই মে তাঁর জন্ম হয় — এখন থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে। তাই এই বছরে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর উৎসব করা হচ্ছে।

তিনি দেখতে বড়ই সুন্দর ছিলেন — ফরসা রং, সুন্দর কালো দাড়ি, বলিষ্ঠ শরীর; মুখের ভাব শান্ত, প্রসন্ন, উজ্জ্বল; চোখের চাহনি জ্ঞানী মানুষের মতন স্থির আর গভীর, কিন্তু স্নেহে ভরা। দেখলেই বোঝা যেত যে তাঁর মনটা খুব উঁচু আর মনের জোর খুব বেশী। সদানন্দ গুণী পুরুষের শ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলি তাঁর চেহারায় জ্বলজ্বল করত।

তাঁর কথাবার্তা খুব চমৎকার ছিল। লোকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বড় সুখী হত। বেশী কথা বলতেন না, কিন্তু যা বলতেন তা শুনেই সকলের প্রাণ ভরে যেত। তাঁর কথায় বা ব্যবহারে কিছুমাত্র অহংকারের চিহ্ন দেখা যেত না। তাঁর সামনে কেউ অন্যায় কাজ করতেও সাহস পেত না। দুষ্টুলোকদের খারাপ কাজ করতে দেখলে তাঁর গলার স্বর এমন গম্ভীর আর চেহারা এমন তেজীয়ান হয়ে যেত যে দুষ্টুলোকেরা ভয়ে ভয়ে সেই মুহূর্তেই সাবধান হয়ে যেত।

পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সাবডিভিশনে মসূয়া গ্রাম। এই গ্রামের প্রসিদ্ধ রায়-বংশে উপেন্দ্রকিশোরের জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা বিদ্বান, গুণী, মহৎ লোক ছিলেন। আদতে এঁদের বংশের পদবী ছিল 'দেব'; এঁরা কায়স্থ ছিলেন। লোকের কাছে এঁরা 'রায়' উপাধিতেই পরিচিত ছিলেন। পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ পাঠান জমিদার ঈশা খাঁর জমিদারির একটা কাছারিতে কাজ করেছিলেন, তাই 'খাসনবিশ' আর 'মজুমদার' উপাধিও পেয়েছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোরের প্রপিতামহ (অর্থাৎ ঠাকুরদাদার বাবা) রামকান্ত রায় বা রামকান্ত মজুমদার বাংলা, সংস্কৃত, আরবী আর পারসী ভাষায় খুব পণ্ডিত ছিলেন। ইনি খুব সুন্দর আর বলবান পুরুষ ছিলেন। শোনা যায়, ইনি সকালে স্নানের পরে জলযোগে ধামা-ভরা খই আর একটা আস্ত কাঁঠাল খেতেন। গান-বাজনাতেও এঁর খুব সুনাম ছিল।

রামকান্তের দ্বিতীয় পুত্র লোকনাথ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের পিতামহ বা ঠাকুরদাদা। লোকনাথও বাংলা, সংস্কৃত, আরবী আর পারসী ভাষা খুব ভাল জানতেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রও ভাল জানতেন। গান গাইতে আর খোল বাজিয়ে কীর্তন করতে ভালবাসতেন। লোকনাথ যোগী ছিলেন। তিনি

মধ্যে মধ্যে শ্মশানে গিয়ে জপ করতেন আর যোগের অভ্যাস করতেন। এই সব অভ্যাসের জন্য তিনি গুরুর কাছে বই, জপের মালা আর অন্য কতকগুলো জিনিস পেয়েছিলেন।

একটি ছেলে জন্মাবার পরে লোকনাথ শ্মশানে বেশী-বেশী যেতে আরম্ভ করলেন। তাই দেখে তাঁর বাবা রামকান্ত ভয় পেলেন; তিনি ভাবলেন যে লোকনাথ সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। তিনি লোকনাথের যোগের বই আর যোগসাধনার অন্য কতকগুলো জিনিস নদীতে ফেলে দিয়ে ভাবলেন যে লোকনাথ আর শ্মশানে যাবেন না, সংসারের কাজে মন দেবেন। কিন্তু এর ফল অন্যরকম হল; লোকনাথ উপবাস করে জপ করতে করতে দেহত্যাগ করলেন। মারা যাবার আগে তিনি রামকান্তকে সান্তনা দিয়ে বললেন, 'আমার যে একমাত্র ছেলেটিকে আমি রেখে গেলাম, তার অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে আর নাতি হবে; আমাদের একশত বংশধর হবে।' সত্যিই ক্রমে অনেক বংশধর হয়েছে।

লোকনাথের সেই একমাত্র পুত্র শ্যামসুন্দর রায় (বা শ্যামসুন্দর মুন্সী) ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের পিতা। শ্যামসুন্দর তাঁর পূর্বপুরুষদের রূপ, গুণ, বিদ্যা, বল আর সুনাম পেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নানা বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে আসতেন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কিন্তু-ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক বাধলে তাঁরা শ্যামসুন্দরকে বিচার-সভায় সাহায্যের জন্য ডাকতেন, আর সেখানে তাঁর কথা মেনে চলতেন। বিদ্বান মুসলমানেরা তাঁর কাছে আরবী আর পারসী দলিলের আর ফরমানের ঠিক-ঠিক মানে বুঝে নিতে আসতেন। তিনি কিশোরগঞ্জে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে সেরেস্তাদার ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের মায়ের নাম ছিল জয়তারা।

উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন শ্যামসুন্দরের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর বড় ভাই সারদারঞ্জন রায় কয়েক জায়গায় কলেজে পড়িয়ে শেষে কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে আর সংস্কৃতে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়াড় ছিলেন। হাতে ক্রিকেট ব্যাট, মুখে জমকালো দাড়ি, বলবান শরীর নিয়ে তেজীয়ান ভঙ্গীতে চলা-ফেরা, খেলার মাঠে সারদারঞ্জনের এই চেহারা যারা দেখেছিল তারা সারাজীবন মনে রেখেছিল। অনেকে তাঁর কাছে ক্রিকেট খেলা শিখে নিয়ে ভাল খেলোয়াড় হয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই তখন বাঙালীদের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় উৎসাহ আর উন্নতি দেখা গিয়েছিল, তাই তাঁকে 'ফাদার অব বেঙ্গলী ক্রিকেট' বলা হত। ছাত্রদের শিখবার সুবিধার জন্য তিনি অঙ্কশাস্ত্রের ভাল বই লিখেছিলেন, আর কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃত বইয়ের ভাল ব্যাখ্যা লিখে তাদের সংস্কৃত ভাষা শেখার সুবিধা করে দিয়েছিলেন। তিনি 'বিদ্যাবিনোদ' আর 'সিদ্ধান্তবাচস্পতি' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি কয়েকবার স্বপ্নে ভবিষ্যতের ঘটনা দেখতে পেয়েছিলেন; তাঁর স্বপ্ন ঠিক-ঠিক মিলে গিয়েছিল।

সারদারঞ্জন আর উপেন্দ্রকিশোরের পরেই তাঁদের ভাই মুক্তিদারঞ্জন। ইনিও অঙ্কশাস্ত্র খুব ভাল জানতেন আর বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াতেন। ক্রিকেট আর ফুটবল খেলায় এঁর খুব নাম হয়েছিল। খেলার মাঠে এঁর দাড়িও সকলের চেনা হয়ে গিয়েছিল। ইনি কথা কম বলতেন আর সহজে জোরে কথা বলতেন না, তবে এঁর কথাবার্তা আর গল্প বড় মিষ্টি ছিল। মুক্তিদারঞ্জনের শান্তশিষ্ট চেহারা ছিল, কিন্তু তাঁর গায়ে খুব জোর ছিল। তিনি খুব তাড়াতাড়ি ছুটতে পারতেন। পূর্ববঙ্গে খাটাস (খট্টাস)-জাতীয় একরকম জন্তু পাওয়া যায়, তাকে 'বাঘাল্লিয়া' বলে। শুনেছি, মুক্তিদারঞ্জন একবার একটা বাঘাল্লিয়াকে তাড়া করে ছুটতে ছুটতে সেটার ল্যাজ ধরে ফেলেছিলেন।

মুক্তিদারঞ্জনের পরে তাঁদের ভাই কুলদারঞ্জন রায়। ইনি চমৎকার ছবির কাজ (ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট) করতেন। ইনিও ভাল ক্রিকেট খেলতে পারতেন। ইনি কতকগুলো বিখ্যাত ইংরাজী গল্পের বইয়ের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। সেই-সব বই— 'ইলিয়াড', 'ওডিসিউস', 'রবিন হুড',

'অজ্ঞাত জগৎ', 'সারলক্ হোমসের বিচিত্র কাহিনী', 'বাস্কারভিলের কুক্কুর'—পড়ে সকলে খুব আনন্দ পেত। কুলদারঞ্জন 'বত্রিশ সিংহাসন', 'পুরাণের কথা', 'পঞ্চতন্ত্র', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' আর 'কথাসরিৎসাগর' অনেকটা সহজ করে লিখেছিলেন। এইসব গল্প অনেকদিন আগেই আমাদের দেশে রচিত হয়েছিল, কিন্তু অনেকেই এগুলো পড়ে নি। কুলদারঞ্জনের লেখায় সকলে এই-সব গল্প সহজে জানবার সুবিধা পেয়েছে।

এর পরে তাঁদের সবার ছোট ভাই প্রমদারঞ্জন রায়। স্কুলে-কলেজে থাকতে তাঁর ফুটবল খেলায় অদ্ভুত উৎসাহ ছিল। খেলতে খেলতে একবার তাঁর সামনের একটা কি দুটো দাঁত ভেঙে পড়ে গিয়েছে, একবার পাঁজরের সবচেয়ে উপরের হাড় (কলার বোন) ভেঙে গিয়েছিল, একবার হাঁটুর হাড় সরে গিয়েছিল। পরে ভাঙা হাড় জোড়া লেগে যায়, হাঁটু ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু ভাঙা দাঁতের ফোকলা জায়গায় আর নতুন দাঁত গজায়নি; নকল দাঁত বানিয়ে নিতে হয়েছিল। তিনি এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ভারত সরকারের জরিপ-বিভাগে কাজ করতেন। এই কাজে তিনি খুব সততা আর সাহস দেখিয়ে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁকে বনজঙ্গলে আর পাহাড়ে ঘুরে কাজ করতে হত। সেখানে যে-সব বন-পাহাড়, জীব-জন্তু, নতুন নতুন মানুষ আর অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা দেখতেন, সব-কিছুর কথা লিখে পাঠিয়ে দিতেন। 'সন্দেশ' পত্রিকায় সেগুলো ছাপা হত; লেখাগুলোকে 'বনের খবর' বলা হত। 'বনের খবর' এখন বইয়ের আকারে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। তাঁর মেঝো মেয়ে লীলা মজুমদারের লেখা অনেক গল্প তোমরা পড়েছ। কুলদারঞ্জন আর প্রমদারঞ্জন প্রথম জীবনে দাড়ি রাখতেন, কিন্তু পরে আর রাখতেন না।

উপেন্দ্রকিশোরের তিন বোন ছিলেন। তাঁর মধ্যে শুধু সব-চেয়ে ছোট বোন মৃণালিনী বসু (স্বর্গত হেমেন্দ্রমোহন বসুর পত্নী) এখন পর্যন্ত বেঁচে আছেন; ৮৬ বছর বয়স।

খুব ছোটবেলায় উপেন্দ্রকিশোরের নাম ছিল কামদারঞ্জন রায়। পরে একটি বিশেষ কারণে তাঁর নাম বদলিয়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নাম রাখা হয়। সেই কারণটির কথা বলা হচ্ছে।

মসূয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরীর অনেক বছর পর্যন্ত কোন ছেলে হয়নি। তাই তাঁর এই ভাবনা হল যে এত বড় সম্পত্তি তিনি কাকে দিয়ে যাবেন। তাই তিনি একটি পোষ্যপুত্র রাখতে চাইলেন, অর্থাৎ অন্যের একটি ছেলেকে চেয়ে নিয়ে মানুষ করে তাকেই সম্পত্তি দিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি তাঁর জ্ঞাতিভাই শ্যামসুন্দর রায়ের কাছ থেকে কামদারঞ্জনকে চেয়ে নিয়ে তাঁকেই নিজের ছেলের মত পালন করতে লাগলেন। তখন হরিকিশোরের নামের সঙ্গে মিল রেখে কামদারঞ্জনের নাম রাখা হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। উপেন্দ্রকিশোরের বয়স তখন চার-পাঁচ বছর মাত্র। হরিকিশোর নিষ্ঠাবান হিন্দু আর বিজ্ঞ লোক ছিলেন, তাই ময়মনসিংহের নানা সামাজিক ব্যাপারে আর সভা-সমিতিতে লোকেরা হরিকিশোরকে ডেকে নিয়ে যেত আর একজন প্রধান ব্যক্তি বলে গণ্য করত।

এর সাত বছর পরে হরিকিশোরের নিজের একটি ছেলে জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় নরেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্রকিশোর আর নরেন্দ্রকিশোর সহোদর ভাই না হলেও দুজনের মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল। নরেন্দ্রকিশোর বরাবর উপেন্দ্রকিশোরকে নিজের বড় ভাইয়ের মত মান্য করেছিলেন আর উপেন্দ্রকিশোরও তাঁকে খুব বিশ্বাস আর স্নেহ করতেন। বড় হয়ে নরেন্দ্রকিশোরই মসূয়ার জমিদারি চালাতেন; তিনি নিজের জমিদারিও দেখাশোনা করতেন,আবার উপেন্দ্রকিশোরের ভাগের জমি দেখাশোনার ভারও তিনি উপেন্দ্রকিশোরের কাছেই পেয়েছিলেন।

একটু বড় হয়ে উপেন্দ্রকিশোর যখন ময়মনসিংহ জেলার স্কুলে পড়তে গেলেন তখন নিজের খাতায় খেয়ালের বশে নানারকম ছবি আঁকতেন। একদিন একজন উচ্চপদের ইংরেজ সেই স্কুল দেখতে এলেন। সাহেব ক্লাসে ঢুকে ছেলেদের প্রশ্ন করছেন, আর সেই ফাঁকে উপেন্দ্রকিশোর সাহেবের ছবি এঁকে ফেলেছেন। সাহেব ভাবলেন, বালকটি খাতায় বুঝি অঙ্ক-টঙ্ক কষছে; তাই তিনি সেই খাতাটা দেখতে চাইলেন। সেই ক্লাসে একটি শিক্ষক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। ভাবলেন যে সাহেব বুঝি খাতায় নিজের ছবি দেখে রেগে যাবেন। সাহেব কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা ছবিটা দেখে বড়ই খুশি হয়ে বললেন, 'তুমি ছবি আঁকার অভ্যাস ছাড়বে না; বড় হয়ে তুমি খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারবে।'

স্কুলে থাকতেই উপেন্দ্রকিশোর বেহালা আর বাঁশি বাজাতে খুব ভালবাসতেন। তিনি বেহালা বাজিয়ে আর খেলা করে অনেকখানি সময় কাটাতেন। একদিন তাঁর এক গুরুজন (সম্ভবত তাঁর শিক্ষক) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আচ্ছা উপেন্দ্র! তুমি তো বেহালা আর খেলাধুলো নিয়ে অনেকখানি সময় কাটাও, অথচ ক্লাসে প্রশ্নের ঠিক-ঠিক উত্তরও দিয়ে থাক; তুমি পড়া তয়ের কর কখন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার ঘরে আমাদের ক্লাসের একজন ছেলে চেঁচিয়ে পড়া তয়ের করে, আমি শুনতে পাই, ওতেই আমার পড়া শেখা হয়ে যায়।' তাঁর এই-রকম অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল।

অনেকে ভয় করেছিলেন যে উপেন্দ্রকিশোর এনট্রান্স পরীক্ষায় পাস করতে পারবেন না। একজন তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন যে পরীক্ষা কাছে এসে পড়ছে। তখন তিনি খেলাধুলো ছেড়ে দিয়ে বেহালা ফেলে দিয়ে পড়ায় খুব মন দিলেন। তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করলেন, বৃত্তি পেলেন। আগে যাঁরা ভয় পেয়েছিলেন তাঁরা এই খবর পেয়ে সুখী হলেন।

স্কুলে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে গগনচন্দ্র হোমের সঙ্গে তিনি বেশী মন খুলে কথা বলতেন। ধর্ম আর সমাজ নিয়েও দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হত। গগনচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া-আসা করতেন। তাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক রতনমণি গুপ্ত মহাশয়ও ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি উপেন্দ্রকিশোরকে বড় স্নেহ করতেন। আমাদের দেশের কয়েকটি পুরনো সামাজিক প্রথায় ব্রাহ্মণদের মন সায় দিত না, আর এ দেশের প্রচলিত পূজা-পদ্ধতিতেও তাঁদের মন সায় দিত না। তাঁদের ধারণা অনুসারে ধর্মের উন্নতির আর সমাজের সব রকম মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। শরীর-মন-বুদ্ধির সমস্ত শক্তি আর প্রাণের সমস্ত উৎসাহ নিয়ে তাঁরা এই কাজে নেমে পড়েছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে একটি কথা আছে — 'উত্তমা মানসী পূজা', অর্থাৎ মনে মনে ভগবানের পূজা করা সবচেয়ে ভাল। ব্রাহ্মণরা এটা বিশ্বাস করতেন, তাই উপাসনার জন্য প্রতিমা বা মূর্তি গড়াতেন না। তাঁরা জাতিভেদ স্বীকার করতেন না, আর মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখাতেন। আজকাল প্রায় সকলেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখায়, কিন্তু তখন অনেকেই এ-সব পছন্দ করত না। এই সমস্ত কারণে ব্রাহ্মণদের অনেক নিন্দা আর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। তবু তাঁরা দমেননি।

কয়েকজন ভাল ভাল ব্রাহ্মের সঙ্গে মিশে উপেন্দ্র-কিশোরের মনও ব্রাহ্ম সমাজের দিকে ঝুঁকছিল। তাই দেখে হরিকিশোর রায়চৌধুরীর ভাবনা হল। হরিকিশোর প্রাচীন ধরনের নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। গগনচন্দ্র হোমের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের মেশা তিনি পছন্দ করতেন না। তাই তিনি তাঁর ছেলের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। উপেন্দ্রকিশোর কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে এমন একটা আলো দেখেছিলেন যার কথা তিনি ভুলতে পারলেন না। তিনি হরিকিশোরকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে গগনচন্দ্রের সঙ্গে মিশতে লাগলেন।

কলেজে পড়বার জন্য উপেন্দ্রকিশোরকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে একটা মেসে থেকে তিনি পড়াশোনা করতে লাগলেন। কলকাতায় তখন এত বাড়িঘর ছিল না, বিজলীবাতি ছিল না, ইলেকট্রিক ট্রাম, মোটরগাড়ি, সিনেমা, এ-সব ছিল না। রাস্তায় গ্যাসের বাতি আর বাড়িতে তেলের বাতি আর মোমবাতি জ্বলত। ভবানীপুর পল্লীগ্রামের মতন আর টালিগঞ্জ জঙ্গলের মতন ছিল। তবে কলকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। তাই শহরটার খুব নাম ছিল, আর শহরের যাতে উন্নতি হয় সে-রকম চেষ্টা চলছিল। ধর্মের, সমাজসংস্কারের আর শিক্ষাবিস্তারের নানা আন্দোলনও এখানে চলছিল।

কলেজের ছাত্র উপেন্দ্রকিশোর পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে গান-বাজনার চর্চায় আগের চেয়ে গভীরভাবে মন দিলেন। তাঁর চিন্তাশক্তি ক্রমেই বাড়ছিল, হৃদয়ের ভাবগুলি আরো ভাল করে ফুটে উঠছিল, নিজেকে আর জগৎটাকে তিনি আরো বেশী চিনছিলেন। ময়মনসিংহে থাকতেই তিনি গানের মধ্যে যে আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলেন তার মধ্যে এখন তাঁর মন একেবারে তলিয়ে যেত। কথা দিয়ে সে আনন্দ একজন অন্যকে বোঝাতে পারে না; যারা নিজেদের মধ্যে সেই আনন্দ বোধ করেছে শুধু তারাই বুঝতে পারে। পরে আরো বড় হয়ে সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে নিজের অন্তরে ডুবে গিয়ে তিনি

যে অমৃতের রস পেতেন, তাঁর কণ্ঠের সুরের মধ্যে দিয়ে সেই অমৃতের ধারা বাইরেও ঝরে পড়ত, যারা শুনত তারাও সেই প্রাণ-ভোলানো আনন্দের ভাগ পেত।

কলেজে থাকতেই বেহালার দিকেও তিনি আরো গভীরভাবে মনোযোগ দিলেন। অভ্যাসের ফলে তাঁর ক্রমেই বেশী সুন্দর করে বেহালা বাজাবার শক্তি বাড়তে লাগল। কিছুকালের মধ্যেই কেউ কেউ নিজেদের বেহালা নিয়ে তাঁর কাছে এসে বেহালা শিখতেন আর বাজাতেন। বাজাতে বাজাতে তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে যেতেন, অন্যেরাও আনন্দে ভরপুর হয়ে যেত।

উপেন্দ্রকিশোর নিজেই একটা খাতায় লিখে রেখেছিলেন যে এই সময়েই তিনি তাঁর ছবি আঁকার বিদ্যাকেও বাড়িয়ে তুলতে আর ছবি আঁকায় নিপুণ হয়ে উঠতে যত্নের সঙ্গে চেষ্টা করছিলেন। এই-সব কাজে তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত, কিন্তু এতে তাঁর কষ্টবোধ ছিল না। এগুলো ছিল তাঁর আনন্দের তপস্যা। ভবিষ্যতে তিনি একজন অতি বিখ্যাত চিত্রকর হয়েছিলেন।

তিনি একজন খুব বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কিন্তু সে কথা পরে বলা হবে।

কলকাতায় তিনি ব্রাহ্ম সমাজের এমন কয়েকজন মহৎ লোকের দেখা পেলেন যাঁরা নানাভাবে দেশের উপকার করেছেন আর যাঁদের চরিত্রের তেজ, ধর্মবল আর ভাল ভাল কাজে উৎসাহ ছিল অতি অসাধারণ। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁর যোগ বেড়ে গেল। তিনি খেয়ালের বশে ব্রাহ্ম সমাজে যাননি; তিনি বুঝেছিলেন যে সেখানে তিনি তাঁর প্রাণের শান্তির জিনিস পেয়েছেন।

ওদিকে ময়মনসিংহে হরিকিশোর রায়চৌধুরী হঠাৎ একদিন পরলোকগমন করলেন। শ্যামসুন্দর রায় আগেই দেহত্যাগ করেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষা পাস করেন। এখন সেটার নাম বিদ্যাসাগর কলেজ।

২২ বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর বড় মেয়ে বিধুমুখীকে বিয়ে করেন। দ্বারকানাথ অতি তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ মানুষ ছিলেন। তখন সাহেবদের চা-বাগানে কুলিদের উপরে খুব অত্যাচার করা হত। কুলিদের ভুলিয়ে ভুলিয়ে ধরে আনবার জন্য চা-বাগানওয়ালাদের একদল লোক ছিল, তাদের 'আড়কাঠি' বলা হত। এই-সব কথা শুনে দ্বারকানাথের খুব দুঃখ আর রাগ হল। তিনি আর ব্রাহ্ম সমাজের একজন ধর্মপ্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন নিজেরা চা-বাগানে ছদ্মবেশে গিয়ে নানা বিপদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কুলিদের দুরবস্থা দেখলেন। ফিরে এসে তাঁরা খবরের কাগজে ঐ-সব কথা লিখতে লাগলেন, তাঁদের সঙ্গে গগনচন্দ্র হোমও লিখতে লাগলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টকে কুলিদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে দিলেন। তখন আসামের চীফ-কমিশনার স্যার হেনরি কটন চা-বাগানওয়ালাদের কুলি-ধরার আড়কাঠি-দল ভেঙে দিলেন। দ্বারকানাথ আরো নানারকম সৎসাহসের কাজ করেছেন।

উপেন্দ্রকিশোর কলকাতায় ১৩নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িতে থেকে ছবি আঁকার কাজ আর ফটোগ্রাফির কাজ করে সংসার চালাতে লাগলেন। এই বাড়িতেই পরে পরে তাঁর বড় মেয়ে সুখলতা, বড় ছেলে সুকুমার, মেঝো মেয়ে পুণ্যলতা, মেজো ছেলে সুবিনয় আর ছোট মেয়ে শান্তিলতা জন্মগ্রহণ করে। এদের ছেলেবেলা ঐ বাড়িতেই কাটে। এই সেকেলে বাড়িটা তাঁর ছেলে-মেয়েদের কাছে একটা স্বপ্নপুরীর মতন মনে হত। বাড়ির বাইরের অংশেই ছোটদের স্কুল ছিল। তারা ঐ স্কুলেই পড়ত। বাড়ির ভেতরের অংশের দোতলায় উপেন্দ্রকিশোর আর তাঁর পরিবারের সকলে থাকতেন। তেতলায় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী তাঁর পরিবারের লোকদের নিয়ে থাকতেন। বাড়ির প্রকাণ্ড ছাতে বিকালে এই দুই পরিবারের ছেলে-মেয়েরা হৈ হৈ করে খেলা করত। একতলায় রান্নাবাড়ির উঠোনের অর্ধেকটা জুড়ে একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ছিল।

একটা ঘর ছেলে-মেয়েদের কাছে বড় অদ্ভুত লাগত। সেটা ছিল তাদের ডাক্তার দিদিমা কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর (দ্বারকানাথের স্ত্রীর) পড়বার ঘর। সেখানে দেয়ালে একটা মানুষের কঙ্কাল টাঙানো থাকত। বড় বড় আলমারিতে নানারকম ডাক্তারী বই আর নানারকম যন্ত্রপাতি থাকত। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী আর চন্দ্রমুখী বসু এ দেশের মেয়েদের মধ্যে প্রথম বি.এ. পাস করেন, তাঁদের মধ্যে কাদম্বিনীই প্রথম ডাক্তারি পাস করেন আর বিলাত গিয়ে অস্ত্রচিকিৎসার উপাধি নিয়ে আসেন। বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল কাদম্বিনী বসু। চিকিৎসায় তাঁর খুব সুনাম হয়েছিল।

আর একটা ঘরে ঢুকতে ছেলে-মেয়েদের একটু গা ছমছম করত। সেটা ছিল উপেন্দ্রকিশোরের ফটোগ্রাফির 'ডার্ক রুম'—একটা অন্ধকার ঘর; লাল কাচের ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট আলো ঢুকে সেই ঘরের ফটোগ্রাফির নানারকম সরঞ্জামের উপরে অস্পষ্টভাবে পড়ে একটা রহস্যময় ভাবের সৃষ্টি করত।

উপেন্দ্রকিশোর বেহালা বাজাতেন, ছবি আঁকতেন, ছেলে-মেয়েরা অবাক হয়ে শুনত আর দেখত।

তখন ছোটদের জন্য 'সখা ও সাথী' নামে বাংলা পত্রিকা ছিল। তিনি এই পত্রিকায় গল্প লিখতেন আর তাঁর বন্ধু প্রমদাচরণ সেন এই পত্রিকা চালাতেন।

তখন কলকাতায় প্লেগ হচ্ছিল বলে তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কিছুকালের জন্য চুনারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁর ভাইয়েরাও গিয়েছিলেন, নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও। মস্ত দল হয়েছিল। তিনি চুনার দুর্গের একটা ছবি এঁকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপহার দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখেছেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জমিদারির বাড়িতে এই ছবি দেখেছিলেন; উপেন্দ্রকিশোরের নাম লেখা ছিল। বাংলা ১৩০৭ সনের আষাঢ় মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় যতীন্দ্রনাথ বসু এই কথা লিখে গিয়েছেন।

চুনার ছাড়া গিরিডি, মধুপুর এই-সব জায়গাতেও তিনি বাড়ির সকলকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত তাঁরা ১৩ নম্বরের বাড়িতেই ছিলেন। এই বাড়িতে আর একজন ছিলেন—তিনি হচ্ছেন রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মেঝো মেয়ে সুরমা। বিদ্যারত্ন মহাশয় পরে যখন সন্ন্যাসী হয়ে যান তখন তাঁর তিনটি ছোট ছোট মেয়েকে রেখে যান। তাদের মধ্যে সুরমাকে মানুষ করবার ভার নিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। তাঁর ছেলে-মেয়েরা এই মেয়েটিকে সুরমা-মাসী বলত। শান্ত বুদ্ধিমতী মানুষ, স্নেহে ভরা মন। সুরমা-মাসীর সঙ্গে পরে প্রমদারঞ্জন রায়ের বিয়ে হয়েছিল।

তখন বাংলা বইয়ে আর পত্রিকায় ভাল ছবি ছাপাবার ব্যবস্থা বা উপায় ছিল না। ছবিগুলো যাতে সুন্দরভাবে ছাপানো সম্ভব হয় তার জন্য উপেন্দ্রকিশোর বিলাত থেকে হাফটোন ছবি তয়ের করবার সব জিনিসপত্র আনালেন। এই-সব জিনিস রাখবার জন্য আর হাফটোন ছবি ছাপাবার জন্য বেশী ঘরের দরকার হল। তখন বাড়ি বদলাবার দরকার হল।

তিনি সেই-সব জিনিসপত্র আর পরিবারের সকলকে নিয়ে সেই বাড়ির অল্প দূরে ৭নং শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে উঠে গেলেন। এই নতুন বাড়িতে তাঁর ছোট ছেলে সুবিমল রায়ের (লেখকের) জন্ম হয়। আমার ছেলেবেলার অল্প কয়েক বছর ঐ বাড়িতে কেটেছিল। এই বাড়িতে আমার খুড়তুতো ভাই করুণারঞ্জন রায়ের (কুলদারঞ্জন রায়ের ছেলের) জন্ম হয়।

বাবা (উপেন্দ্রকিশোর) তখন কী ছবি আঁকতেন তা অত অল্প বয়সে আমি বুঝতাম না, কিন্তু ছবি আঁকার রংগুলোর কথা আমার আজ পর্যন্ত মনে পড়ে। লাল, নীল, হলদে, সবুজ, নানারকম রং দেখে বড় খুশী হতাম। বাবার কাজের দুটো ঘরের কথা অস্পষ্ট মনে পড়ে—স্টুডিও আর ফটোগ্রাফির একটা অদ্ভুত অন্ধকার ঘর ('ডার্করুম')। বাবা নানারকম বই পড়ে আর নিজের হাতে পরীক্ষা করে হাফটোন ছবির কাজ শিখে ফেললেন। ছবি ছাপাবার একটা প্রেসও একটা ঘরে ছিল, কিন্তু সেটার কথা আমার মনে বড়ই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখানে থাকতে বাবা একবার সকলকে নিয়ে দেশে মসুয়াগ্রামে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে কথা আমি ভুলে

গিয়েছি। তবে শুনেছি যে বড়দের খুব ভাল লেগেছিল। দেশে কাকা নরেন্দ্রকিশোর আর অন্য অন্য আত্মীয়স্বজন খুব খুশী হয়েছিলেন।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই নতুন বাড়িটাও ছেড়ে আমরা ২২নং সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে এলাম। এখন রাস্তাটার নাম কৈলাস বোস স্ট্রীট। এই বাড়িতে একদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাবার কাছে আসতে দেখলাম। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪০।৪১ বছর হবে। বাবা তাঁকে আগে থেকেই চিনতেন। রবীন্দ্রনাথের তখন কালো চুল, কালো দাড়ি। তিনি বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আর আমি অনেক দূরে দাঁড়িয়ে একটু দেখছিলাম। তিনি বাবার বেহালা শুনতে বড় ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান শুনে বাবা সেগুলোর স্বরলিপি লিখে নিয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে গানের সঙ্গে বাবা বেহালা বাজাতেন, তাই জোড়া সাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অনেকের সঙ্গেই তাঁর জানাশোনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাবার লেখা গল্প আর বাবার আঁকা ছবিও খুব পছন্দ করতেন।

এই বাড়িতে আসার পরে বাবার কাজ অনেক বেড়ে যায়। একে একে সব বলব।

বাবা গান গাইতেন, গান রচনা করতেন, গান শেখাতেন। দাদা-দিদিরা তো শিখতই, তাছাড়া কত চেনা অচেনা লোক এসে শিখে যেতেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে যাঁদের খুব ভাল জ্ঞান ছিল তাঁরাও বাবার সঙ্গে গানের চর্চা করতেন আর তাঁর কথাগুলো খুব মূল্যবান মনে করতেন। তিনি ছোটদের জন্য অনেক গান লিখেছেন, আবার ব্রহ্ম সঙ্গীতের তিন-চারটা গান রচনা করেছেন। তাঁর 'জাগো পুরবাসী' গানটা ব্রাহ্ম সমাজে প্রত্যেক বছর ১১ই মাঘের উৎসবে সকালে গাওয়া হত। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী এই গানটা বড় ভালবাসতেন। গানটা সকলেরই খুব প্রিয়। উৎসবের গানগুলো শিখে নিতে অনেকে বাবার কাছে আসত; বাড়িটা তখন গানে গানে গমগম করত।

বাবা 'হারমোনিয়াম শিক্ষা' আর 'বেহালা শিক্ষা' নামে দুটো বই লিখেছিলেন। তবে তিনি বলতেন যে হারমোনিয়ামের সুর আমাদের দেশের গানের সুরের সঙ্গে তত ভাল মেলে না। তিনি সেতার আর পাখোয়াজও বাজাতেন।

বাবা যখন সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়াতে যেতেন, ছবি আঁকার জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতেন। দার্জিলিঙের পাহাড়, পুরীর সমুদ্র, গিরিডির শালবন, এইরকম কত ভাল ভাল দৃশ্যের অদ্ভুত সুন্দর সব ছবি তিনি এঁকে গিয়েছেন। ছেলেবেলায় বোধ হয় ১৯০৪ সনে আমরা তাঁর সঙ্গে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম যে বাবা ছবি আঁকতে আঁকতে মধ্যে মধ্যে পেছিয়ে এসে শান্তভাবে ছবিটার দোষ-গুণ দেখছেন, আবার এগিয়ে ছবির কাছে গিয়ে দরকার বুঝে কয়েকটা দাগ বা টান বা একটু তুলির কারুকার্য জুড়ে দিয়ে ছবিটাকে আরো সুন্দর করে তুলছেন। ছবির চেয়ে বাবার সেই চেহারাটাই বেশী মনে পড়ে; কী শান্ত, সজীব আনন্দময় সে চেহারা। গিরিডিতে শালবনের দিকে তাকিয়ে তিনি যখন ছবি আঁকতেন তখন তাঁকে দেখে অনেকের মনে হত যেন এ দেশের তপোবনের একজন মুনি।

ছোটদের জন্য যখন 'ছেলেদের রামায়ণ' 'ছেলেদের মহাভারত' এই-সব বই লিখতে আরম্ভ করলেন তখন প্রায় প্রতিদিন কিছু কিছু লিখে আমাদের পড়ে শোনাতেন। শুনতে আমাদের এত ভাল লাগত যে খেলাখুলোর কথা ভুলেই যেতাম। আমাদের মন তখন রামায়ণ-মহাভারতের যুগে চলে যেত। আমরা তাঁর সঙ্গে গিরিডি গেলাম, সেখানেও তিনি তাঁর লেখাগুলো আমাদের শোনাতেন। কাকা নরেন্দ্রকিশোরও সেবার তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিরিডি গিয়ে অন্য একটা বাড়িতে ছিলেন, আর আমার পিসামশাই হেমেন্দ্রমোহন বসু (পারফিউমার এইচ বোস) আমার পিস্তুতো ভাইবোনদের নিয়ে গিরিডিতে অন্য একটা বাড়িতে উঠেছিলেন। আমরা এতজন ভাই-বোনে মিলে বাবাকে ঘিরে বসে তাঁর গল্পগুলো শুনতাম। সময়টা মহা আনন্দে কেটে যেত। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি আরো কয়েকটা বই লিখেছিলেন—'টুনটুনির বই', 'মহাভারতের গল্প' আর কবিতায় 'ছোট্ট রামায়ণ'। বইয়ের ছবিগুলো তিনিই আঁকতেন। অন্য কয়েকজনের বইয়েতেও তিনি ছবি এঁকে দিয়েছেন। এর অনেক বছর আগে তিনি 'সেকালের কথা' বলে একটা বই লিখেছিলেন—প্রাচীন জীব-জন্তুর কথা।

এইখানে তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ আবিষ্কারের কথা বলা দরকার। তিনি খুব বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর ঐ বৈজ্ঞানিক

আবিষ্কারগুলো হচ্ছে হাফটোন আর লাইন ব্লক সম্পর্কে। আগে হাফটোন ব্লকের ছবি পরিষ্কারভাবে আর মোলায়েম করে ছাপাবার অনেক অসুবিধা ছিল। বাবা সেই অসুবিধা দূর করবার উপায় আবিষ্কার করেন। তার ফলে হাফটোন ছবি আগের চেয়ে সুন্দর আর মসৃণভাবে ছাপানো সম্ভব হয়েছে। তিনি 'স্ক্রীন-অ্যাডজাস্টার' আবিষ্কার করেন, যার ফলে ক্যামেরার স্ক্রীনকে যান্ত্রিক উপায়ে ক্যামেরার ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে রাখা অনেক সহজ হয়েছে। একরঙের আর নানারঙের ছবি ছাপানোর অনেক উন্নতি হয়েছে। ইউরোপে তাঁর আবিষ্কারগুলোর খুব সুখ্যাতি হয়েছিল। বাবার অনুমতি নিয়ে পেনরোজ কোম্পানি ঐ আবিষ্কারগুলোর পেটেন্ট নিয়ে তয়ের করতে আর বিক্রি করতে আরম্ভ করেন। 'পেনরোজ অ্যানুয়্যাল' পত্রিকায় বাবার আবিষ্কারগুলোর বিবরণ ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। তিনি 'ডুয়োটাইপ' আর 'রে টিন্ট'প্রণালীও উদ্ভাবন করেন।

এই-সব করতে বাবাকে অনেক পরিশ্রম আর অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মা (বিধুমুখী) বাবার স্বাস্থ্যের দিকে খুব দৃষ্টি রাখতেন আর বাবার খুব যত্ন নিতেন। তাই বাবার পক্ষে দীর্ঘকাল এত পরিশ্রম করা সম্ভব হয়েছিল। মা বাড়ির সকলের আর আত্মীয়স্বজনদের সেবা-যত্ন তো করতেনই, তা ছাড়া অনাত্মীয় অনেকেও মায়ের কাছে প্রচুর স্নেহযত্ন আর সাহায্য পেয়েছেন। মা খুব ভাল রান্না করতে পারতেন। একবার তাঁর খুব অসুখ হয়। ডাক্তার তাঁকে অনেকদিন পর্যন্ত কাঁচকলার ঝোল খেতে বলেছিলেন। মা সেরে উঠে ডাক্তারকে নেমন্তন্ন খাওয়াতে চাইলেন আর ডাক্তার কী খেতে চান তা জিজ্ঞাসা করলেন। ডাক্তার মজা করে বললেন, 'কী আর খাব। কাঁচকলা রেঁধে দেবেন, তাই খাব।' নেমন্তন্ন খেতে এসে ডাক্তার দেখলেন যে মা সত্যিই কাঁচকলার নানারকম জিনিস রেঁধেছেন— শুক্তানি, তরকারি, বড়া, চপ, কোপ্তা, চাটনি, মিষ্টি,— সব কাঁচকলার। ডাক্তার খুব তৃপ্তি করে খেয়ে বললেন, 'কাঁচকলা দিয়ে যে এত ভাল ভাল খাবার জিনিস করা যেতে পারে তা আমি আগে জানতাম না।'

সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ির একতলাটার সামনের (উত্তরের) অংশে অফিস, প্রেস, ছবি বানাবার নানা রকম ওষুধ বা রাসায়নিক জিনিস, এই-সব ছিল। একতলার মাঝখানে একটা উঠোন ছিল; তার পশ্চিম ধারে ফটোগ্রাফির একটা ডার্করুম,

আর উপরে যাবার সিঁড়ি। পেছনের (দক্ষিণের) অংশে খাবার ঘর, চাকরদের থাকবার ঘর, রান্নাঘর, উঠোন, স্নানের ঘর এই-সব ছিল; দোতলায় উঠবার একটা ঘোরানো-ঘোরানো লোহার সিঁড়িও ছিল। দোতলায় সকলে থাকতাম। সামনের দুটো ঘরের দেয়ালে বাবা অনেকটা ফুল-পাতা-লতার মতন নানারকম চিত্র এঁকে ঘরদুটোকে বড় সুন্দর করে দিয়েছিলেন। দোতলায় পেছনের পশ্চিম ধারে একটা ছোট ছাত ছিল। তেতলার ছাতের মাঝখানে একটা ঘর ছিল। ছাতের উত্তরভাগে কাঁচের ছাতওয়ালা একটা সুন্দর স্টুডিও ছিল। বেশী মেঘলা দিনে আর রাত্রে ছবির কাজ চালাবার জন্য বড় বড় আর্ক ল্যাম্প আনা হয়েছিল। খুব উৎসাহে কাজ চলতে লাগল।

ব্রাহ্মসমাজে ছোটদের উৎসবে বাবা সুন্দর সুন্দর গল্প বলতেন। একবার এই গল্পটা বলেছিলেন—'একজন লোক দোকানে খাবার কিনে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ ঠোঙার ভেতরে খাবারগুলোর মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। শিঙাড়া পান্তুয়াকে বলল, "হ্যাঁ রে, তুই আমার গায়ে সিকনি লাগিয়ে দিচ্ছিস কেন? তুই তো বড় খারাপ লোক!" শুনে পান্তুয়া বলল, "ভাল রে ভাল! আমি তোর গায়ে মিষ্টি রস লাগিয়ে দিচ্ছি আর তুই বলছিস আমি সিকনি লাগিয়ে দিচ্ছি। তুই কেমন লোক?" তখন শিঙাড়া কচুরির কাছে নালিশ করল। কচুরি বলল, "তাই তো, ওটা আমার গায়েও একটু একটু সিকনি লাগিয়ে দিয়েছে দেখছি। ওটার স্বভাব তো বড় বিচ্ছিরি।" ঠোঙার মধ্যে খুব ঝগড়া চলতে লাগল। একটু পরেই লোকটি বাড়ি পৌঁছিয়ে ঠোঙা থেকে খাবারগুলো তুলে নিয়ে খেতে বসল। তখন খাবারগুলো 'হায়-হায়' করে বলল, "আমরা শুধু শুধুই ঝগড়া করলাম; এতে আমাদের কিছুই লাভ হল না।" লোকটিও দেখতে দেখতে ওদের খেয়ে শেষ করে ফেলল।'

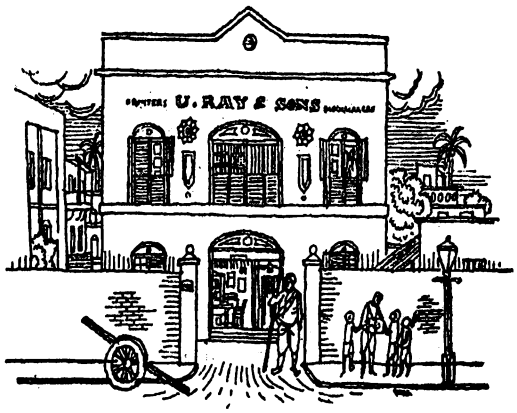

বাড়িতে বাবা খুব সহজ ভাষায় সুন্দর করে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের কথা আর বিজ্ঞানের নানা কথা ছোটদের বুঝিয়ে দিতেন। দূরবীন দিয়ে ধুমকেতু, চাঁদের পাহাড়, এই-সব দেখিয়ে দিতেন। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যার যে যে গুণ বা শক্তি ছিল সেগুলোকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতেন। একজিবিশন দেখতে গেলে দেখবার জিনিসগুলোর কথা ছেলেমেয়েদের এমন সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে অচেনা লোকেরাও এসে পাশে দাঁড়িয়ে শুনে যেত।

জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জন আর কাকা মুক্তিদারঞ্জন মেট্রোপলিটান কলেজে (এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজে) পড়াতেন, তাই তাঁরা আর তাঁদের ছেলে-মেয়েরা প্রায়ই এ বাড়িতে আসতেন। পিস্তুতো ভাইয়েরা দল বেঁধে প্রায়ই আসতেন—অনেকগুলি ভাই। মামা-মাসীরাও আসতেন। খুব গল্প আর খেলাধুলো হত। কাকা কুলদারঞ্জন আগে কাছেই একটা বাড়িতে থাকতেন। খুড়িমা মারা যাওয়ার পরে তিনি এ বাড়িতেই উঠে এলেন; সঙ্গে তাঁর ছেলে-মেয়েরা—(১) করুণারঞ্জন, (২) মাধুরীলতা, (৩) ইলা। এরা আমাদের বাড়িতেই বড় হয়েছে। দাদামশাই দ্বারকানাথ অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। ডাক্তার-দিদিমা (কাদম্বিনী গাঙ্গুলী) মধ্যে মধ্যে তাঁর ব্রুহাম গাড়িতে চড়ে এ বাড়িতে আসতেন। ছোটকাকা প্রমদারঞ্জন রায় যখন দূরদেশ থেকে আসতেন তখন সকলে তাঁর মুখে বন-জঙ্গলের গল্প শুনতে পেত। পিসামশাই হেমেন্দ্রমোহন বসু প্রথম ফনোগ্রাফ বা গ্রামাফোন কিনে সকলকে শোনালেন। নিজেই রেকর্ডও তুলতেন। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তিনিই প্রথম মোটরকার কিনে সকলকে চড়ালেন। গুরুজনেরা যখন বসে বাবার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতেন আর হাসতেন, ছেলে-মেয়েরা সেই দৃশ্য দেখে আনন্দ পেত। গগনচন্দ্র হোমকে আমরা দাদামশাই বলতাম। তাঁরাও আসতেন। দুই পরিবারে খুব ভাব।

সুকুমার রায় তখন একে একে 'লক্ষণের শক্তিশেল' প্রভৃতি নাটক লিখছিলেন, আর বাড়িতেই সেগুলো অভিনয় করা হত। অভিনয় অভ্যাসের সময়ে বাবা মধ্যে মধ্যে সেখানে এসে একটু দেখে যেতেন, এতে সকলে উৎসাহ পেত। পরে অভিনয় দেখে আত্মীয়স্বজনেরাও খুব আনন্দ পেত, বাবাও খুব খুশী হতেন।

এই বাড়িতেই বাবার কাজের বা ব্যবসার প্রতিষ্ঠানটির নাম হল 'ইউ রায় এন্ড সন্স'। এখানেই তিনি ১৯১৩ সনে (বাংলা ১৩২০) 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। ভাল ভাল গল্পের সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা তাদের পত্রিকায় এই প্রথম খুব ভাল ভাল ছবি দেখতে পেল। 'সন্দেশ' পত্রিকা ছোট-বড় সকলেরই খুব প্রিয় হয়ে উঠল। এই পত্রিকায় বাবার লেখা খুব ভাল ভাল গল্প আর তাঁর আঁকা খুব ভাল ভাল ছবি তো থাকতই, তা ছাড়া অনেক নামজাদা লেখকও এতে লিখতেন। ডাক্তার-দিদিমার ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এতে পোকা-মাকড়ের আর জীব-জন্তুর কথা লিখতেন। এই বিষয়ে তাঁর খুব জ্ঞান ছিল। তাঁর লেখাগুলো বড় চমৎকার হত।

রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মেঝো মেয়ে আমাদের বাড়িতেই বড় হয়েছিলেন আর আমরা তাঁকে 'সুরমা-মাসী' বলতাম সে কথা আগেই লেখা হয়েছে। এই বাড়িটায় থাকতেই প্রমদারঞ্জন রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের বড় ছেলে প্রভাতরঞ্জনের আর বড় মেয়ে সুলেখার জন্ম এই বাড়িতেই হয়। এই বাড়িতে আমরা ১৯১৪ সনের শেষ পর্যন্ত ছিলাম। এখানে থাকতেই দিদিদের বিয়ে হয়েছিল—সুখলতার সঙ্গে ডাক্তার জয়ন্ত রাওয়ের, পুণ্যলতার সঙ্গে অরুণনাথ চক্রবর্তীর, আর শান্তিলতার সঙ্গে প্রভাতচন্দ্র চৌধুরীর। বড়দাদা সুকুমার রায়েরও বিয়ে এখানে থাকতেই হয়। তাঁর স্ত্রী সুপ্রভা রায় খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। তিনি যাতে আরো ভাল করে গান শিখতে পারেন, বাবা তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সুকুমার রায়ের আর সুখলতা রাওয়ের অনেক লেখা আর বই তোমরা পড়েছ। পুণ্যলতা চক্রবর্তীর বই 'ছেলেবেলার দিনগুলি' তোমরা খুব সম্ভব পড়েছ। শান্তিলতা চৌধুরীর লেখা 'পাকা রাঁধুনী' কবিতাটি 'সন্দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

১৯১১ সনের গ্রীষ্মকালে আমরা অনেকে বাবার সঙ্গে ময়মনসিংহে যাই। এই তাঁর শেষবারের মতন দেশে যাওয়া।

কাকা নরেন্দ্রকিশোর আর দেশের আত্মীয়স্বজন বড় সুখী হয়েছিলেন। জ্যাঠতুতো আর খুড়তুতো ভাইয়েরাও অনেকে গিয়েছিল।

১৯১৪ সনে বাবা শেষবারের মতন দার্জিলিং যান। আমরা 'নর্থ ভিউ' নামে বাড়িটায় ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার আর তাঁর স্ত্রী হেমলতা সরকারের কাছে উঠেছিলাম। আমরা তাঁকে 'হেম-মাসী' বলতাম; তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা ছিলেন। বাবার সঙ্গে সেবার শুধু আমার মা, আমার ছোটদিদি শান্তিলতা আর আমি গিয়েছিলাম।

বাবা অতি খাঁটি মানুষ ছিলেন। অল্প সময়ের পরিচয়ের মধ্যেই সকলে বুঝতে পারত যে তাঁর মনটা খুব উঁচু। অনেক বিদেশী লোকও তাঁর সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর টাকার লোভ বা যশের লোভ একেবারেই ছিল না। বিপদে শান্ত থাকতেন।

অসুখ করলে, রোগীর যা যা নিয়ম পালন করা উচিত তার সবগুলোই বাবা পালন করে চলতেন। বাবার একবার খুব কঠিন অসুখ করেছিল। ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁকে সারিয়ে দেন। সেরে ওঠার পর বাবা ট্রেনে উঠে একটা ভাল জায়গায় যাচ্ছিলেন। পথে ডাক্তার নীলরতন সরকার ট্রেইনে উঠে বাবার কাছে বসে একটা পাত্র থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রসগোল্লা বের করে একটা প্লেটে রাখলেন। পরে বাবাকে বললেন, 'দীঘাপাতিয়ার মহারাজার বাড়িতে চিকিৎসা করতে গিয়েছিলাম, সেখানেই রসগোল্লাগুলো পেয়েছি। আপনি খাবেন?' বাবা বললেন, 'আমার খাওয়া উচিত কি অনুচিত তা আপনিই বেশী জানেন।' ডাক্তার সরকার বললেন, 'খেয়ে দেখুন; কিছু হবে না।' বাবা তখন রসগোল্লা খেলেন। তাঁর কিছু ক্ষতি হল না।

১৯১৪ সন শেষ হতেই আমরা ১০০ নং গড়পার রোডে আমাদের নতুন বাড়িতে উঠে গেলাম। এই বাড়িটা বাবা নিজের আঁকা নকশা আর নিজের পরিকল্পনা অনুসারেই তয়ের করিয়ে নিয়েছিলেন। একতলায় সামনের (উত্তরের) ঘরগুলোতে আফিস আর ছাপাখানা ছিল। পেছনের (দক্ষিণের) অংশে খাবার ঘর, স্নানের ঘর, রান্নাঘর, এই সব ছিল। দোতলায় সামনের অংশে হলের মতন (hall) লম্বা ঘরে ফটোগ্রাফির আর ব্যবসার অন্য কতকগুলো কাজ হত। নীচে ছাপাখানার ঘরটাও হলের মতন লম্বা ছিল। দোতলায় পেছনের দিকে থাকবার ঘর আর স্নানের ঘর। তেতলায় ছাত আর ঘর। বাড়ির দক্ষিণে অনেকখানি জমি ছিল।

গড়পার রোডের বাড়িতে আসার পরেই মেঝো দাদা সুবিনয় রায়ের বিয়ে হল। বাবার সঙ্গে আমরা কয়েকজন মিলে মধ্যপ্রদেশের 'চাঁদা' শহরে গেলাম। সেখানে ডাক্তার লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর মেয়ে পুষ্পলতার সঙ্গে সুবিনয়ের বিয়ে হল। নতুন বৌদিদিকে নিয়ে আমরা কলকাতায় গড়পারের বাড়িতে ফিরে এলাম। সুবিনয় রায়ের লেখা তিনটা বইয়ের কথা তোমরা হয়তো জান — (১) 'খেয়াল' (২) 'রকমারি', (৩) 'তাড়াতাড়ি'।

দাদারা বাবাকে কারবার চালাতে খুব সাহায্য করতেন। বড়দাদা সুকুমার রায় বিজ্ঞানের খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। তাই বাবা তাঁকে বিলাতে পাঠিয়ে ভাল করে কাজ শিখিয়ে এনেছিলেন। মেজোদাদা সুবিনয় বাড়িতেই কাজ শিখে নিয়েছিলেন।

১৯১৫ সনে বাবা শেষবারের মতন গিরিডি গেলেন। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের গিরিডির বাড়িতে তিনি উঠেছিলেন। কলেজে পূজোর ছুটি আরম্ভ হলে আমি গিরিডি গেলাম। একদিন সকালে আমি বেড়িয়ে এসে বেলা ১০টা ১১টায় বাড়ির বাগানের দরজায় ঢুকে দেখি একজন ডাক্তার এসেছেন। শুনলাম, বাবার খুব অসুখ। ডাক্তারের ওষুধ চলতে লাগল। আমার জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জন রায় তখন গিরিডিতে ছিলেন। তিনিও এসে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতেন; কিছুদিন পরে একটু উপকার দেখা গেল।

কলেজ খুললে আমি কলকাতায় চলে এলাম। বাবার অসুখ কিছুতেই সারছিল না, তাই তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। বড় বড় ডাক্তারেরা দেখলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কঠিন অসুখের মধ্যেও বাবা খুব শান্ত থাকতেন; বলতেন, 'আমি খুব আনন্দে আছি।' একদিন বললেন, 'তোমরা আমাকে যে-সব ওষুধ আর পথ্য দিয়েছ, আমি সেগুলো অমৃতজ্ঞানে খেয়েছি।' একদিন সকালে কতকগুলো পাখি জানালার কাছে কিচিরমিচির করে গেল। বাবা বললেন, 'পাখি কী বলল তোমরা শুনেছ? পাখি বলল—"পথ পা, পথ পা"'। ১৯১৫ সনের বিশে ডিসেম্বর (বাংলা ১৩২২ সনের চৌঠা পৌষ) সকালে তিনি গভীর শান্তিতে পরলোকগমন করলেন।

১৩৭০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'সন্দেশ' থেকে পুনর্মুদ্রিত। ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত।

ছবি: সত্যজিৎ রায়

নববর্ষের চিঠি

ফুরায় দিন বদলে যায়
সন তারিখ,
ঝড়ঝাপট উড়োয় দিন
দিগ্বিদিক।
হিসাব চায় বছর ভোর
কর্মযোগ,
দিন যাপন তাই অমন —
কী দুর্ভোগ!
বলছ কি সব মজাই
পরাজিত?
ভুল কথা, সংগ্রামের
বাঞ্ছিত
মন গড়ে কী দুর্বার
পথচলা
জয়কেতন উর্ধ্বমুখ
জোর গলা।
তৈরি তাই সবকটাই
সন্দেশী
বর্ষভোর ভাঙছে দোর
কমবেশি।
দুয়ারপার সৃষ্টি কার
চায় আশা
মুক্তি চায় দিন গড়ায়
প্রত্যাশা।
হোক কঠিন যাত্রাপথ
কমবেশি,
ভুল না হয় আমরা সব
সন্দেশী।

— সঃ সঃ

'১৫০

উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেবেলা

প্রসাদরঞ্জন রায়

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক অতি পরিচিত নাম। শিশুসাহিত্যিক, পত্রিকা সম্পাদক, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর, মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞ—নানান পরিচিতি তাঁর। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে তখনকার ময়মনসিংহ জেলার (আজকের কিশোরগঞ্জ জেলা) মসুয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তবে অনেক বিখ্যাত মানুষের মতনই তাঁর ছেলেবেলা সম্পর্কে আমরা জানি অত্যন্ত কম। বাংলায় তাঁর জন্মদিন পালিত হয় ১২ই মে, অথচ তাঁর জন্ম ১৩৭০সালের ২৮শে বৈশাখ (রবীন্দ্রনাথের ঠিক দু-বছর তিন দিন বাদে) যা ইংরেজি মতে ১০ই মে হওয়া উচিত। জন্মসূত্রে তাঁর নাম উপেন্দ্রকিশোর নয়, তাঁদের পারিবারিক উপাধিও রায় বা চৌধুরী নয়, তবুও এই নামেই তাঁর পরিচিতি দেশজোড়া।

উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল বিহারে, সেখান থেকে এঁরা আসেন নদীয়ার চাকদহ অঞ্চলে। চারশো বছরেরও আগে এই বংশের আদি পুরুষ রামসুন্দর দেব (অথবা দেও) ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি দেন ময়মনসিংহের শেরপুর অঞ্চলে এবং সেখানে জমিদারি সেরেস্তায় কাজ আরম্ভ করেন। যশোদলের জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করে তিনি সেখানেই বাস করতেন। তাঁর উত্তরপুরুষরা জঙ্গলবাড়ি —এগারসিন্দুর হয়ে শেষ পর্যন্ত থিতু হন ব্রহ্মপুত্রের তীরে মসুয়া গ্রামে। এঁদের অনেকেই জমিদারি বা নবাবের সেরেস্তায় কাজ করতেন এবং সেই সূত্রে মজুমদার, খাসনবিশ, রায় বা রায়চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় মসুয়া গ্রাম ভেসে গেলে কাছেই নতুন মসুয়ার পত্তন করে দুই ভাই ব্রজরাম ও বিষ্ণুরাম রায় সেখানে পাশাপাশি ভিটেবাড়ি করে বাস আরম্ভ করেন। আজও সে ভিটের অংশবিশেষ, চণ্ডীমণ্ডপ ও কাছারিবাড়ির অস্তিত্ব আছে।

এই ব্রজরামেরই বংশধর উপেন্দ্রকিশোরের বাবা কালীনাথ রায় যিনি শ্যামসুন্দর মুন্সী নামেই পরিচিত ছিলেন। জরিপের কাজে দক্ষ কালীনাথ আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, ইংরেজিও জানতেন। তিনি নাকি মুখে মুখে ফারসি থেকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতেন। সচ্ছল অবস্থা হলেও কালীনাথ পড়াশুনো নিয়ে থাকতেই ভালোবাসতেন। অন্যদিকে বিষ্ণুরামের বংশধর এবং কালীনাথের জ্ঞাতিভাই হরিকিশোর রায়চৌধুরী ওকালতি এবং জমিদারি পরিচালনায় সফল হয়ে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না। কালীনাথের তখনই তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। পরে তাঁর আরও দুই ছেলে ও এক মেয়ে হয়। হরিকিশোরের অনুরোধে কালীনাথ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জনকে দত্তক দিতে রাজি হন। তখনই তাঁর নাম কামদারঞ্জন রায় থেকে পরিবর্তিত হয়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী হয়। এ সব ১৮৬৮ সালের কথা। এর দু-বছরের মধ্যেই কিন্তু হরিকিশোরের নিজের পুত্র নরেন্দ্রকিশোরের জন্ম, তবে এর জন্য কোনও পরিবর্তন হয়নি। উপেন্দ্রকিশোর ছোটোভাই 'নরু'কে ভীষণ ভালোবাসতেন, নরুরও ছিল দাদা-অন্ত প্রাণ।

অবশ্য শুধু নরু নয়, পাশাপাশি দুই বাড়ির সকলেরই প্রিয় ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। তাঁর নিজের বাবা-মা আর পালক বাবা-মা ছাড়াও নরু এবং নিজের চার ভাই-তিন বোনের সঙ্গে আজীবন সদ্ভাব ছিল তাঁর। তাঁর সুন্দর চেহারা ও স্বভাবের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন তিনি। ছোটোবেলা থেকেই কবিতা, গান ও ছবি আঁকার প্রতি আকর্ষণ ছিল। দুষ্টুমিও যে করতেন না তা নয়—কেউ শাসন করলেই দু-বাড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে এমন কান্নাকাটি জুড়তেন যে দুই মা ছুটে এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। তবে রায় বা রায়চৌধুরী

বাড়ির পুরুষদের চেহারা ছিল বিশাল, সবাই খেতে পারতেন প্রচুর আর মাঝেমধ্যেই বেজায় চটে যেতেন—তাঁর বাবা কালীনাথ এক থাপ্পড়ে নিজের ছেলেকে বিশ ফুট দূরে ফেলে দিয়েছেন এ-রকমও শোনা যায়। উপেন্দ্রকিশোর কিন্তু স্বভাবে ছিলেন শান্ত।

সেকালে মসুয়া গ্রামের চেহারা আজ কল্পনা করাও শক্ত। প্রায় সবই কাঁচা বাড়ি ছিল, অবশ্য রায়চৌধুরী বাড়ি ছিল চকমিলানো দোতলা। গ্রামের পাশ দিয়ে সগর্জনে বয়ে যেত ব্রহ্মপুত্র নদ—এখন সেখানে তিরতির করে সামান্য জল যায়। গ্রামটি ছিল সবুজে ঢাকা—আম-জাম-কাঁঠালের গাছে ভর্তি। ওখানকার সোনামুগের ডাল, আলু আর আনারসের সুখ্যাতি ছিল। আজও সেই খ্যাতি আছে আর ভৈরব বাজার থেকে মসুয়ার রাস্তার দু-ধারে কাঁঠাল গাছের সারি। তখন কাছাকাছির মধ্যে মধুপুরের বন ছিল, এখন সবটাই আবাদ করা জমি। বাঘ, বুনোশুয়োর বা চিতাবাঘের উপদ্রব হত মাঝে মাঝেই। ওঁদের এক ঠানদিদি নাকি ডাবের খোলা দিয়ে পিটিয়েই বাঘ মেরেছিলেন। আবার কালীনাথের ঠাকুরদা রামকান্ত তাঁর ভাইপোর সাহায্যে স্রেফ খড়ম-পেটা করে মেরেছিলেন এক বিরাট বুনোশুয়োর। এসব গল্প লোকের মুখে মুখেই ঘুরত। টিমটিমে প্রদীপের বা হারিকেনের আলোয় সেসব গল্প শুনে গা ছমছম করত বইকী! তাই বোধহয় উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই'-য়ের দুষ্টু বাঘ বারেবারেই নাস্তানাবুদ হয়েছে মানুষের কাছে, এমনকী মজাস্তলি বেড়ালের কাছে! মসুয়া থেকে জমিদারি সদরে যাওয়া-আসা চলত নৌকো আর রায়দের জোড়া হাতি যাত্রামঙ্গল আর কুসুমকলিতে চড়ে। তার মধ্যেও রোমাঞ্চ ছিল।

ছোটোবেলায় বাড়ির আর সকলের মতন উপেন্দ্রকিশোরেরও শিক্ষালাভ তাঁদের পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে (আজ যা বিরাট মাধ্যমিক স্কুল)। পড়াশুনোয় বরাবরই তিনি ভালো ছিলেন। তবে একটু বড়ো হতেই বাইরের আকর্ষণ তাঁর উপরে প্রবল হয়ে ওঠে। বড়ো হয়ে তিনি পড়তে যান ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে, অথচ পরিবারের অন্যান্যরা পড়েছেন কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলে। ময়মনসিংহ শহরে হরিকিশোরের একটি বাড়ি ছিল। সেখানে চাকর-বাকরদের তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি পড়াশুনো করেন। আর ময়মনসিংহ শহরেই তিনি পান বাইরের জগতের স্বাদ। বেহালা আর বাঁশি বাজানো তিনি নিজেই আয়ত্ত করেছিলেন। গান গাইতেও পারতেন ভালো। যেকোনও গানের গৎ শুনেই তিনি তা বেহালায় তুলে নিতে পারতেন। ছবি আঁকতেও শিখেছেন নিজের খেয়ালে— এ-বাড়ির সকলেই অল্পবিস্তর ছবি আঁকতে পারতেন। কিন্তু নাতি সত্যজিতের মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। পড়াশুনোয় দারুণ ভালো ছিলেন, বিশেষত অঙ্ক আর বিজ্ঞানে; আর সে জন্যই মাস্টারমশাইদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সহপাঠী বন্ধু গগনচন্দ্র হোম, শহরের সম্পন্ন গৃহস্থ শরৎচন্দ্র রায় আর হেডমাস্টার রতনমণি গুপ্তের প্রভাব ছিল তাঁর উপর অত্যন্ত বেশি। আর এঁদের মাধ্যমেই বাইরের জগতের ও ব্রাহ্মসমাজের আহ্বান তাঁর কাছে পৌঁছায়। তাঁর পালকপিতা হরিকিশোর ছিলেন গোঁড়া হিন্দু সমাজের সমাজপতি। তিনি এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর তাতে দমে যাবার ছেলে ছিলেন না।

অনেক পরে, এই ময়মনসিংহ শহর থেকেই তাঁর স্ত্রী বিধুমুখীর ভাই সতীশচন্দ্রকে মজা করে ছড়ায় চিঠে লিখেছিলেন:

সৈত্যদ্দা *হাঃ হাঃ হাঃ!*
একডা কথা *শুইন্যা যা।*
কইলকাত্তা *বইস্যা খা*
ক্ষীর ছানা *আর মণ্ডা।*
ময়মনসিং *ঘোড়াড্ডিম!*

দেখবার ভাই কিস্যু নাই।
সারভেন্ট ইজ ইস্টুপিড—
রাইন্ধা খোয় যাইচ্ছ্যা তাই!!!

যা হোক, ময়মনসিংহ শহরে উপেন্দ্রকিশোরের স্কুলজীবন কেটেছিল ভালোই। বাঁশি আর বেহালা বাজিয়ে গান গেয়ে আনন্দেই তাঁর সময় কাটত। একটা ঘটনার কথা জানা যায়। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে বাংলার ছোটো লাট পরিদর্শনে আসেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই ছোটো লাট অ্যাশলি ইডেন ছিলেন প্রাক্তন গর্ভনর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের (যাঁদের পারিবারিক নাম অনুসারে ইডেন গার্ডেন্স নামাঙ্কিত) ভাইপো এবং তাঁর নামেই কলকাতার ইডেন হাসপাতাল—যা বর্তমানে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের অংশ। যা হোক, ইডেনসাহেব যখন তাঁদের স্কুলে কিছু বলছিলেন, উপেন্দ্রকিশোর তখন খস খস করে পেনসিলে তাঁর এক চমৎকার স্কেচ এঁকে ফেলেন। সাহেবের সেদিকে নজর পড়লে মাস্টারমশাইরা ভয়ে অস্থির হয়ে যান। ইডেনসাহেব কিন্তু তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন, 'ছবি আঁকাটা ছেড়ো না। এ জন্যই তুমি একদিন মস্ত নাম করবে।'

সেকথা পরে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। পড়াশুনোয় ভালো হলেও তিনি নাকি মোটেও পড়াশুনো করতেন না, জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'অন্য ছাত্ররা জোরে জোরে পড়ে—তা শুনেই আমার পড়া হয়ে যায়।' কিন্তু এন্ট্রান্স পরীক্ষা যখন সামনে তখনও তিনি বাঁশি বাজিয়ে বেড়াতেন। এজন্য হেডমাস্টারমশাই তাঁর প্রিয়ছাত্রটিকে তিরস্কার করেন। লজ্জা পেয়ে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর বাঁশি ভেঙে ফেলে লেখা পড়ায় মন দেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি স্কুল থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফল তো করলেনই, প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে জেলা থেকে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি নিয়ে কলকাতায় প্রেডিডেন্সি কলেজে পড়তে এলেন।

এরপরই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। ক্রমান্বয়ে তাঁর জীবনে এল—কলকাতায় উচ্চশিক্ষা, শিশুসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, বিবাহ ও পারিবারিক জীবন, মুদ্রণ কারিগরিতে নতুন পথের সন্ধান, ইউ রায় অ্যান্ড সন্স প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন, ছোটোদের জন্য বই লেখা, 'সন্দেশ' পত্রিকা স্থাপন—কিন্তু সে সব পরের কথা। আজ তাঁকে আমরা মনে রেখেছি রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের গল্পের কথক, 'টুনটুনির বই'-এর লেখক এবং গুপি গাইন-বাঘা বাইন, সাতমার পালোয়ান, ভুতো-ঘোঁতো, ঝানু চোর চানু, মজাম্তলি সরকার, নরহরি দাস প্রভৃতি বিচিত্র চরিত্রের স্রষ্টা বলে, কিন্তু তাঁর মনে মধ্যে ছিল সেই ছোট্ট ছেলেটি যে প্রকৃতিকে ভালোবাসত, ভালোবাসত বাঁশি বাজাতে আর ছবি আঁকতে। ছেলেবেলার সেই উপেন্দ্রকিশোর তাই হারিয়ে যাননি।

ছবি: সত্যজিৎ রায়

চিত্রশিল্পী উপেন্দ্রকিশোর এবং মুদ্রণশিল্পী ইউ. রে

শুভেন্দু দাশমুন্সী

পুরোনো 'সন্দেশ' নিয়ে যে কোনও রকমের আলোচনা পড়তে বসলেই দেখা যাবে সকলে কোনও-না-কোনও প্রসঙ্গে একবার-না-একবার বলবেনই তার ছবির কথা। 'সন্দেশ' বেরোবার আগে ছোটোদের যে-সব পত্রপত্রিকা ছিল, সেখানে ছবি একেবারে ছাপা হত না, তা নয়। 'সখা', 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' বা 'বালক'- এর পাতায় ছবি ছাপা হত। তবু 'সন্দেশ'-এর ছবির জৌলস আর চেহারাই আলাদা। সেকালে যাঁরাই ছোটোদের জন্য পত্রপত্রিকা করতেন, তাঁরা বেশ বুঝতে পারতেন ছবিটা এখানে দরকার। ছোটোদের মনের পছন্দ অপছন্দের দিকটা তো আছেই, তাছাড়া আরও প্রয়োজন ছিল। কিশোরকিশোরীদের জন্যে ইতিহাস বা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে বসলে ছবি তো শুধু দেখন-শোভার জিনিস নয়, সেখানে ছবি আর লেখার হাত ধরাধরির সম্পর্ক। এই সত্যিগুলোকে মেনে নিতেই হবে ছোটোদের জন্য ভালো কাগজ করতে হলে। সে সেকালেই হোক আর একালেই হোক। 'সন্দেশ' আর 'সন্দেশ'-এর প্রথম সম্পাদকমশাই এই বিষয়টি এত গভীরভাবে ভেবেছিলেন যে, আজ সেকথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

'সন্দেশ'-এর জন্য ছবি আঁকার অনেক আগেই উপেন্দ্রকিশোর ছবি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। ধরা যাক 'টুনটুনির বই' যখন বেরোচ্ছে তখন 'সন্দেশ' কোথায়? অথবা তারও আগে ১৮৯৭ তে যখন তিনি লিখছেন 'ছেলেদের রামায়ণ' বা ১৯০৮-০৯ তে যখন লিখছেন 'ছেলেদের মহাভারত' বা মহাভারতের গল্প তখনই বা 'সন্দেশ' কোথায়? অথচ ওইসব বইতেই বইকে ছবি দিয়ে সাজানোর ব্যাপারে, সাদাকালো আর রঙিন ছবি ব্যবহার করার ব্যাপারে উপেন্দ্রকিশোরের ভাবনা চিন্তার সূচনা।

ভেবে দেখার মতো এমনি ছবি আঁকা আর বইয়ের জন্য ছবি আঁকার মধ্যে কিন্তু অনেকখানি তফাত। ধরা যাক কোনও শিল্পী ছবি আঁকছেন নিজের মন থেকে। সেই ছবি কীভাবে পৌঁছয় তাঁর দর্শকের কাছে? বলা বাহুল্য, সেই শিল্পী একটি প্রর্দশনী করেন। সেই প্রদর্শনীতে তাঁর দর্শকেরা দেখতে আসেন সেই ছবি। কিন্তু যে-শিল্পীকে বইয়ের জন্য ছবি আঁকতে হচ্ছে বা যাঁকে কোনও বই বা পত্রিকার প্রচ্ছদ বা কভার আঁকতে হচ্ছে তাঁর সমস্যাটা একবার ভেবে দ্যাখো। আমরা তো তাঁর আঁকাটা দেখব না, আমাদের সামনে আসবে সেটির ছাপা-চেহারাটা। সেই ছবিটিকে ছাপতে হলে মাঝখানে এসে পড়বেই অনেক যন্ত্রপাতি। ছাপার কৌশল ছবির সঙ্গে রেখা মিলিয়ে, রং মিলিয়ে ছাপার ব্যাপার-স্যাপারগুলো যে জুড়ে যাবে এর সঙ্গে।

মানে উপেন্দ্রকিশোরকে শুধু ছবি নিয়ে ভাবলেই চলত না, তাঁকে ভাবতে হত ছাপার কলাকৌশলও। তাঁর সেই ভাবনার দিকটা নিয়ে আমরা কিন্তু সেভাবে ভাবি না। আমরা তাঁর লেখা পড়ে আর ছবি দেখেই খুশি। কিন্তু কীভাবে সে ছবি ছাপা হবে, তা নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তার দিকটাও কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি ছবি ছাপার ব্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানীর মতো ভেবেছেন, সেই ভাবনাচিন্তা লিখিত আকারে পাঠিয়েছেন বিলেতের বিখ্যাত কাগজে; সেখানে তা ছাপা হয়েছে সম্মানের সঙ্গে। আর উপেন্দ্রকিশোর এসব শুধু খাতায় কলমে বেঁধে রাখেননি, রীতিমতো হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ১৮৯৫ সাল থেকে তাঁর নিজস্ব যে-ছাপাখানা তিনি বানালেন, সেই ইউ রায় অ্যান্ড সন্স থেকে এরপর চমৎকার আর ঝকঝকে সব ছাপার কাজ আরম্ভ হল। ভেবে দ্যাখো সন্দেশীরা, আমাদের কাছে এটা কত বড়ো একটা গর্বের বিষয়। বাঙালি নাকি যন্ত্রবিমুখ, বাঙালি নাকি ব্যবসা থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে — বাঙালি সম্পর্কে এমন দুটো চালু মতবাদের এক্কেবারে উলটোদিকে ছিলেন আমাদের প্রথম সম্পাদকমশাই। আর তাঁর সেই পরীক্ষাগারের সবচেয়ে মূল্যবান উৎপাদন হল আমাদের প্রিয় পত্রিকাটি।

এই দিক থেকে যদি ভেবে দেখি, তাহলে এ-বছর সন্দেশের প্রথম প্রকাশের শতবর্ষের গুরুত্ব শুধু সাহিত্যে বা শিশুসাহিত্যেই নয়, চিত্রকলা-কারিগরি দক্ষতা আর বাঙালির

শিল্পোদ্যোগের দিক থেকেও খুব জরুরি। তাই না? এবার আবার একটু ছবির কথায় যাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৬ সাল নাগাদ একটা অদ্ভুত বই করার কথা ভাবলেন। একটি নদীর গতিপথ উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত — পুরোটা ছন্দে বাঁধা লম্বা একটা কবিতা নিয়ে একটা বই। ছবি আঁকার জন্য কবি অনুরোধ করলেন বন্ধু উপেন্দ্রকিশোরকে। একটি চিঠিতে কবি লিখেওছিলেন তিনি নদীপথের কোন কোন জায়গার ছবি চাইছেন। উপেন্দ্রকিশোর তার ভিতর অনেকগুলি ছবি আঁকেনও। সাদাকালোয় জলরঙে, অসামান্য সেইসব ছবি পাওয়া যায় বহু বছর পরে। ঠিকই ধরেছ, শিল্পী বন্ধুর সেই ছবিগুলো আর ছাপা হয়নি কবি বন্ধুর বইতে। কেন এমন হল? দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত কবি বইটির প্রকাশের দিনটি ঠিক করে ফেলেছিলেন—তিনি বইটি ভাইপো বলেন্দ্রনাথকে তাঁর বিয়ের দিনটিতেই উপহার দিতে চাইছিলেন। ফলে বইটি ঠিক দিনে পাওয়া নিয়ে কাকার একটা তাড়া হয়তো ছিলই। আবার এমনও তো হতে পারে উপেন্দ্রকিশোর অসামান্য যে-ছবিগুলি আঁকেন তা ছাপা সেকালের প্রচলিত ছবি ছাপার পদ্ধতিতে হয়তো অসম্ভবও ছিল। মোট কথা 'নদী' প্রকাশিত হল উপেন্দ্রকিশোরের ছবি ছাড়াই।

এই অসুবিধাটাই কি বিজ্ঞানমনস্ক উপেন্দ্রকিশোরকে আরও বেশি করে ঠেলে দিল মুদ্রণচর্চার দিকে? সেই চর্চারই সুদূরপ্রসারী ফল বাঙালির মুদ্রণচর্চার একটা দিশার উন্মোচন। ওই ইউ. রে অ্যান্ড সন্সের কার্যকলাপ।

উপেন্দ্রকিশোর কতভাবে ছবি এঁকেছেন। কখনও বইয়ের সঙ্গে সাদাপাতায় কালোরেখা টেনে ছবি যেমন করেছেন, তেমনই আঁকছেন তুলিতে। আবার তেলরঙে ছবি আঁকতেও পারঙ্গম তিনি। ভেবে দেখো এমনি কালি দিয়ে ছবি আঁকা মানে তার ছাপার কাজটা তুলনামূলক সোজা। মনে পড়বে পুরোনো 'সহজপাঠ'-এ নন্দলাল বসুর আঁকা। একটা পাটাতনের ওপর যেটুকু ছবি, সেটুকু উঁচু করে রেখে বাকি অংশটা নিচু করে কাটলেই হল। উঁচু অংশে কালি দিয়ে পাতায় চাপ দিলেই ছবি ছাপা সম্ভব। কিন্তু ধরা যাক যদি ছবিটা আঁকা হয় তুলি দিয়ে? তাহলে তো সবজায়গায় রঙের ঘনত্ব সমান না-ও থাকতে পারে। ছবিতে তো শিল্পী সেই রঙের কম বেশিটাকে ব্যবহার করেন। উপেন্দ্রকিশোর নিজেও এঁকেছেন সেইরকম ছবি। আর সবচেয়ে ওপরে আছে রঙিন ছবি।

উপেন্দ্রকিশোর এই সবরকম ছবি এঁকেছেন আর সেইসব যত্ন করে চমৎকার ছেপেওছেন। তাঁর ছবির আরও একটা মজার দিক আছে। ধরো তিনি কোনও পৌরাণিক ছবি আঁকছেন, তাহলে তখনকার বাঙালি সাধারণভাবে যে ধরনের পৌরাণিক ছবি দেখতে অভ্যস্ত সেই ধরনটিকে ব্যবহার করতেন ছবিতে। আবার জাপানি কোনও গল্পের ছবি করার সময় তিনি ছবি আঁকবেন একেবারে জাপানিদের ছবি আঁকার ধরনে। হিন্দু পুরাণ অবলম্বনে তিনি যখন মহাদেবের ত্রিপুর বিনাশের ছবি আঁকেন, আমরা অবাক হয়ে দেখি মহাদেবের চেহারা যেন বিদেশি গ্রিক দেবতাদের মতো সুঠাম। কালীঘাটের পটে যে ধরণের মোটাসোটা হৃষ্টপুষ্ট মহাদেব দেখি এঁর চেহারা সে-রকম নয়। পশ্চিমের শিল্পীদের ধরনে, ভারতের রবি বর্মা যে ধরনটিকে ব্যবহার করতেন সেই ধরনটিকে চমৎকার দক্ষতায় কাজে লাগালেন উপেন্দ্রকিশোর! আর একদিকে ছিল তাঁর আঁকা প্রকৃতির দৃশ্য। শান্ত সমাহিত একটা ভাব গোটা ছবি জুড়ে ছেয়ে থাকত।

ঠাকুরদাদার জন্মশতবর্ষে আমাদের আরেক সম্পাদক মশাই সত্যজিৎ রায় উপেন্দ্রকিশোর-এর ছবি সম্পর্কে চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন: একদিকে বিলিতি অ্যাকাডেমিক শিল্পের প্রভাব, অন্যদিকে জাপানি উডকাট, রাজপুত ও মুঘল মিনিয়েচার ও বাংলার লোকশিল্প এবং আরও অন্যদিকে তাঁর নিজস্ব অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি সব মিলে এমন একটি ভঙ্গির উদ্ভব হয়েছিল যা উপেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব ভঙ্গি এবং যার ফলে তাঁর ছবি দেখলে কখনোই অন্য লোকের আঁকা বলে ভুল হত না।'

সন্দেশের শতবর্ষে আর উপেন্দ্রকিশোরের সার্ধশতবর্ষে এই ২০১৩-তে সন্দেশীরা একজোটে যদি উপেন্দ্রকিশোরকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারে, তাহলে বাঙালির ইতিহাস আরও একজন যুগপুরুষকে পাবে। শুধুই 'টুনটুনির বই'য়ের লেখক হিসেবে চিহ্নিত করে যাঁকে আমরা এখনও ভুলেই রয়েছি।

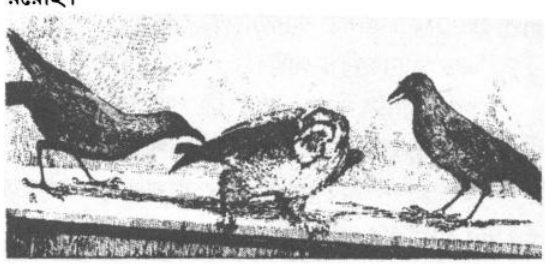

ছবি: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

'১৫০

অন্য উপেন্দ্রকিশোর

শ্রী কাক্কেশ্বর কুচকুচে

'উপেন—'

'কোন উপেন? যার দু-বিঘে জমি ছিল?'

'না, না। উপেন্দ্রনাথ—'

'ও উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী? যিনি কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন?'

'দ্যুৎ, তা কেন হবে? আমি বলছি উপেন্দ্রকিশোর—'

'রায়চৌধুরীর কথা? ও আর বলার কী আছে? ওঁর কথা সব্বাই জানে।'

'তুই জানিস?'

'জানি না মানে? আলবাত জানি। সব জানি।'

'সব জানিস?'

'স-অ-ব। উনি ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে ১৮৬৩ সালে জন্মেছিলেন। তখন ওঁর নাম ছিল কামদারঞ্জন। কিন্তু ওঁর এক কাকা ওঁকে দত্তক নিয়ে নাম রাখেন উপেন্দ্রকিশোর। কলকাতায় আসার পর ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। উনি যেমন ভালো লিখতেন, তেমনই ভালো ছবি আঁকতেন। খুব ভালো বেহালা বাজাতেন। ১৯১৩ সালে ছোটদের জন্য 'সন্দেশ' পত্রিকা বার করতে শুরু করেন—'

'এই 'সন্দেশ'-এর ছাপা নিয়েই—'

'জানি, জানি, একেবারে হইহই পড়ে গিয়েছিল। যেমন সুন্দর সব লেখা, তেমনই সুন্দর সব ছবি! এর আগে ছবি ছাপা হত কেমন ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া কাঠ কাঠ।'

'এত সুন্দর ছবি ছাপাই—'

'হবে না! ওঁর নিজের প্রেস 'ইউ রায় অ্যান্ড সনস'-এ বিলেত থেকে আমদানি করা মেশিনে ছাপা হত যে!'

'শুধু মেশিন উন্নত হলেই কি ভালো ছাপা হয়? আসলে ওঁর ছবি ছাপানোর পদ্ধতিটাই ছিল অনেক উন্নত।'

'হবেই তো। খোদ বিলেতে আমেরিকায় এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হত যে। এটা কি জানিস, এই উন্নত পদ্ধতি উপেন্দ্রকিশোরেরই আবিষ্কার?'

'না, মানে, এটা তো জানতাম না!'

'তাহলে মেলা ফ্যাচফ্যাচ না-করে মন দিয়ে শোন। এদেশে তখন ছাপা হত হয় কাঠখোদাইয়ের ব্লকে নয়তো ধাতুর পাতের ওপর আঁচড় কেটে 'এচিং' পদ্ধতিতে। তাতে সূক্ষ্মভাব আনা ছিল অসম্ভব। তাই ছবিগুলো হত মোটা দাগের, আড়বই। রঙিন ছবি ছাপা তো ছিল স্বপ্ন। অবশ্য বিলেতে ছাপা ছবিগুলো অনেক ভালো হত, কারণ, সেখানে ব্যবহার করা হত ফটোগ্রাফিক 'হাফটোন' পদ্ধতি। তাতে ছবিগুলো হত অনেকটাই আসলের মতো। তবে তাতেও বিস্তর খুঁত ছিল, রংটংগুলোও তেমন ঠিকঠাক হত না।'

'তা, উপেন্দ্রকিশোর ঠিক কী করেছিলেন, সেটা তো বলবি।'

'বলছি, বলছি। আসলে, এতক্ষণ তোকে সেই সময়কার ছবি ছাপার অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বুঝেছিস তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। এবার বল, উপেন্দ্রকিশোর কী করলেন।'

'উপেন্দ্রকিশোর দেখছিলেন, তাঁর আঁকা অমন সুন্দর ছবিগুলো ছাপার পর প্রায় চেনারই উপায় থাকছে না। তাই ঠিক করলেন, ছবি ছাপার পদ্ধতির উন্নতি করবেন। ব্যস, যেমন ভাবা, তেমনই কাজ। শুরু হল ছবি ছাপাই নিয়ে তাঁর পড়াশুনা। এদেশে তো এ-সম্বন্ধে বইপত্র প্রায় কিছুই পাওয়া যেত না। সে-সময় তাই, বিলেত থেকে বই, পত্রিকা আনিয়ে ডুবে গেলেন তাতে। ছবি ছাপাই বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি পড়ার পর, পালা হাতে কলমে গবেষণার। সে কি কম ঝক্কির

ব্যাপার!'

'কেন?'

'আরে বাবা, গবেষণার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি, মানে, ক্যামেরা ট্যামেরা, সে সব তো এদেশে পাওয়াই যেত না। তাই বিস্তর খরচ করে সে সব আনালেন খোদ বিলেত আর আমেরিকা থেকে।'

'বাপস্! সে তো ভারি হাঙ্গামার ব্যাপার!'

সে আর বলতে! উপেন্দ্রকিশোরের এই উদ্যোগ সম্বন্ধে ওঁর থেকে দু-বছরের বড়ো বন্ধু রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'অনেকেই হয়তো জানে না, হাফটোন লিপি সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবুর নিজের আবিষ্কৃত বিশেষ সংস্কৃত পদ্ধতি বিলাতের শিল্পীসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে — ভারতবর্ষের প্রতিকূল জলবায়ুর এবং সর্বপ্রকার পরামর্শ ও সহায়তার অভাব সত্ত্বেও এই নতুন শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত এবং তাহাকে সংস্কৃত করিতে যে পরিমাণ অধ্যবসায় ও মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহা অধ্যবসায়ীর পক্ষে মনে আনাই কঠিন।'

'উপেন্দ্রকিশোর কি সংস্কৃত ভাষায় লিখতেন নাকি এসব?'

'সংস্কৃত ভাষায় মানে?'

'ওই যে বললি না, সংস্কৃত পদ্ধতি—'

'ওরে গো-মুখ্যু, কোনও কিছুকে আরও ভালো করাকে বলা হয় সংস্কার করা। সংস্কৃত মানে, আরও ভালো। উনি লিখতেন ইংরাজিতে। বিলেতের বিখ্যাত পত্রিকা 'পেনরোজ অ্যানুয়াল'-এ উনি নিজের গবেষণার ফলাফল নিয়মিত লিখে পাঠাতেন। সেগুলো এতই মৌলিক আর উন্নত ছিল যে, তারা সেগুলো নিয়মিত ছাপত।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ রে। পেনরোজ পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়াম গ্যাম্বল উপেন্দ্রকিশোরের বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, লিখেছিলেন, 'Mr. Roy is evidently processed of mathematical quality of mind and he reasoned out for himself, the problems of Half-tone work in a remarkable, successful manner.' উপেন্দ্রকিশোরের গবেষণার ফল প্রয়োগ করে আশ্চর্য সুফল পাওয়া গিয়েছিল।'

'একটু যদি খোলসা করে বলিস—'

'উপেন্দ্রকিশোর বুঝতে পেরেছিলেন, ছবি ছাপাইকে আরও উন্নত করতে হলে হাফটোন নেগেটিভ তৈরির সময়ে যে-স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়, তার উন্নতি ঘটাতে হবে। তবেই ছবি হয়ে উঠবে আরও সূক্ষ, আরও জীবন্ত। এর জন্য আলো ফেলার পদ্ধতি, মানে, exposure-এ ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে হবে। তাতে যেমন ছবি উন্নত হবে, তেমনই খরচও বাঁচবে। এছাড়া, স্ক্রিনেরও উন্নতি ঘটাতে হবে।'

'ও বাবা! এ তো অনেকদিনের ব্যাপার মনে হচ্ছে!'

'তা তো বটেই। ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯১২, সতেরো বছর ধরে একমনে গবেষণা করে গেছেন উপেন্দ্রকিশোর। এই সতেরো বছরে তাঁর ন-খানা অসাধারণ প্রবন্ধ পেনরোজ অ্যানুয়ালে প্রকাশিত হয়—

(১) Focussing the Screen —১৮৯৭

(২) The Theory of Half-tone Dot — ১৮৯৮

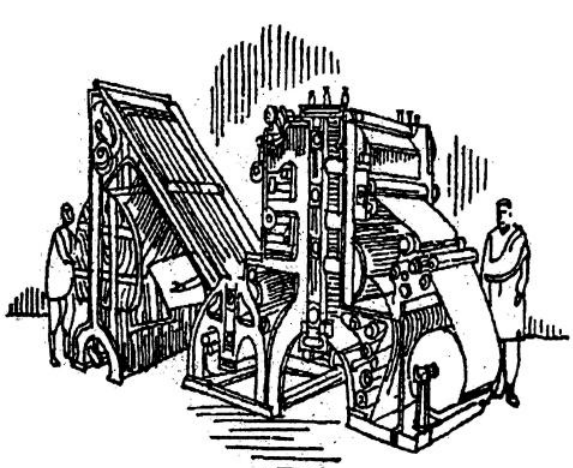

(৩) The Half-tone Theory Graphically Explained — ১৮৯৯

(৪) Automatic Adjustments of the Half-tone screen — ১৯০১

(৫) How Many Dots? — ১৯০১

(৬) Defraction of Half-tone — ১৯০২-০৩

(৭) More About Half-tone Theory — ১৯০৩

(৮) The Sixty Cross-line Screen —১৯০৫-০৬

(৯) Multiple Stops — ১৯১১-১২

উপেন্দ্রকিশোরের গবেষণার ফলে ছবি ছাপাইয়ের মান এক ধাক্কায় অনেকখানি উন্নত হয়ে গেল। আজকের অফসেট পদ্ধতির মূলেও রয়েছে এই গবেষণাগুলো।'

'বাপস্! কী ভয়ানক খটোমটো ব্যাপার!'

'কোনও ভালো কিছু পেতে গেলে এ-রকম অনেক খটোমটো পেরিয়েই আসতে হয়। সে যাক, শুধু গবেষণা করেই থেমে থাকেননি উপেন্দ্রকিশোর, ৬০ স্ক্রিন, মালটিপল্ স্টপ পদ্ধতি, স্ক্রিন অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন্ডিকেটরের মতো যুগান্তকারী আবিষ্কারও করেছিলেন।'

'মাথা ভোঁ ভোঁ করছে যে রে! ওঁর সরস সব লেখা পড়ে আর অপূর্ব সব ছবি দেখে একবারও মনে হয়নি, এই মিষ্টি মানুষটা এমন শক্ত শক্ত সব কাজ করেছেন।'

'ছবি ছাপাইয়ের উন্নতির ব্যাপারে উনি এতটাই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে, নিজের বড়ো ছেলে সুকুমারকে লন্ডনে এবং ম্যানচেস্টারে প্রিন্টিং টেকনোলজি পড়তে পাঠিয়েছিলেন। সুকুমারও ছিলেন বাপ কা বেটা। সবার সেরা হয়েছিলেন সেখানে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। শুধু তা-ই নয়, উপেন্দ্রকিশোর এদেশে নিজের আবিষ্কার করা পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে ছাপার জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়ে ১৮৯৫ সালে গড়ে তুললেন ইউ. রায় অ্যান্ড সনস্। এই ছাপাখানায় একের পর এক ছাপা হতে লাগল অসাধারণ সব ছবি। ধন্য ধন্য পড়ে গেল দেশে বিদেশে।'

'তা যা বলেছিস। এখনও ছবিগুলো দেখলে মনে হয় সদ্য আঁকা।'

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য ডায়াবিটিসের ওষুধ আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই, মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে চলে যেতে হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোরকে। না-হলে আরও কত আশ্চর্য অসাধারণ কিছু যে পেতাম আমরা। একশো বছরেরও আগে একজন অসাধারণ মানুষ এমন অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, যা আজও অবাক করে আমাদের।'

'এই উপেন্দ্রকিশোরকে আমি একদম চিনতাম না রে। থ্যাঙ্ক য়ু।'

ছবি: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সত্যজিৎ রায়

সন্দেশ পত্রিকার স্বত্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত বিবরণ

প্রকাশের স্থান	: কোলকাতা
প্রকাশকাল	: মাসিক
মুদ্রাকর	: সমীর রায়, নীলাঞ্জনা এন্টারপ্রাইজ,
জাতি	:ভারতীয়
ঠিকানা	: ১১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
প্রকাশক ও সম্পাদক	: সন্দীপ রায়
জাতি	: ভারতীয়
ঠিকানা	: ১/১, বিশপ লেফ্রয় রোড, কোলকাতা-৭০০ ০২০
স্বত্বাধিকারী	: সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিঃ ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০২৯

উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

সন্দীপ রায়

প্রকাশকের স্বাক্ষর

'১৫০

পুরাণকথার চিরকালীন কথক

দেবাশিস সেন

প্রায় একশো বছর আগের এক সকালে একটি কিশোর তার গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ায় মগ্ন ছিল। সেই সময় তার দাদামশাই ঘরে ঢুকে জানিয়েছিলেন যে তাদের ইউ. রায় মারা গেছেন। কৌতূহলী শিক্ষক প্রশ্ন করেছিলেন ইউ. রায় সেই কিশোরটির আত্মীয় না কি? শোকে মুহ্যমান কিশোরটি জানিয়ে ছিল ইউ. রায় সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদক। কিন্তু মুখে না বললেও শিক্ষকের ওই প্রশ্নের আরেকটি উত্তর সে কিন্তু মনে মনে ভেবেছিল। সেদিনের সেই কিশোরটি পরবর্তী দিনের বিখ্যাত সাহিত্যিক সুনির্মল বসু। তাঁর আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিকথা 'জীবন খাতার কয়েক পাতা'-য় তিনি ইউ. রায় অর্থাৎ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্বন্ধে তাঁর সেদিনের ভাবনাটি জানিয়েছিলেন — 'আমার আত্মীয় কেন? তিনি যে সারা বাংলার, সব বাঙালি ছেলেমেয়েদের আত্মীয়।'

বিন্দুমাত্র ভুল ভাবেননি সুনির্মল বসু। যিনি সন্দেশ-এর মতো একটি পত্রিকার জন্ম দিতে পারেন, যিনি টুনটুনির বই, ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারতের মতো গ্রন্থ রচনা করতে পারেন, যিনি পৌরাণিক চরিত্র থেকে শুরু করে জন্তু, জানোয়ার, পোকামাকড়, ফুল ইত্যাদির রঙিন ও সাদাকালো সব অসাধারণ ছবি আঁকতে পারেন, তিনি তো সব ছেলেমেয়েদের আত্মীয় হবেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

সুনির্মল বসু প্রায় একশো বছর আগের বাঙালি ছেলেমেয়েদের আত্মীয় হিসেবে ভেবেছিলেন উপেন্দ্রকিশোরকে। একশো বছর পরের বাঙালি শিশু-কিশোররাও কিন্তু তাঁকে আত্মীয় হিসেবে মেনে নিচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে বহু লেখকই জনপ্রিয়তা হারান। ব্যতিক্রমী কয়েকজন চিরকালীন সাহিত্যিক হিসেবেই পরিচিত হন। উপেন্দ্রকিশোর তেমনি একজন। এই প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য — 'উপেন্দ্রকিশোরের রচনা যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তখন যেমন লেগেছিল, এখন যেন তেমনি টাটকা তাজা। লেখার স্বচ্ছন্দ গতি আর সরসতা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এতটুকু ক্ষুন্ন বা নষ্ট হয়নি।'

১৮৮৩ তে 'সখা' পত্রিকায় 'মাছি' নামে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ দিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের শিশুসাহিত্য জীবনের সূত্রপাত। পরের ৩২ বছরে অসংখ্য লেখা তিনি লিখেছেন। সেই সময়ের শিশুকিশোরদের সাময়িক পত্রিকার মধ্যে সাড়া-জাগানো নামগুলির মধ্যে ছিল 'সখা', 'বালক', 'সাথী', 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' এবং 'সন্দেশ'। এর মধ্যে 'বালক' ছাড়া আর সবকটি পত্রিকাতেই অসংখ্য গল্প প্রবন্ধ লিখতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা 'বালক'-এর জন্য কলম-তুলি ধরেননি কে জানে! রবীন্দ্রনাথও উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় প্রকাশিত আড়াই বছরের 'সন্দেশ'-এ কোনও লেখা দেননি। যদিও সুকুমার রায়ের চিঠি থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদিত 'সন্দেশ' দেখেছেন এবং প্রশংসা করেছেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার কলম ধরেছেন 'সন্দেশ'-এর পাঠকদের জন্য।

উপেন্দ্রকিশোর ছোটোদের জন্য বিভিন্ন স্বাদের গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতা লিখেছেন। এছাড়াও লিখেছেন ইংরেজিতে মুদ্রণ সংক্রান্ত প্রবন্ধ, লিখেছেন সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদি। আজকের এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি শুধুমাত্র পৌরাণিক কাহিনিগুলিতেই।

উপেন্দ্রকিশোরের পৌরাণিক কাহিনিগুলি সংকলিত হয়েছিল চারটি গ্রন্থে। 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'মহাভারতের কথা' ও 'ছোট্ট রামায়ণ'। 'ছেলেদের রামায়ণ' লেখকের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৮৯৭ সালে লেখক স্বয়ং বইটি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯০৮-এ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সিটি বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত

হয়েছিল ছেলেদের মহাভারত। এই সিটি বুক সোসাইটি থেকেই ১৯০৯তে প্রকাশ পেয়েছিল 'মহাভারতের কথা'। 'ছোট্ট রামায়ণ' (১৯১১) প্রকাশিত হয় তার নিজস্ব সংস্থা ইউ রায় অ্যান্ড সন্স থেকে।

রামায়ণ এবং মহাভারত — মূল সংস্কৃততে এবং পরবর্তী সময়ে বাংলায় অনূদিত হলেও কখনওই তা শিশু-কিশোরদের উপযোগী পাঠ্য তো ছিলই না, বরং এদের বহু ঘটনাবলি পুরোদস্তুর প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। কিন্তু বইদুটির ঘটনাপ্রবাহ যে শিশুকিশোরদের কাছে প্রবল আর্কষণীয় হয়ে উঠবে, তা কি উপেন্দ্রকিশোরের আগে কেউ ভেবেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরই যে দুরূহ কাজটিতে প্রথম হাত দিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 'ছেলেদের রামায়ণ'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর বইটির অনেক ত্রুটি চোখে পড়ে লেখকের। দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯০৭ এ সিটি বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত) ভূমিকায় তিনি জানিয়েছিলেন শিশুদের উপযোগী করতে গিয়ে রামায়ণ-এর মূল গল্পের সৌন্দর্যহানি ঘটেছিল, তাই তিনি নতুন করে এই দ্বিতীয় সংস্করণটি লিখেছেন। আর এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় তাঁর পাশে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ দান ও সহায়তা করিয়াছেন, সে ঋণ পরিশোধ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি এবং প্রুফ তিনি আদ্যোপান্ত সংশোধনপূর্বক ইহার অনেক ত্রুটি দূর করিয়া দিয়াছেন।'

'ছেলেদের মহাভারত'-এর পাণ্ডুলিপি সংশোধনেও বড়ো ভূমিকা ছিল রবীন্দ্রনাথের। মূল সংস্কৃত থেকে ছোটোদের উপযোগী করে অনুবাদ করার ব্যাপারেও উপেন্দ্রকিশোরকে সহায়তা করেছিলেন বিশ্বকবি।

'ছেলেদের রামায়ণ' ও 'ছেলেদের মহাভারত' গত একশো বছরের বেশি সময় ধরে বাংলার শিশুকিশোরদের কাছে এত জনপ্রিয় কেন? এর মূল কারণ এই দুই মহাকাব্যের ঘটনাবলি। যুদ্ধ, বীরত্ব ইত্যাদি চিরকালই শিশুকিশোরদের প্রবলভাবে আর্কষণ করে। রাক্ষসদমন, দুষ্টু লোককে শায়েস্তা, বীর নায়কদের জয়ের ঘটনার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে এই দুটি

গ্রন্থে। আর সেই ঘটনাগুলিকে সরস ভাষায় শিশুকিশোরদের উপযোগী করে অনুবাদ করেছেন উপেন্দ্রকিশোর। বহু ঘটনাই তাঁর কলমের জাদুতে হয়ে ওঠে মজাদার। যেমন বালীর হাতে রাবণের হেনস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'সে রাবণকে বগলে করিয়াই আরও তিনবার সন্ধ্যা করিল। এদিকে সেই বগলের চাপে, গরমে, ঘামে আর গন্ধে বেচারা চ্যাপ্টা হইয়া, সিদ্ধ হইয়া, দম আটকাইয়া, পেট ঢাক হইয়া নাকালের একশেষ। মরে নাই কেবল ব্রহ্মার বরে।'

কিম্বা মহাভারতের রাক্ষসের মুখের ভাষা তিনি তৈরি করেছেন এক অদ্ভুত সুরে। পঞ্চপাণ্ডবের সামনে রাক্ষস তার পরিচয় দিচ্ছে এইভাবে, 'আর্‌র্‌রে মুহি কিড়ম্মিঢ়ঢ় রে। মোর নাম কিড়ম্মিঢ়ঢ় আছে। বগ্‌গের ভাই। তোহারা কে বটেক। তোদ্দেরকে মুহি মজাসে খাব।'

উপেন্দ্রকিশোরের কলমের জাদুতে রাম, লক্ষণ, পঞ্চপাণ্ডব থেকে শুরু করে বানরসেনা, রাক্ষস খোক্কস সকলকেই মনে হয় খুব পরিচিত। সকলেই যেন আমাদের ঘরের লোক কিংবা প্রতিবেশী।

ছোটোদের উপযোগী করার সময় উপেন্দ্রকিশোর বহুস্থানে অসাধারণ সংযম দেখিয়েছেন। যেমন রাবণবধের পর অযোধ্যায় ফিরে এসে রামের রাজ্যাভিষেকেই তিনি ছেলেদের রামায়ণ সমাপ্ত করেছেন। সীতার বনবাস ইত্যাদি তাঁর মতে হয়তো-বা শিশুকিশোরদের উপযোগী নয়।

শিশুকিশোরদের জন্য পুরো কবিতায় রামায়ণ প্রস্তুত করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। 'ছেলেদের রামায়ণ'-এর মতো তেমন জনপ্রিয় না হলেও 'ছোট্ট রামায়ণ' গ্রন্থটি কিন্তু সরসতায় পিছিয়ে নেই। ছন্দ মিলেও পূরণ করেছে ছড়াকবিতার শর্তগুলি। দু-একটি উদাহরণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। তারকা রাক্ষসীর বর্ণনায়: 'তাড়কা রাক্ষসী থাকে বিকট বদন/রক্তখাকি হতভাগী ভারি বল ধরে/ লোকজন মেরে বন করেছে নগরে / এই পথে যেই যায় তারি খায় গিলে/আপদে মারহে বাপ দুই ভাই মিলে/মরিবে রাক্ষসী বুড়ি, রক্ষা নাই তার/তখনি দিলেন রাম ধনুকে টংকার/টং-টং রবে তার রুষি ভয়ংকর/দাঁত কড়মড়ে বুড়ি কাঁপে থরথর/হাঁই-মাঁই-কাঁই করি ধাঁই ধাঁই ধায়/হুড়মুড়ি

ঝোপঝাড় চুরমারি পায়/গরজি-গরজি বুড়ি ছোটে, যেন ঝড়/শ্বাস বয় ঘোরতর ঘড়র্‌-ঘড়র্‌/কান যেন কুলো তার, দাঁত যেন মুলো/জ্বল জ্বল দুই চোখ জ্বলে যেন চুলো/হাঁ করেছে দশ গজ, তাহে জিভ খান/লকলকে, চকচকে দেখে ওড়ে প্রাণ।'

কিম্বা হনুমানের সঙ্গে রাম-লক্ষণের প্রথম সাক্ষাৎ: 'গোঁপ-দাড়ি পরে হনু সাজিল সন্ন্যাসী/রামের নিকটে পরে দেখা দিল আসি/বড়ই পণ্ডিত হনু, ভারি বুদ্ধিমান/হাসি হাসি কথা কয়, মধুর সমান/রামেরে করিল সুখী মিষ্ট কথা কয়ে/কাঁধে করে গেল পরে দুজনেরে লয়ে।'

মূল মহাভারতটি এক সুবিশাল গ্রন্থ। এতে রয়েছে ছোটো বড়ো বহু ঘটনা, কাহিনি। প্রত্যেকটি দারুণ আকর্ষণীয়। 'ছেলেদের মহাভারত'-এ উপেন্দ্রকিশোর শুনিয়েছেন শুধু পঞ্চপাণ্ডবদের গল্প। মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের আখ্যান ছাড়াও আরও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনিগুলি তিনি সংকলন করেছেন 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থে। সংখ্যায় পঞ্চাশের অধিক এই কাহিনিগুলির মধ্যে রয়েছে

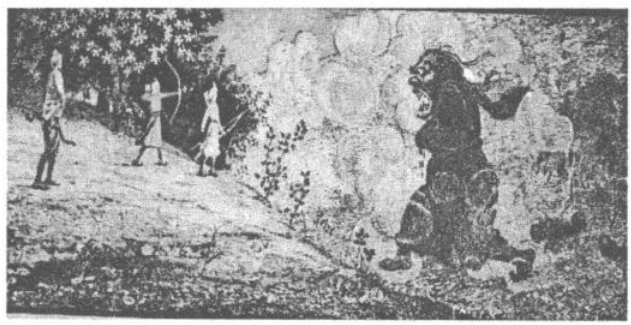

শকুন্তলা, নলদময়ন্তী, কচ-দেবযানী, সত্যবান-সাবিত্রী, কদ্রু-বিনতা-গরুড়, দধিচী, অগস্ত, পরীক্ষিত, জনমেজয় জরুৎকারুদের আকর্ষণীয় গল্পগুলি। মহাভারতের বাইরেও রয়েছে অজস্র পৌরাণিক কাহিনি। গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে গণেশের ছেলেবেলা ও বিয়ের কথা, রাবণের গল্প, হনুমানের ছেলেবেলা। আমাদের পুরাণ সমৃদ্ধ প্রচুর কাহিনিতে। সেগুলির থেকে কিছু লেখা নির্বাচিত করে সহজ সরল ভাষায় তিনি পেশ করেছেন বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্য। সব ক-টি গল্প হয়ে উঠেছে চিরকালীন, যখন তিনি লেখেন, 'হনুমান বেচারা তখন আর কি করে? চ্যাঁচাইয়া সারা হইল, তবু মার দেখা নাই। কাজেই তাহার নিজেকেই কিছু খাবারের চেষ্টা দেখিতে হইল। সেটা ছিল ভোরের বেলা, টুকটুকে সূর্য দেখিয়াই হনুমান ভাবিল, ওটা একটা ফল। অমনি আর কথাবার্তা নাই, সে একলাফে আকাশে উঠিয়া ভয়ানক সোঁ সোঁ শব্দে সেই ফল পাড়িয়া খাইতে ছুটিল' (হনুমানের বাল্যকাল), তখন ভাষা এবং বর্ণনায় ছোটরা মজা তো পায়-ই, একই সঙ্গে পরের ঘটনা জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। গল্পের আর্কষণ বজায় থাকে শেষপর্যন্ত।

রামায়ণ মহাভারত সমেত সব পৌরাণিক কাহিনিগুলি উপেন্দ্রকিশোর সাধু ভাষায় লিখলেও একমাত্র 'শিবের বিয়ে' গল্পটি লিখেছিলেন চলতি ভাষায়। ভাষার পরিবর্তন হলেও পৌরাণিক কাহিনির স্বাদ তাতে কমেনি। বরং লেখকের বর্ণনায় শিব, মেনকা, নারদদের মনে হয় আমাদেরই ঘরের লোক। শিবকে প্রথম দর্শনের পর মেনকা যখন বলেন, 'আমি কিছুতেই এই কদাকার বুড়োর কাছে মেয়ের বিয়ে দেব না। ওর না আছে টাকা, না আছে গুণ, না জানে লেখাপড়া, না পারে একটা ঘোড়া কিনতে' — তখন মেনকাকে মনে হয় চিরাচরিত বাঙালি মা। আবার বরবেশে শিবকে দেখতে মেয়েমহলের কৌতূহলের বর্ণনায় ('তারা যে যেমন ছিল, তেমনি ভাবে, কেউ রান্না ফেলে, কেউ কলসী কাঁখে, কেউ চুল বাঁধতে বাঁধতে, কেউ ঘোমটা টানতে টানতে, কেউ আছাড় খেতে খেতে এসে উপস্থিত হল'), কিম্বা বরকে নিয়ে মজা করার বর্ণনায় ('তিনি শিবের পিছনে গিয়ে তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে টানতে আরম্ভ করেছিলেন, দেবতারা দেখে ফেলায় হাসতে হাসতে ঘরে পালিয়ে গেলেন') মনে হয় এ-যেন এক বাঙালি বিয়ের আসরের গল্প।

উপেন্দ্রকিশোরকে আমরা অনেক পরিচয়েই জানি। সন্দেশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, হাফটোন মুদ্রণের জনক, 'টুনটুনির বই'-এর স্রষ্টা, বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর মূল লেখক (মূল গল্পটির নাম কিন্তু ছিল গুপী গাইন) ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর আরেকটি পরিচয় পৌরাণিক কাহিনির কথক। সহজ সরল ভাষায় গল্প বলার ভঙ্গিতে তিনি যে দুরূহ কাহিনিগুলিকে বাংলার শিশুকিশোরদের কাছে উপস্থাপন করেছেন তাঁর জন্য আমরা যুগ যুগ ধরে চিরঋণী থাকব। সুনির্মল বসুর সুরে আমরাও বলি উপেন্দ্রকিশোর সারা বাংলার, সব বাঙালি ছেলেমেয়েদের আত্মীয়।

ছবি: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায়

'১৫০

মহাপুরুষ উপেন্দ্রকিশোর

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

একদিন ডাকে আমার কাছে একখানা পত্রিকা আসিল। কৌতূহলী হইলাম। খুলিয়া দেখিলাম, পত্রিকাখানির নাম 'মুকুল'। আমার মা জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান হইতে পাঠাইয়াছেন। খুলিয়া দেখিলাম, পাতায় পাতায় ছবি ও গল্প। লিখিয়াছেন অনেকে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখাটি আমার দৃষ্টি আর্কষণ করিল। তখন বাড়ির পাশে আমগাছতলায় বসিয়া পড়িয়া ফেলিলাম। প্রবন্ধটির নাম 'সেকালের কথা।' সেকালের জীবজন্তুদের ছবি, তাহাদের কোনো কালে দেখি নাই, দেখিবার আশাও করি নাই। এইসব বিচিত্র অদ্ভুত ছবি। আমার মনে পড়ে সে সময়ে সত্তর বৎসর আগে 'গল্প হলেও সত্য' গল্পটি পড়িয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াছিলাম। কী করিয়া একটি জাহাজের নাবিকের সহিত এক বাঘের ভালোবাসা হইয়াছিল ও সেই ভালোবাসার প্রতিদান কিরূপ সুন্দর, তাহা সকলেরই মনোযোগ আর্কষণ করিয়াছিল। আমরা তো এ গল্প পড়িয়া প্রচুর আনন্দ পাইতাম। এমনি করিয়া 'পূর্বদিনের কথা', 'অন্ধজনের কথা' প্রভৃতি উপেন্দ্রকিশোরের লেখা বহু প্রবন্ধ পড়িয়াছি ও তাঁহাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছি। এই উপেন্দ্রকিশোর লোকটি কেমন দেখিবার জন্য বড় কৌতূহল হইত। আমার মাতুল রেবতীমোহন সেন একবার দেশে আসিলেন। তাঁহাকে সেই পত্রিকাখানি দেখাইলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি এই উপেন্দ্রবাবুকে জানেন?' তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'জানি না কী রে! তিনি অতি মহৎ লোক। এঁর লেখা ছোটদের অতি প্রিয়।' আমি বলিলাম, 'আমাকে দেখাতে পারেন?' তিনি উত্তরে বলিলেন, 'তিনি তো আমাদের সমাজেরই লোক।' তখন আমার মাতুল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সুগায়ক ও প্রীতিভাজন ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত।

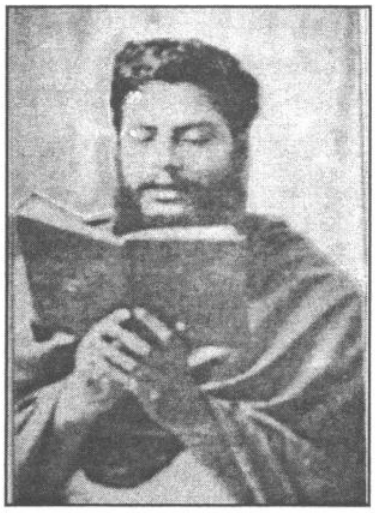

অনেকদিন পর কলিকাতা আসিলাম। মামা কলিকাতায় থাকিতেন ২৮/২ অখিল মিস্ত্রী লেনে। একদিন তাঁহাকে বলিলাম, 'আমাকে উপেন্দ্রবাবুর ওখানে লইয়া চলুন।' তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, 'বেশ তো!' তখন কলিকাতা সার্কুলার রোডে মূকবধিরদের বিদ্যালয় হইয়াছে। তিনি সেখানে শিক্ষকতা করিতেন। মামার সঙ্গে সেই স্কুলে গেলাম, মূকবধিরদের শিক্ষার কৌশল দেখিলাম।

তারপর অপরাহ্নে মামার সহিত সুকিয়া স্ট্রীটে উপেন্দ্রবাবুর বাড়িতে গেলাম। সেখানে উপেন্দ্রবাবু পরিবারবর্গ লইয়া বাস করিতেন। সেই বাড়িটির নীচে ছিল ছাপাখানা ও অফিস। উপরের একটি ঘরে তিনি লেখাপড়া ও কাজকর্ম করিতেন। আমাকে লইয়া সেই বড় ঘরটির পর্দা সরাইয়া রেবতীবাবু মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, 'আসতে পারি কি?' উপেন্দ্রবাবু আনন্দের সহিত বলিলেন, 'এ আবার কী কথা! আসুন! আসুন!' মামা বলিলেন, 'আমার সঙ্গে এক ভাগ্নে আছে। সে আপনার একজন ভক্ত। আপনাকে দেখবার জন্য সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।' উপেন্দ্রবাবুর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতেই দুই হাত দিয়া আমাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। তখন তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম।

প্রফুল্লহাস্য মুখ, গৌরকান্তি দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল চক্ষু, মুখে দাড়ি, মাথায় কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশ। তাঁহাকে চিত্রে অঙ্কিত ছবির ন্যায় সুদৃশ্য দেখাইতেছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমার কী কী গল্প পড়েছ?' আমি তখন বিনা সংকোচে তাঁহার 'সেকালের কথা', 'গল্প হলেও সত্যি', 'অন্ধজনের কথা' প্রভৃতির নাম বলিলাম। আমার মনে হইল তিনি প্রসন্ন হইয়াছেন। হাসিমুখে বলিলেন, 'বেশ বেশ, আশীর্বাদ করি

তুমি ভালো ছেলে হও।' তারপর জলখাবার আসিল ও মাতুলের সহিত নানা বিষয়ে কথা হইল।

সেদিনের সেই প্রথম দেখা আমার হৃদয়ে যে ছাপটি আঁকিয়া দিয়াছিল তাহা ভুলিতে পারি না। তারপর জীবনে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুবার দেখার সুযোগ হইয়াছে। সে ব্রাহ্মসমাজেই হউক কি সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতেই হউক বা গড়পার রোডেই হউক, আগে পরের কথা। তাঁহার প্রথম দৃষ্টিতে যে একটি স্নেহপ্রবণ সদাশয় ব্যক্তির দৃষ্টি লাভ করিয়াছি তাহা শেষ জীবনেও বিলুপ্ত হয় নাই। আজও তাঁহার সেই সৌম্যমূর্তি আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহাকে ভুলি নাই, জীবনের শেষদিন পর্যন্তও ভুলিব না। এমনি ছিল তাঁহার ভালোবাসা।

উপেন্দ্রকিশোর জন্মিয়াছিলেন ১২৭০ সনের ২৮শে বৈশাখ তারিখে। শিশুসাহিত্য রচনায় তিনি ছিলেন দিক্‌পাল। তখনকার দিনে বাংলাসাহিত্যে শিশু ও কিশোরদের জন্য চিন্তা করিতেন কেশবচন্দ্র সেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রমদাচরণ সেন প্রভৃতি। কেশবচন্দ্রের 'বালকবন্ধু' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। সে কথা সকলেরই জানা আছে। তাহার পর প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত 'সখা' ছিল অমূল্য রত্ন। এই 'সখা' প্রকাশের জন্য প্রমদাচরণ নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন ও ছবি আঁকিতেন। তারপর প্রকাশিত হইল 'সাথী', 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' প্রভৃতি মাসিকপত্র। ইহাদেরই মধ্যে আমরা উপেন্দ্রকিশোরের অবদান পূর্ণরূপে দেখিতে পাই।

উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে যাঁহারা আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন এরূপ সদাশয়, ধর্মপ্রাণ, শিশু ও বালকদের কল্যাণকামী ব্যক্তি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশুদের কিসে ভালো হয়, কিসে তাহারা গল্প, আনন্দ ও শিক্ষার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে তাহাই ছিল তাঁহার প্রচেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য 'সন্দেশ' হইল অপূর্ব সৃষ্টি। 'সন্দেশ' সেই সময় সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে ও উপেন্দ্রকিশোরের কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার রায় যোগ্যতার সঙ্গে 'সন্দেশ' পরিচালনা করিয়াছিলেন।

সন্দেশে তিনি বিবিধ গল্প, উপন্যাস এবং কাব্য সৃষ্টি করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে চিত্রও আঁকিতেন। নিজে ছিলেন শিল্পী। প্রতিটি ছবি তিনি দরদ দিয়া আঁকিতেন। হাসির ছবির তিনি ছিলেন মস্ত বড় একটি জুড়ি। হাফটোন চিত্রাঙ্কন বিষয়ে এবং তাহার উন্নতিকল্পে উপেন্দ্রকিশোরের নিত্য নূতন আবিষ্কার জগদ্বিখ্যাত। পৃথিবীর সর্বদেশে ইহা সমাদৃত। ইংরাজ কোম্পানি তাঁহার আবিষ্কৃত নিয়মকানুন অনুসরণ করিয়া উপেন্দ্রকিশোরের অনুমতি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই ইতিহাস সর্বজনবিদিত।

তাঁহার লিখিত বইগুলির মধ্যে 'ছেলেদের মহাভারত', ছোটদের রামায়ণ', 'টুনটুনির বই' ইত্যাদি অসংখ্য বইয়ের নাম করা যাইতে পারে। আমরা কতই না আগ্রহে এই সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়া আনন্দ অনুভব করিতাম। এই সমস্ত বই সেকালে তরুণদের মন মুগ্ধ করিত, নূতন আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করিত। একালেও তাহার প্রভাব সমভাবে বিদ্যমান।

উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন একজন বিখ্যাত বেহালাবাদক। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের মুখে যে দু-একটি গল্প শুনিয়াছি তাহা নীচে দিলাম:

পুরাতন বেহালা বিষয়ে তারিজিয়ো একজন অতিশয় প্রামাণ্য এবং বিশেষজ্ঞ লোক ছিলেন। একবার তিনি জাহাজে চড়িয়া কোথাও যাইতেছেন; সঙ্গে গুসারিনির অথবা গ্যাঙ্গার ডি সালর, হাতের (ঠিক ভুলিয়া গিয়াছি), একখানি 'চেলো' (বড় আকারের বেহালা)। বিস্কে উপসাগরে আসিয়া জাহাজ ঝড়ে পড়িয়াছে; রক্ষার আশা কম; আরোহীরা আপন আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুল। ইহার মধ্যে তারিজিয়ো করিয়াছেন কি, জাহাজের একটু উঁচু এবং ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া দুই হাতে প্রাণপণে চেলোখানিকে উঁচু

করিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন! ডুবিতে হইলে নিজে আগে ডুবিবেন, কিন্তু বেহালাখানিকে বাঁচানো চাই! ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে যাত্রা ঝড়ের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া তারিজিয়ো দেশে ফিরিলেন। তাঁহার ঝড়ে পড়ার সংবাদ পাইয়া বন্ধুরা যারপরনাই ব্যস্তভাবে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। 'কী হে! বড় নাকি ঝড়ে পড়েছিলে!' 'আর ভাই, সে কথা বোলো না; বেহালাটা আর একটু হলে গিয়েছিল আর কি!'

আর একটি গল্প হইল—একজন ভারী শৌখীন লোকের একটি পুরাতন বেহালা ছিল। ঐ বেহালার কোনো স্থান মেরামত করাইবার দরকার হওয়ায় তিনি এক প্রসিদ্ধ কারিগরের দোকানে গেলেন। কারিগর বলিল যে, 'বেহালাটা না খুললে দোষ সারানো যাবে না।' কিন্তু শৌখীন ব্যক্তি কিছুতেই বেহালা খুলিতে দিতে রাজী হইলেন না। ইহাতে কারিগর বলিল যে, 'তবে আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। আপনি অন্য কোথাও দেখুন।' তখন আর কী করা যায়, অগত্যা তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, খোলো; কিন্তু আমি সামনে থাকব।' সুতরাং বেহালা খুলিবার সময় তাঁহাকে একখানি চেয়ার দেওয়া হইল। পুত্রের শরীরে সাংঘাতিক অস্ত্রোপচার দেখিলে পিতার মুখ যেমন হয়, তেমনি মুখ করিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়া বেহালা খোলা দেখিতে লাগিলেন। বেহালার

কোনো স্থান ফাটিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে কারিগরেরা বেহালায় টোকা মারিয়া দেখে। এ বেহালাখানিকে টোকা মারিবামাত্রই তাহার মালিক 'উঃ!' করিয়া উঠিলেন। টোকার পর টোকা পড়ে, আর তিনি বলেন, 'উঃ!' তারপর একখানি ছুরি সাহায্যে কারিগর বেহালার জোড় খুলিতে আরম্ভ করিল। আশ্চর্যের বিষয়, তখন শৌখীন ব্যক্তি কোনো গোলমাল করিলেন না। খোলা শেষ হইলে কারিগর তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, 'এই তো হয়ে গেল মশাই!' কিন্তু তাঁহার কথা শোনে কে? শৌখীন ব্যক্তি ততক্ষণে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার এই গল্প দুটি উপেন্দ্রকিশোর 'প্রদীপ' পত্রিকায় ১৩০৬ সালে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার নিজের মুখে এই গল্প দুটি শুনিয়াছেন তাঁহারা হাসিতে হাসিতে অস্থির হইতেন। উপেন্দ্রবাবু এমনি সুন্দরভাবে বেহালা ধরিয়া অভিনয় করিতেন মনে হইত যেন প্রত্যক্ষ ঘটনা ঘটিতেছে। আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহার সেই সুন্দর অভিনয় দেখিবার। আমার তরুণ বয়সের সেই মধুর স্মৃতি এখনও জাগিয়া আছে। আমি তাঁহার অপূর্ব বেহালাবাদন ব্রাহ্মসমাজে দুইবার শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ধীর স্থিরভাবে বেহালা পরিচালনা দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করিত। এখনও প্রতি বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের ১১ই মাঘের উৎসবে তাঁহার রচিত 'জাগো পুরবাসী, ভারতপ্রেমপিয়াসী' গানটি গীত হয়।

আমি তাঁহার পুত্রকন্যাগণের মধ্যে সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল ও কন্যা সুখলতা ও পুণ্যলতাকে জানিতাম। আজ তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সাহিত্যজগতে প্রথিতযশা। যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা এই বৃদ্ধ বয়সেও পিতার নাম চির উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন।

উপেন্দ্রকিশোরের সহিত আমার যে নিগূঢ় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আমার জীবিতকালে কোনোদিন বিলীন হইবে না। আজ এই কীর্তিমান মহাপুরুষকে স্মরণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার মঙ্গলময় বাণী বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্ষিত হউক। আমি তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানাইতেছি।

(পুনর্মুদ্রণ)

ছবি: সত্যজিৎ রায়

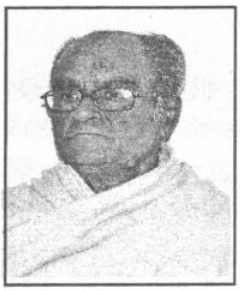

সমীর সরকার

দেবব্রত ঘোষ

শিল্পী সমীর সরকারের সঙ্গে অমার যে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল তা নয়—সারা জীবনে সাত-আটবারের বেশি দেখাও হয়নি। তবে গত বছর, মানে দু-হাজার বারোতে দু-বার দেখা হয়েছিল। মজা করে বলেছিলাম—সমীরদা একই-রকম আছেন। বয়স একটুও বাড়েনি। সত্যিই আমার সে-রকমই মনে হয়েছিল। যদিও উনি নানারকম শারীরিক অসুবিধার কথা বলেছিলেন। শারীরিক অসুবিধা যাই-ই থাক, বয়স যা-ই হোক, তার প্রভাব কাজে কখনও পড়েনি। একদম শেষের দিকের কাজেও দেখেছি কালো মোটা লাইনের সঙ্গে অয়েল প্যাস্টেলের খুনসুটি একই রকম দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই সামলেছেন।

ইদানিং ভারতবর্ষের অনেক বড়বড় ইলাসট্রেটরদের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁদের কাজের সঙ্গে পরিচয় হয়, কিন্তু একজন সমীর সরকারের মাপের শিল্পী আমার চোখে পড়েনি। যে দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উনি লাইন টানতেন সেটার জন্য লাগে ড্রইংয়ের অসম্ভব জোর আর ছন্দ-জ্ঞান বা খুব সহজে বললে বলতে হয় লাগে প্রতিভা—সেটা যার আছে তার আছে, যার নেই তার অবস্থা আমার চেয়ে আর ভাল কে জানে!

সমীর সরকাররা যে দেশে যে সময়ে জন্মান সেই সময়ে দেশের শিল্পভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। সে দেশের উত্তরসূরীদের কাছে এঁরা একটা Standard বা মান বেঁধে দেন যেটা পরবর্তী প্রজন্মকে সারাক্ষণ টপকে যাবার চেষ্টায় রত থাকতে হয়। এভাবেই সমীর সরকারের মতো শিল্পীরা বাংলা বইয়ের অলংকরণ শিল্পকে ইলাসট্রেশনের আন্তর্জাতিক ম্যাপ-এ বসিয়ে দেন।

টুনটুনি আর হিয়ামনের গপ্পো

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে প্রণাম

নবনীতা দেব সেন

হিয়ামন কেলটুসের সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল। কেল্‌টুস লেজ তুলে ঘাড় বাঁকিয়ে গাড়ি দেখছে, আর মাঝে মাঝে 'ভেক-ভেক-ভৌ-ভৌ' করে রাস্তার অচেনা কুকুরদের বকে দিচ্ছে। হঠাৎ চেঁচিয়ে হিয়ামন ডাকল, 'দিয়ামন, ও দিয়ামন, দ্যাখো দ্যাখো, আমাদের কদম গাছের ডালে কে বসে আছে?' দিয়ামন তাড়াতাড়ি লেখা ফেলে ঘর থেকে উঠে এলেন, তারপরে হেসে বললেন, 'ও মা! ও তো আমাদের টুনটুনি পাখি রে? নিশ্চয়ই বাসা বেঁধেছে, ডিম পাড়বে, ছানা হবে বলে।'

হিয়ামন বললে, 'কী মজা, কী মজা, আমাদের কদমগাছের ডালে টুনটুনি তুই বাসা বেঁধেছিস?'

দিয়ামন বললেন, 'আহা, টুনটুনি পাখিটি এত ছোটো, তার আবার ডিম! আয় রে কেলটুস, আমরাই টুনির ডিম পাহারা দেবো, কাকে চিলে নিতে পারবে না।'

'থ্যাংক ইউ,' বললে টুনটুনি। 'কিন্তু তোমরা কি কেউ বলতে পারো, আমার বাসায় কী আছে?'

'ডিম আছে তো?'

'ডিম তো আছেই, আরও কিছু আছে— রাজার ঘরে যে ধন আছে, টুনির ঘরে সে ধন আছে! বুঝলে?'

'মানে? মানে? মানে?'

'মানে, আমার ঘরে একখানি সোনার মোহর আছে! রাজবাড়ির ছাদে পড়েছিল। আমি ঠোঁটে করে তুলে এনেছি, ডিম ফুটে আমার ছানাটি বেরুলে তার মুখ দেখব সোনা দিয়ে!'

'কই, কই? দেখি? দেখি?' বলে কেউ নীচে থেকে চেঁচিয়ে উঠল, হিয়ামন, কিংবা দিয়ামন কিছু বলতে পারার আগেই।

'কে চেঁচায়?'

'আবার কে, ওই হিংসুটি কড়াইশুঁটি হুলো বেড়াল। মজন্তালী সরকার। আবার কে? সে কারুর ভালো দেখতে পারে না, সবার সব ভালোতে বাগড়া দেবার চেষ্টা করে।'

চোখ রাঙা করে ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে পিঠ বেঁকিয়ে মজন্তালী বলে, 'টুনি! মোহর তুমি কেমন করে পেলে? এক্ষুনি রাজকোষে ফিরিয়ে দাও। ও মোহর তো তোমার নয়। রাজামশাইয়ের।'

'বা রে? বললেই হল?' টুনিও কম যায় না— 'রাজামশাইয়ের কেমন করে হবে? ওটা তো রাণীমায়ের মহলের ছাদ! রাণীমা ছাদে বোধহয় মোহর শুকুতে দিয়েছিলেন, তারই একটা পড়ে ছিল।'

শুনে মজন্তালী হেসে কুটিপাটি। 'টুনি রে টুনি! এ কেমন কথা শুনি? তুমি সত্যি হাসালে বাপু, সোনার মোহর আবার কেউ রোদে দেয়? রোদে তো দেয় বড়ি, আমসত্ত্ব,

আচার! তুই যেটা কুড়িয়ে এনেছিস সেটা নিশ্চয় মোহর-বড়ি! রাণীমা কত রকমের গয়না-বড়ি করেন, কাঁকন-বড়ি, সাতনরী-বড়ি, মোহর-লকেট বড়ি, সেই সব ছাদে শুকোতে দেন। দেখলে মনে হবে সত্যিকারের সোনার গয়না! একটা হয়তো পড়ে গিয়েছে। তুই তো জন্মে মোহর দেখিসনি, তাই ভেবেছিস বুঝি সত্যিকারের মোহর। দেখি দেখি আমায় দেখা। আমি দেখলে ঠিক চিনতে পারবো, মোহর, না মোহর-বড়ি।'

ওর কথা শুনে টুনটুনি তখন উড়ে গিয়ে বাসা থেকে মোহরটি এনে তাকে দেখালে। মজন্তালী এবারে আরো জোরে হো হো করে অট্টহাস্য জুড়ে দিলে।

'ওরে এটা তো বড়ি রে! তুই বরং এটা তোর ছানাকে গাওয়া ঘিয়ে ভেজে খাইয়ে দিস। কুড়মুড় করে দিব্যি খাবে!'

শুনে টুনটুনি বললে, 'অ্যাঁ? বড়ি? আমার ছানারা তো বড়ি খায় না, তারা নরম পোকামাকড় আর কচি শ্যাওলা খাবে।' বলেই মনের দুঃখে মোহরটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর মজন্তালী সরকার তক্ষুনি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে, হাসতে হাসতে, গান গাইতে গাইতে, দে ছুট, দে ছুট! কী গান? :

'রাজার ঘরে যে ধন ছিলো
টুনির ঘরেও সে ধন ছিলো,
বোকা টুনি ফেলে দিলো
মজন্তালি কুড়িয়ে পেলো
তাই-রে, নাইরে, নাইরে
অন্যের কথা কানে নিলে
এমনই হয় ভাই রে!!'

গান শুনে টুনি বুঝতে পেরেছে তার ভুল। সে ছোট্টো পাখি, মনের দুঃখে কেঁদেই ফেলেছে। কান্না দেখে হিয়ামন চেঁচিয়ে ওঠে, 'দিয়ামন! অ দিয়ামন! দুষ্টু মজন্তালী যে টুনির মোহর নিয়ে পালাল! এবারে ওর কী হবে, দিয়ামন? তুমি কিছু করো।' হিয়ামনের গলাটাও কান্না কান্না।

শুনেই দিয়ামন বললেন, 'কিচ্ছু ভেবো না! যতই ছোট্টো হোক, টুনটুনি কি একা? তার কতো বন্ধু আছে না? দাঁড়াও কেলটুসকে পাঠাচ্ছি। কেলটুস, যাও তো, মজন্তালীর কাছ থেকে টুনটুনির মোহর উদ্ধার করে আনো।'

অমনি কেলটুস কান দুটো খাড়া করে, লেজ তুলে, ছুটল। কেলটুস যা করবে ভাবে সেটা করেই ছাড়ে।

'মজন্তালী, মজন্তালী, বাড়ি আছো হে?'
'ঠিক দুকখুরে হাঁকাহাঁকি করছো তুমি কে?'

'আমি তোমার যম, কেলটুসচন্দ্র। মনে আছে তো, তোমাকে কেমন তাড়া করেছিলুম তুমি যে-বারে হিয়ামনের পাত থেকে মাছের মুড়োটা তুলে নিয়ে পালিয়েছিলে? এক্কেবারে লিলিপুলের জলে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল তোমাকে, সেই পোষ মাসের রাত্তিরে!'

'মনে আবার নেই? পেন্নাম হই কেলটুসদাদা, বলো আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি? এবারে কেন জ্বালাতে এসেছ? আমি তো মন্দ কিছু করিনি।'

'করোনি? বেশ কথা! তবে দাও, টুনটুনির মোহরটি ফেরত দাও দিকিনি। ও বেচারি ছানার মুখ দেখবে কী দিয়ে?'

'ওঃ তুমি টুনির মোহর চাও?
বেশ তো, পারলে নিয়ে যাও।
মিঁউ মিঁউ মিঁয়াও ম্যাঁও!'

বলেই সে একলাফে উঁচু বেলগাছের ওপরে উঠে পড়ল। কেলটুস তো কুকুর, সে বেড়ালের মতন গাছে উঠতে পারে না। কিন্তু তার বুদ্ধি আছে। সে অমনি চেঁচিয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

'শেয়ালপণ্ডিত, কুমিরভায়া, বামুন, জোলা, হাতি,
গুপী, বাঘা, পিঁপড়ে, পিঁপড়ি, টুনির সঙ্গীসাথি,
উকুনে বুড়ি, পাস্তাবুড়ি, কোথায় আছো কে,
টুনির মোহর নিয়ে পালাল, দৌড়ে এসো হে!'

অমনি টুনটুনির বই-এর পাতা থেকে লাফ দিয়ে হইহই করে দলে দলে উঠে আসতে লাগল টুনটুনির বন্ধুরা—শেয়ালপণ্ডিত, কুমির ভায়া, বোকা জোলা, বোকা বামুন, পিঁপড়ে, পিঁপড়ি, উকুনে বুড়ি, পান্তাবুড়ি, কুঁজো বুড়ি, গাধা, হাতি, বাঘ, সিংগি। সবাই বলছে—

'কে নিয়েছে টুনির ধন?
এমন নিঠুর কার মন?'

কেলটুস আকুল হয়ে বললে,

'শেয়ালপণ্ডিত, বাঘামামা,
মজন্তালীকে শিগ্গির থামা!'

টুনটুনির বই-এর লোকজনেরা এবারে সক্কলে মিলে বেলগাছের তলায় গিয়ে গর্জন করে উঠল—

'মজন্তালী সরকার!
তোকে শিক্ষা দেওয়া দরকার!'

হুংকার শুনেই মজন্তালীর মুখ থেকে ভয়ের চোটে মোহরটি টুক করে মাটির ওপরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই কেলটুস সেটি কুড়িয়ে নিলে। তারপরে টুনির বন্ধুরা সবাই মিলে কোরাস গান করে তালি বাজিয়ে বাজিয়ে বেলগাছের চারিপাশে ঘিরে ঘিরে নেচে মজন্তালী সরকারকে ভীষণ লজ্জা দিলে—

'ছি ছি ছি ছি ছি!
তোমার লজ্জা করেনি?
টুনির ধনে নজর দিলে
এমনি কুচক্রী?
হায় হায় হায় মজন্তালী
লোকে বলবে কী?
খাবো না কেউ তোমার হাতে
মিশবো না কেউ তোমার সাথে
চোর ছ্যাঁচড়ের সরদার—
মজন্তালী সরকার!'

এই কথা শুনে লজ্জায় অধোবদন হয়ে, মানে মুখ নীচু করে, মজন্তালী সরকার বলল,

'স্যরি, স্যরি, স্যরি
দুর্গা শ্রীহরি
মাপ করে দিন বন্ধু সবাই
আপনাদের পায়ে পড়ি।
প্রাণ থাকতে এমন কম্মো
আর কখনো করি?'

বলেই, মজন্তালী গাছ থেকে মোহরটি নীচে ফেলে দিলে। আর কেলটুস সেটি কুড়িয়ে নিয়ে হিয়ামনের কাছে ছুটল।

আর টুনির বন্ধুরা সবাই খুশি মনে আবার হু-উ-শ করে টুনটুনির বই-এর পাতার মধ্যে সেঁদিয়ে গেল!

কেলটুস গিয়ে কী দেখল? কেলটুস দেখল কদমগাছের ডালে বাসায় সুন্দর একটি টুনটুনির ছানা সদ্য ডিম ফুটে বেরুচ্ছে! আর হিয়ামন বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাধবী লতার ডাল নিয়ে হ্যাট হ্যাট করে কাকপক্ষীদের তাড়াচ্ছে। তার পর?

টুনির মোহর টুনিই পেল,
ছানার মুখটি দেখে নিল।

রাজার ধনটি টুনির ঘরে
ছোট্টো বাসা আলো করে!
দিয়ামনের গপ্পো ফুরোলো
হিয়ামনের দুধটি জুড়োলো!

আয় হিয়ামন দুধ খাই
টুনির বই-এর মতো বই নাই!

ছবি: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

'১৫০

মজন্তালির মজার কথা

কাহিনি: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

নাট্যরূপ : সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত

(চরিত্র : দিদুন, মিঠি, মোটা বিড়াল, রোগা বিড়াল, মজন্তালি, জুড়ির দলের চারজন, তিনজন জেলে, বাবাবাঘ, মাবাঘ, তিনজন বাঘের বাচ্চা)

নাটকটা অভিনয় করার সময় ছোটোরাই জন্তুজানোয়ার সাজবে। কিছু মুখোশ বানিয়ে নিও। জোরে জোরে কথাগুলো বলবে। গানে নিজেদের মতো সুর বসিয়ে গাইবে। দুষ্টু লোক একদিন শাস্তি পাবেই — এই কথাটি মনে রেখো। যদি অভিনয় করো, সন্দেশের ঠিকানায় জানিও, আমি দেখতে যাব।

সুন্দর সাজানো ঘর। বিছানাতে শুয়ে আছে দিদান আর তার নাতনি মিঠি।

মিঠি : দিদুন আমার দিদুন সোনা— একটা গল্প আমায় বলো না।

দিদা : বলেছি তো সব, জানা ছিল যত। আর বলব ক-ত!

মিঠি : বলতেই হবে। রাজা রানি ওসব আমি শুনব না। অন্য কিছু বলো দিদা। কুকুর-বেড়াল-ঘোড়া-গাধা—

মিঠি : বেশ বেশ, এক যে ছিল ম্যাও— *(ভেবে)* একটা না দুটো। একটা মোটা ম্যাও আর একটা রোগা ম্যাও। রোগা বিড়াল ডাকতো 'ম্যাঁও-ম্যাঁও'। এত মিহি গলা তার শুনতে লাগত, 'খ্যাঁও-খ্যাঁও'। শুকনো শুটকো পাঁশুটে তার রং, দেখতে হ্যাংলাপানা।

মিঠি : কার মতো হ্যাংলা দিদুন? পেটুক গণেশদাদা?

দিদা : না রে, না। এ হ্যাংলা সে হ্যাংলা নয়। হ্যাংলা মানে রোগা। জিরজিরে হাড় শুকনো সরু। অন্যজনা ধুমসো মোটা নাদুসনুদুস। মোটকাটাকে শুঁটকো আবার একেবারেই সহ্য করতে পারত না। ধুমসো ছিল সরল সাদা, জানতো না সে তাকে শুঁটকো বিড়াল এত্তোখানি হিংসা করে থাকে—

মিঠি : ওরা কি এই বাড়িতেই থাকতো না কি?

দিদা : না-না না-না, থাকত ওরা চণ্ডীগ্রামে। চণ্ডীগ্রামে থাকত, আর মিঁয়া-ও বলে অহর্নিশি ডাকত। মিঠি, কথার মাঝে বললে কথা বন্ধ করব। গল্প—

মিঠি : সরি দিদা, প্লিজ দিদাসোনা। তুমি বলো, আমি একটুও ডিস্টার্ব করব না।

দিদা : চণ্ডীগ্রামে থাকত বেড়াল দুটো—
একটা ছিল চিমড়ে রোগা
আর একটা সে অ্যায়সা ধুমসো মুটো।
মোটা বিড়াল পুষতো গ্রামের গোয়ালা—
ক্ষীর ননী দুধ খেতে দিত
ভরে পেয়ালা পেয়ালা।

(স্বপ্নের মতো দেখা যায় একদল ছেলেমেয়ে আসে। তারা দল বেঁধে পদ্য পড়ে, গান গায়। নাটকে এদের আমরা বলি জুড়ির দল।)

জুড়ির দল : রোগা বিড়াল থাকত গরিব দুঃখী জেলের বাড়িতে। খেতে পেত না—
পেত কেবল শুকনো মাছের কাঁটা
রোজই খেত ঠেঙার বাড়ি আর লাথি-ঝাঁটা।
মোটা বিড়াল অহংকারে বুক ফুলিয়ে চলত
এমনি মোটা দেহের ভারে পোকামাকড় দলত।
শুকনো রোগা হাড়গিলে সেই বিল্লি
স্বপ্ন দেখত যাবে হিল্লিদিল্লি।
শরীরটা তার কঙ্কালসার
গুনতে পার সবকটা হাড়।
চলতে গেলেই পড়ত টলে টলে
শখ হল তার মোটকা হবে বলে।
বুদ্ধি করে প্ল্যান বানাল
মোটকাটাকে ডাক পাঠাল।

রোগা বিড়াল : ও ভাই, শুনছো। ও বন্ধু, ও ফ্রেন্ড। ও মাই বেস্ট ফ্রেন্ড।

মোটা বিড়াল : ম্যাঁও ম্যাঁও ম্যাঁও। দুপুরবেলা ঘুম দিতে যাই। এখন কেন জ্বালাও।

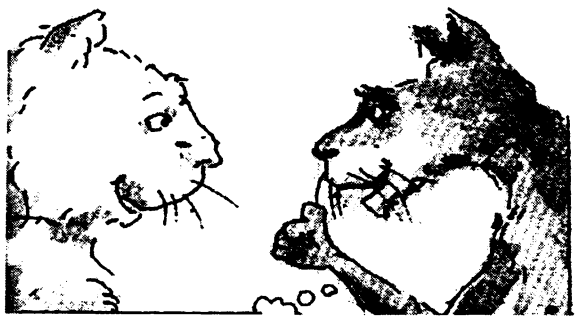

রোগা বিড়াল : *(গান গায়)*

তুমি কত সুন্দর ভাই
তোমার তুলনা নাই
তুলছ কেন হাই-?
তোমার সাথে একটুখানি
আড্ডা দিতে চাই।

মোটা বিড়াল : মিঁয়াও মিঁয়াও মাই!
খুশি হলাম ভাই।

রোগা বিড়াল : কালকে এসো আমার বাড়ি,
ডিনার আছে রাতে—
মণ্ডামিঠাই খাজাগজা
পড়বে সবার পাতে।

মোটা বিড়াল : দুধ খেয়েছি অনেক বছর
লিভার খারাপ তাই
মিষ্টি খাবার খেলে জিভে
স্বাদ লাগে না ভাই।

রোগা বিড়াল : চলো এসো আহারে, কোনও চিন্তা নাই।

মোটা বিড়াল : মেনুর ডিশে থাকবে নাকি গরম ফিশ ফ্রাই?

রোগা বিড়াল : গরমাগরম ভোজেরবাজি
থাকবে ফিশফ্রাই কবিরাজি
সাদা কাচের প্লেট
তার ওপরে সালাডসহ
সুন্দরী কাটলেট!!

মোটা বিড়াল : বেড়ালজাতের বদনাম খুব,
সবাই বলে চোর
নেইকো কোনও রেপুটেশন
তাই জোটেনা ইনভিটেশন
মনের দুঃখে তাই
একলাটি গান গাই।

রোগা বিড়াল : সেজেগুজে এসো কিন্তু
আমি এখন যাই।
বাই বাই বাই।

(দুই বিড়াল হ্যান্ডশেক করে। চলে যায়।)

জুড়ির দল : (গান)

জেলেপাড়ার শুঁটকো বিড়াল ছিল মহা ধূর্ত
নিজের কর্ম হাসিল করতে দিব্যি চিটিং করত
জেলেদের বাড়িতে মোটাকে নিয়ে যাবে
সেইখানেতে পৌঁছে মোটা ঠ্যাঙার বাড়ি খাবে।
হয়তো বা সে যাবেই মরে
রোগা তখন গোয়ালাবাড়ির
পোষ্য হবে আদরে।

(গিটার বাজিয়ে রোগা বিড়াল পাশ্চাত্য সঙ্গীতে আলাপ ভাঁজে।)

জুড়ির দলের একজন : যেই কথা সেই কাজ— নেমন্তন্ন পেয়ে মনের আনন্দে গোয়ালাদের মোটা বিড়াল সাজগোজ শুরু করলো—গোঁফে দিল তা—
পারফিউমে ভরিয়ে নিল গা।

(এবার যেই না মোটা এসে জেলেপাড়ায় ঢুকেছে ওমনি হইচই পড়ে গেল।)

একজন জেলে : ওই দেখ, ওই দেখ— গোয়ালাদের সেই ক্ষীরখেকো বিড়ালটা এসেছে। ব্যাটা বেজায় চোর।

দ্বিতীয় জেলে : আমাদের মাছটাছ যা আছে সব খেয়ে যাবে। শিগ্‌গির ধর ব্যাটাকে।

তৃতীয় জেলে : মার ব্যাটাকে।

(ধুমধাম লাঠিপেটার শব্দ শুরু হয়।)

একজন জুড়ি : জেলেরা খুব হই হল্লা করল
মোটা বিড়ালটা বেচারা
শেষমেষ সে মারাই পড়ল।

দ্বিতীয় জুড়ি :

রোগা বিড়াল জানত আগেই এমনটা যে হবে।
গোয়ালাদের পোষ্য হবে ঠিক করেছে ক-বে!
খেল দেল ধুমসো হল আর হল গালফুলো
চকচকে লোম ঝিলিক মারে কান দু-খানি কুলো
নাদুস নুদুস তুলতুলে গা হুলো, ও মাই হুলো!

(দেখা যায় একদল বাচ্চা বিড়াল খেলা করছে। তারা

মজন্তালিকে দেখে ছুটোছুটি শুরু করে দেয়।)

বিড়াল ১ : ম্যাঁও-ম্যাঁও-ম্যাঁও।
আমরা সবাই বনের বিড়াল
করি হুটোপুটি—
কতুকুতু কে দিল রে
খাচ্ছি লুটোপুটি,
মাখছি গায়ে মাটি।

বিড়াল ২ : ওই দ্যাখ সেই বিল্লিটা রে
আগে ছিল শুঁটকো—
এখন কেমন গাল ফুলেছে
দ্যাখ না কেমন মুটকো!

বিড়াল ১ : বাব্বাঃ বড্ড ডাঁট
হাঁটছে সোজা উচ্চে মাথা
শিরদাঁড়া আঁটসাঁট।

বিড়াল ২ : চল না একটু ভাই, ওর কাছে যাই।

বিড়াল ১ : রাখ দেখি এই হ্যাংলাপনা,
তোর দরকার তুই যা-না।

বিড়াল ২ : *(রোগা বিড়ালের কাছে যায়।)*
মহাশয় নিন প্রণাম,
জানতে পারি আপনার নাম?

রোগা বিড়াল : ম্যাঁ-অ্যা-অ্যা-ও। আমার নাম মজন্তালি। পদবি সরকার।

বিড়াল ১ ও ২ : হজন্তা না অজন্তা না মজন্তা! হি হি হি! খি খি খি খি!

বিড়াল ১ : পদবি আবার সরকার। কোন সরকার রে? ভারত? ভারত সরকার?

বিড়াল ২ : ছাড়-না ওসব, তোর আমার কী দরকার?

(দুই বিড়াল হেসে লুটিয়ে পড়ে।)

জুড়ির দল : মোটা হয়ে শুঁটকো বিল্লি ফুলল অহংকারে
মেক-ওভারে বদলে গেল আহারে বাহারে।
জোর কদমে বুক ফুলিয়ে বলল সে বার বার—

মজন্তালি : এখন থেকে হলাম আমি মজন্তালি সরকার
একাই একশো, খাচ্ছিদাচ্ছি কাউকে নেই দরকার।

জুড়ির দল : এই-না বলে মজন্তালি কলম দিল কানে
চশমা এঁটে চোখের নীচে সুর্মারেখা টানে
বগলে নিল ছাতা, হিসাবের খাতা—
বদলে নিল রকমসকম পালটে ছিরিছাঁদ
চলল সোজা রাস্তা ধরে বেহদ্দ বজ্জাত!
আগে বলত ছন্দে কথা মিষ্টিমিষ্টি পদ্যে
এখন কথায় ঝাল ঢুকেছে কাঠখোট্টা গদ্যে।
চলতে চলতে পৌঁছে গেল
সে এক গভীর জঙ্গলে
সামনে দ্যাখে বাঘ-ফ্যামিলি
করছে খেলা দঙ্গলে।

(তিনটি বাচ্চা বাঘ চোরচোর খেলছে। তাদের মাঝখানে এসে পড়ল মজন্তালি। এখন থেকে সে নিপাট গদ্যে কথা বলবে।)

মজন্তালি : হুই, হ্যাট-হ্যাট। এইও বাচ্চারা, খাজনা দে-এ-এ-এ-এ!

বড়ভাই-বাঘ : মা, ও-মা, শিগ্‌গিরি এসো না। দ্যাখো কে এসেছে। কী সব হাবিজাবি বলছে!

মা-বাঘ : *(গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে।)* এই-ও, তুমি কে বাছা আমার বাচ্চাদের ভয় দেখাও? কোত্থেকে এলে, কী চাও?

মজন্তালি : আমি রাজার বাড়ির সরকার। তোরা যে আমার এলাকায় থাকিস— খাজনা দিস না কেন? দে দে, দে খাজনা।

মা-বাঘ : খাজনা কী? খাজনা কাকে বলে, আমরা জানিনা তো। আমরা এই বনে সপরিবারে থাকি। আর বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে কচরমচর চিবিয়ে খাই। এভাবেই পেট ভরাই। তুমি না হয় একটু অপেক্ষা কর, আমার কর্তা শিকারে গেছেন। তিনি এলে খাজনার ব্যাপারে কথা বোলো।

(এই কথা শুনে মজন্তালি একটু ঘাবড়েছে, কিন্তু বুঝতে দেবে না। সে তরতর করে একটা উঁচু গাছের মগডালে উঠে পড়ল। আর সেখান থেকে দেখতে লাগল কখন বাঘ আসে। খানিক বাদেই বাঘ এসে পড়ল। তখন সে কলম টলম ফেলে আরও উঁচুতে উঠে পড়ল। আর নীচে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল

বাঘিনী ঘেঁয়াও ঘেঁয়াও করে সব কথা বাঘকে নালিশ করে দিয়েছে। বাঘ তো এই সব নালিশ শুনেই তর্জন গর্জন শুরু করে দিয়েছে।)

বাঘ : কোথায়, কোথায় সে পাষণ্ড ?
আমি এক্ষুনি ব্যাটাকে চিবিয়ে খাব।
কচকচিয়ে খাব তার মুণ্ড।
কই কই সে পাষণ্ড। ব্যাটা ভণ্ড।
দাঁতে কেটে কেটে করব খণ্ড খণ্ড।

মজন্তালি : হি হি হি হি, কীরে বাঘা, খাজনা দিবি না ? আয় না, গাছের উপর উঠে আয়।

বাঘ : হালুম হালুম, তুই কোথাকার হরিদাস পাল।
নেমে আয় নীচে। শেষ করি তোর হাল।

মজন্তালি : আরে যা যা, তুই তো দানবের মতো দামড়া। পারবি আমার মতো ফিনফিনে ছোট্ট ডালে দোল খেতে ?

জুড়ির দল : এসব শুনে বাঘমামা তো গেল বেজায় রেগে
মজন্তালিকে করল তাড়া ছুটল প্রবল বেগে
ধরতে সে তো পারে না,
ধরে মারতে পারে না
মোটা ডালের থেকে বাঘা এমন লম্ফ ঝাঁপাল
হড়কে পড়ে গাছের ডালেই গলা আটকে গেল।
ঘাড় ভেঙে আর চোখ উলটে জিভটা গেল বেরিয়ে
বাঘমামা তো চলেই গেলেন
ইহলোককে ছাড়িয়ে।

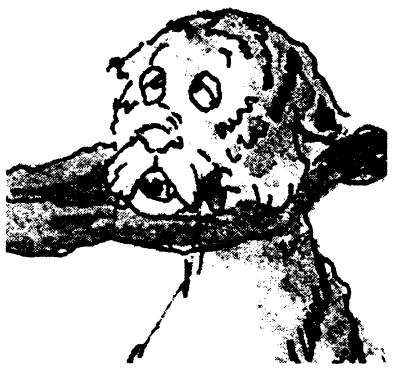

হায় হায় হায় হায়, হায় গো হায় হায়
মজন্তালি নেমে এসে বাঘের কাছে যায়
মরা বাঘকে থাবা দিয়ে আঁচড়ায় কামড়ায়।
তারপরে সে বুক ফুলিয়ে
বাঘিনিকে ডাক দেয়।

মজন্তালি : দ্যাখ দ্যাখ কী হাল করেছি। ওরে ও বাঘিনি, দেখে যা তোর বরের বেয়াদপি কেমন ভেঙে দিয়েছি।

বাঘিনি : *(ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে এসে বলে।)* দোহাই মজন্তালিমশাই আমাদের প্রাণে মারবেন না। আমরা আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

মজন্তালি : বেশ, থাক তবে। ভালো মতো আমার সব কাজকর্ম করিস, আর আমাকে রোজ বনের পশুপাখি ধরে খেতে দিস। আমার আবার আমিষ ছাড়া মুখে রোচে না।

জুড়ির দল : এমনি করে মজন্তালি বাঘ ফ্যামিলির সভ্য হল
অত্যাচারে বাঘ ফ্যামিলির সবাই রসাতলে গেল।
গেল তাদের এতদিনের পুরোনো সব কালচার
সারাক্ষণই সইতে হত মজন্তালির অত্যাচার!
বাচ্চাগুলো থাকত সদাই ভয়ে জড়োসড়ো
ভাবত বুঝি মজন্তালি সত্যিই খুব বড়ো!
কাটল ভয়ে কাটল ডরে কাটল কিছুদিন
বাঘিনি তার কাছে গিয়ে হাজির হল একদিন
করজোড়ে ভয়েভয়ে বলল, মজন্তালিকে
বনের সবাই ডরায় বড্ড মজন্তালির গালিকে।

বাঘিনী : দোহাই মশাই মজন্তালি, এই বনে বড্ড পুঁচকে পুঁচকে জানোয়ার, তাতে আপনার পেট ভরেনা। নদীর ওই ওপারে একটা খু—উ—ব ঘন বন আছে, সেখানে শুনেছি খুব বড়ো বড়ো জানোয়ার আছে। আপনি বরং ওইখানে চলুন আরও অনেক বেশি আরামে থাকতে পারবেন।

মজন্তালি : ঠিক বলেছিস। চল তাহলে নদীর ওপারে যাই।

(জুড়ির দল মুখ থেকে জলের কলকল শব্দ বার করে।)

জুড়ির দল : বাঘ ফ্যামিলি চিরকালই সাঁতার দিতে পারে
একনিমেষে চলে গেল নদীর অন্য পারে।
মজন্তালি মাঝনদীতে ভীষণ নদীর ঢেউ

হাবুডুবু জলের তোড়ে কাঁদছিল কেঁউকেঁউ!
ঢেউয়ের দোলায় প্রাণ যায় যায়—
আপন মনেই বলে হায় হায়—
এক লাফে বাঘছানা নামে নদীজলে
সরকারমশাইকে তুলে নেয় কোলে,
পাড়ে তুলে দিল তাকে নতুন জীবন।
বিল্লির চোখে তবু জ্বলছে আগুন!
নিলাজ বেহায়া সে যে, মহা পয়মাল
ছোটো ছোটো বাচ্চাকে দেয় গালাগাল!

মজন্তালি : হতভাগা মূর্খের দল। উল্লুক-বেল্লিক, গাধা কতগুলো। দ্যাখ তো আমার কী সর্বনাশ করলি!

বাচ্চা-বাঘ : অপরাধ নেবেন না, বলুন মশাই কী করেছি?

মজন্তালি : নাঃ, অপরাধ নেব না! হারামজাদা, দিলি তো আমার অমন জরুরি হিসেবটা কেঁচিয়ে। জলে শুয়ে শুয়ে আমি একটা জরুরি হিসেব কষছিলুম। ওটা শেষ না হতেই আমাকে জল থেকে তুলে আনলি। আমার সব হিসেব গুবলেট হয়ে গেল, মাঠে মারা গেল।

বাচ্চা-বাঘ : মাপ করে দিন, ওটা কীসের হিসেব ছিল প্রভু?

মজন্তালি : ইয়ের ওই, ইয়ের হিসেব। আমি গুণছিলুম, মানে গুণে গুণে দেখছিলুম নদীতে টোটাল কতগুলো ঢেউ, কতগুলো মাছ আর ওই জলে মানে ঠিক কতখানি জল আছে। মূর্খ, গাধা, বেহদ্দ বোকার দল! মাঝনদী থেকে তুলে এনে আমার সব হিসেবনিকেশ চৌপট করে দিলি।

বাচ্চা-বাঘ : সরি, সরি মশাই, সরি—

মজন্তালি : এ্যাঁ—সরি, গাধা কোথাকার। এখন রাজামশাইকে যদি হিসেবটা না দিতে পারি, তো মজাটা টের পাবি।

বাচ্চা-বাঘ : *(ভয়ের চোটে কেঁদে ফেলে।)* ভ্যাঁ-ব্যাঁ-ভ্যাঁ-ব্যাঁ—

মা-বাঘ : *(গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে।)* মশাই-মশাই ঘাট হয়েছে, এবার থামুন। আমার এই ছোটো ছেলেটা একেবারেই মূর্খ। লেখাপড়া কিছু জানে না। তাই তো অমন ভুল করে ফেলেছে। ওকে আর ভয় দেখাবেন না।

মজন্তালি : ঠিক আছে এবারের মতো ছেড়ে দিলাম। আর কখনও যেন এমনটা না হয় বুঝলি। উ-হু-হু-হু—এতক্ষণ জলে ভিজে ভিজে কেমন নেতিয়ে গেছি। খু-উ-ব শীত পাচ্ছে রে, গায়ে বড্ড কাঁপুনি দিচ্ছে। একটু রোদ কোথা পাই বল তো!

মা-বাঘ : আপনি তো চমৎকার গাছে চড়তে পারেন। গাছে চড়ুন, সেখানে অনেক রোদ্দুর আছে।

মজন্তালি : বেশ বেশ, ঠিক আছে। আমি তবে এই গাছটার ওপর চড়ি। কোনও দরকার পড়লে ডেকে নিস কেমন!

জুড়ির দল : হু ম্যাঁও ম্যাঁও
বেড়ালের ছা,
রোদ পোহাতে
মগডালে যা
মগডালে যা—

মজন্তালি : *(গাছের ওপর উঠে বলে—)* আঃ, এখানে কী চমৎকার রোদ্দুর! ঠান্ডায় জমে যাচ্ছিলুম। নদীর জল তো নয় যেন বরফের ঘূর্ণি। বা রে এই জায়গাটা তো বেশ। দিব্যি জঙ্গলের সবটা দেখা যায়। আরে, ওখানে ওটা কী? বিরাট একটা কালো মোষ! মরে পড়ে আছে নাকি! এইবারে দেখাব আমার চালাকি। ওটার গায়ে একটু আঁচড়ে কামড়ে দিয়ে বলব যে আমিই মেরেছি হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! *(নীচে নেমে এসে চেঁচাতে থাকে—)* বাঘিনী, ও বাঘিনী, কই গেলিরে বেটি বাঘিনী। যা যা শিগগির যা, গিয়ে দেখে আয় জঙ্গলের মোড়ে একটা ইয়াব্বড়া মোষ মেরেছি!

মা-বাঘ : *(ছুট্টে গিয়ে দেখে এসে অবাক—)* ও মা! ওরে ছানারা দেখেছিস, আমাদের মজন্তালি মশায়ের গায়ে কত্তো জোর! মশাই, ও মশাই?

মজন্তালি : কেন এত জ্বালাস! বল, কী বলছিস হ্যাঁ?

মা-বাঘ : মশাই বলছিলাম কী—এই বনে না আরও অনেক বড়ো বড়ো জন্তু আছে। একসাথে যাই সেইগুলোকেই মারি।

মজন্তালি : আরে, আমি হলাম বীরশ্রেষ্ঠ মজন্তালি। হাতি গণ্ডার এরাই হল আমার উপযুক্ত শিকার। চল চল, আজই

যাই, এক্ষুনি যাই।

মা-বাঘ : চলুন তবে। কিন্তু মশাই, আপনি খাপে থাকবেন, না ঝাঁপে থাকবেন? হা-লু-উ-ম।

মজন্তালি : খাপে ঝাঁপে আবার কী রে? ওগুলো কি কোনও নতুন জন্তু নাকি?

মা-বাঘ : না স্যার জন্তু নয়। ও দুটো আমাদের শিকারের টার্মিনোলজি। খাপে মানে—কোনও জন্তু এলে তাকে ধরার জন্য ঘাপটি মেরে থাকা। আর ঝাঁপে মানে— ঝাঁপাঝাঁপি করে তাকে তাড়িয়ে আনা।

মজন্তালি : *(মনে মনে বলে—)* হুঁ আমি তো এই ছিরির এক পুঁচকে বিড়াল। আমার তাড়ায় আর কোন জন্তু ভয় পাবে! *(সবাইকে শুনিয়ে গলা খাঁকারি দেয়—)* আমি কষ্ট করে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে যেসব জন্তু পাব, তা কি তোরা মারতে পারবি? আমি বরং খাপেই থাকি, তোরা ঝাঁপে যা।

মা-বাঘ : *(খুশি হয়ে ছানাদের বলে—)* হ্যাঁ মশাই ঠিক বলেছেন, চল চলরে বাছারা আমরা সবাই ঝাঁপেই যাই। *(তিনটে বাঘ মিলে ভয়ানক হালুম হুলুম শব্দ করতে করতে জঙ্গলে মিলিয়ে যায়।)*

জুড়ির দল : বাঘ ফ্যামিলি ঝাঁপে গিয়ে হাঁকডাক দেয় বড়ো
বনের যত জন্তু হল ভয়েই জড়োসড়ো
মজন্তালি লোক দেখিয়ে হাততালি দেয়
আসলে কিন্তু কাণ্ড দেখে সেও পেয়েছে ভয়!
হাতি, মহিষ, ভালুক এল জন্তু বড় বড়
রকম দেখে মজন্তালি কাঁপছে থরোথরো!!
খানিক বাদে এল একটা সজারু
কাঁটার চোটে ঘায়েল করল
সেই আঘাতে বেরিয়ে পড়ল
মজন্তালির বুজরুকি আর মজারু!
আরও পরে এল একটা হাতী
বাঘ ফ্যামিলির তাড়া খেয়ে
বিল্লিটাকে দেখতে পেয়ে
পেটের ওপর মারল কষে লাথি!!
খেলা এবার হবেই বুঝি শেষ
পেট ফেটে তার নাড়িভুঁড়ি
মাটিতে খায় গড়াগড়ি
তবুও ব্যাটা বকেই চলে
গড়গড়িয়ে মিথ্যে বলে
বুঝল সবাই ধাপ্পাবাজ সে বেশ!

(নাটক শুরুর সময়ের সেই মিঠি আর দিদুন প্রবেশ করে।)

মিঠি : দারুণ দারুণ দারুণ দিদুন। তারপরে কী হল?

দিদুন : তারপরে সেইখানে বাঘ ফ্যামিলি এল—
এসে তারা অবাক মানে
মজন্তালির করুণ গানে
বলল তারা, মশাই এ কী হল?

বাচ্চা বাঘ : মা, কিচ্ছুটি হয়নি। মশাই মনে হয় অন্য কোনও নতুন খেলা দেখাচ্ছেন। দেখছ না উলটে পড়ে আছেন, কিন্তু মিটির মিটির হাসছেন! *(মজন্তালিকে তারা আকুল হয়ে ডাক দেয়—)* মশাই, ও মশাই শুনছেন। আপনার পেট থেকে ওগুলো কী বেরিয়ে আছে স্যার?

দিদুন : কথায় বলে, স্বভাব না যায় মলে
কয়লার ময়লা না যায় ধুলে!
মরতে মরতেও মজন্তালি
ভাঙে কিন্তু মচকায় না!

মজন্তালি : খ্যাঃ খ্যাঃ খ্যাঃ। তোরা ঝাঁপাঝাঁপি করে যেসব পুঁচকে পুঁচকে জানোয়ার পাঠিয়েছিলি সেগুলো দেখে আমার এমনি হাসি পেল— হাসতে হাসতে আমার পেটটা ফটাস্ করে ফেটে গেল। তারপরেই তো নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে গেল রে-এ-এ-এ-এ!

(মজন্তালি চোখ উলটে পড়ে মরে গেল। আর বাঘ ফ্যামিলি সেই শো ।)

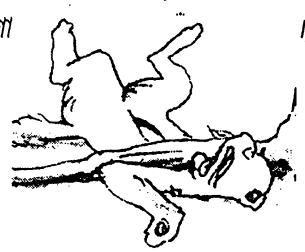

মিঠি : ও দিদুন বাঘগুলো তো ভালো। বল না তারপরে কী হল?

দিদুন : তারপর—আমার কথাটি ফুরোলো
নটেগাছটি মুড়োলো।

মিঠি : কেন রে নটে মুড়োলি?

দিদুন : গপ্প থেকে কী শিখলি?

মিঠি : দুষ্টু যারা অতি, তাদের এমনি পরিণতি।
লোক ঠকিয়ে এই জীবনে হয় না কোনও গতি।

(দিদুন আর মিঠি দুজনে একসঙ্গে হেসে ওঠে)

ছবি: রাহুল মজুমদার

ধারাবাহিক উপন্যাস

পঞ্চম কিস্তি

(মিত্তিরবাগানে পোড়ো বাড়িতে দোতলায় উঠল রামু। আগের রাতে এখানে একটা অদ্ভুত নীল আলো দেখেছিল সে। সিঁড়ির মাথায় দরজায় তালা, দরজার উপরে সামান্য ফাঁক দিয়ে সে ঢুকল, কিন্তু উঁচু থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরতে রামু দেখে নীল আলো। এক বৃদ্ধ, নাম তাঁর ভুনুচ। লুকিয়ে আছেন তিনি—নিম্মো আসছে, আরসাইনের যুবরাজ। সুদূর তারা আরসাইনের লোকেরা মানুষ নয়, ফুলোট। তারা বহুকাল আগে সভ্য হয়েছে— উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যায় লক্ষ মানুষের ইচ্ছাশক্তি পোরা আছে নীল পাথরে। পাথরটা লুকিয়ে রাখতে হবে যাতে নিম্মো সেটা না পায়। পাথরটা ছোটো হয়ে সুপুরির মাপের হয়ে গেল। উনি রামুকে দিলেন, বললেন খুব সাবধানে রাখতে।

পাড়ার নাটকের মহড়ায় ঝগড়া হয়ে সন্ধ্যের অন্ধকারে দৌড় মারল নকুড়। তারপরই নকুড়ের বাবা সত্য ভট্‌চায্ হাজির। তখন কয়েক জন ওরা নকুড়কে খুঁজতে বেরোল। নকুড় পথে দেখে দৈত্যের মতো বিশাল এক ছায়ামূর্তি, 'ভুনুচ কোথায়?' প্রশ্ন করে নকুড়কে শূন্যে তুলে ঝাঁকাল নিম্মো। বাড়ি ফিরে সে বলল গ্রামে এক দৈত্য এসেছে।

শশধর চাটুজ্জে, রামুর বাবা বেরিয়েছেন রামুকে খুঁজতে, জটাধরও চলল সঙ্গে। বাঁশবনের মধ্যে ঝোপঝাড় ভেঙে ওরা পৌঁছল বিশে তান্ত্রিকের বাড়ি।

নীল আলোটার দিকে যাচ্ছিল কালীপদ। ঘোষেদের পুকুরের ওপারে তালগাছের চেয়ে উঁচু কী একটা! সেটার ভেতরে যন্ত্রে ভরতি ক-টা ঘর। এগুলো সব স্বপ্ন, নিশ্চিত হয়ে লাল-নীল বোতামগুলো এলোপাথাড়ি টিপতে লাগলেন তিনি। সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘরটা কেঁপে উঠল থরথর করে—ছিটকে পড়লেন কালীপদ।

রামু বাড়ি ফিরে সেজোকাকার জেরায় সব বলে ফেলল। সেজকা ওকে ঘুমোতে বললেন। ওস্তাদ চোর ভোম্বল ওদের বাড়িতে চুরি করতে এসে শোনে মাঝরাতে অনেক লোকের গলা। বেরিয়ে এসে একটু বাদে সে দেখে তার বুকপকেটে একটা নীল আলো জ্বলছে। সামনে গাছে ঝুলছে এক বুড়ো, সে বলল, ও পাথরটা তোমার নয়, 'ওটা রামুকে দিয়ে এসো।'

কালীপদর চিরকালের অভ্যেস যন্ত্রপাতি ঘেঁটে বিগড়ে দেওয়া। এই যন্ত্রও কি বিগড়ে গেল? এক দৈত্য কালীপদর দিকে এগিয়ে এল, তার কথা পছন্দ না হতে ওকে শূন্যে তুলল। রক্ষা পেতে কালীপদ বলল যে, ও নিম্মোকে ভুনুচের কাছে পৌঁছে দেবে।

সেজকা রামুকে বলল, 'নিম্মো এসেছে, ভুনুচকে বাঁচাতে হবে।' পাথর নেই, তবু দু-জনে চলল মিত্তির বাগানে। ভোম্বল ওদের পিছু নিয়ে পাথরটা পৌঁছে দিল।

শশধর, নিতাই, জটাধর সকলে চলল দৈত্যের খোঁজে। নিধুবাটিতে ওরা দেখা পেল নিম্বোর। কিন্তু তার অস্ত্রে তখন প্রচণ্ড ঝড় উঠল, আর আকাশে লাল আগুন।

ভুনুচ রামুকে বলল, 'নিম্বো জেনে গেছে আমি এখানে। এখন তুমি আর পাথরই ভরসা।' ভুনুচের কথায় পাথর হাতে নিয়ে রামু বলল, 'নিম্বোকে থামাতে হবে—সকলকে বাঁচাতে হবে।' বিদ্যুৎবেগে শূন্যে উড়ে চলল রামু।)

হলধর গাছের ডাল ধরে পাক খেতে খেতে মুচ্ছো গিয়ে চিৎপাত হয়ে গাছতলায় পড়ে আছেন। নিতাই হাওয়ার ঝাপটায় হলধরের গায়ের ওপর সপাটে পড়লেন। হলধর ছটফট করে উঠলেন, 'আঃ, কী হচ্ছে কী! মুচ্ছো যাবার ভান করে পড়ে আছি, তাতে বাগড়া দাও কেন?'

নিতাই ভেংচে উঠল, 'ভান করার দরকার কী?'

'আঃ, বুঝছ না কেন! মারা গেছি ভেবে শয়তানটা যদি রেহাই দেয়।'

তারাপদ টাল সামলাতে না পেরে পায়ে পায়ে জট পাকিয়ে মুখ থুবড়ে দু-জনের পাশে এসে পড়লেন।

'তখনই বারণ করলুম, এসো না। সাক্ষাৎ যমদূতের পাল্লায় এনে ফেললে আর কি ফিরতে পারব।'

সত্য ভট্চায যতবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন একটা করে ঘুর্ণিবাতাস এসে লাট্টুর মতো পাক খেয়ে যাচ্ছেন, 'দেখো দেখি কী অসভ্যতা, আরে দাঁড়াতে দিবি তো রে বাবা!' বলতে বলতে আবার লাট্টু।

জটাধর প্রাণপণে একটা গাছের গুঁড়ি জাপটে ধরে পড়ে আছে। বিড়বিড় করছে, 'এই বিপদে আপনি কোথায় গেলেন খুড়ো, একটা কিছু করুন।'

হরিপদ বলল, 'বিপদে রামনাম করো জটাদা, তাহলে হয়তো কিছু হলেও হতে পারে। তা না-করে কাকে-না-কাকে ডাকছ।'

জটাধর গাছের গুঁড়িটা আরও জোরে খামচে ধরে বলল, 'হ্যাঁ, ওই নাম করি, আর শেষ আশাটুকু যাক।'

টালমাটাল হয়ে কুঁজো অবস্থায় উঠে দাঁড়ালেন কালিপদ। বয়েস থাকলে পিশাচটাকে বোঝাতেন, কত ধানে কত চাল। চোখের জোড়া লাল আলো দুটো সটান এসে পড়ল কালিপদর বুকে। মনে হল, বল্লমের খোঁচা লাগল। কালিপদ ছিটকে পড়লেন। মাথাটা ঠুকে গেল শক্ত কিছুতে। মাথার মধ্যে সব দুলে উঠল। কোনওমতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে টাল সামলালেন। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। পেটের ভেতর থেকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে মুঠোমুঠো রাগ উঠে আসছে। রাগে সারা শরীর কাঁপছে। সামনে বেশ কিছুটা দূরে হাতের লাঠিটা পড়ে রয়েছে। টলমল পায়ে লাঠি অবধি পৌঁছে গেলেন কালিপদ। শক্ত হাতে লাঠি চেপে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে এগোলেন পিশাচটার দিকে।

হলধর চোখ পিটপিট করে ঘটনার দিকে নজর রাখছিলেন, 'কী সব্বোনাশ! কালিকাকার হল কী? অমন গোঁয়ারগোবিন্দর মতো রাক্ষসটার দিকে এগোচ্ছে কেন?'

শশধর চিৎকার করে বারণ করছেন কালিপদকে। অনর্গল বাজের পিলে চমকানো আওয়াজে কিছুমাত্র শুনতে পাচ্ছেন না নিজেই। বুঝলেন একটা খারাপ কিছু হতে চলেছে।

দুটো লাল আলো বুকে আবার এসে পড়তেই রাগে হিতাহিতজ্ঞানহারা হয়ে কালিপদ হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে মারলেন। বুকে চিনচিন করে একটা খোঁচা লাগার অনুভূতি হল।

হলধর কালিপদর কাণ্ডকারখানা হাঁ হয়ে দেখছিলেন। পাশে তারাপদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ছুঁড়ল? কী হে ওটা?'

তারাপদ বললেন, 'হাতের লাঠি ছুঁড়েছে। আহাম্মকি আর কাকে বলে? ওইভাবে কখনও ওই যমদূতকে—' মুখের কথা মুখেই রইল তার। চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে রসগোল্লার মতো হয়ে গেল। মুখের হাঁ-টা আর বন্ধ হল না, 'আরে বাপ রে, এ কী দেখছি?'

শশধর চিৎকার থামিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আছেন সামনে। কালিপদর হাতের লাঠি বাতাসে পাক খেতে খেতে উড়ে যাচ্ছে পিশাচটার দিকে।

কালিপদ পাগলের মতো তাকিয়ে আছে লাঠিটার দিকে। শন্‌শন্ করে বাতাস কাটার শব্দ, লাঠি আছড়ে গিয়ে পড়ল পিশাচটার মাথায়। ছিটকে পড়ল অতবড়ো শরীরটা।

সমস্ত ঝড়ের হাওয়া যেন এক মুহূর্তে থেমে গেল। ঝপ্ করে সব থমথমে। জটাধর পেছনে তাকিয়ে দেখল হাতে একটা নীল রঙের পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রামু।

শশধর দেখতে পেলেন রামুকে। হাঁক দিলেন, 'তুই এখানে কী করছিস? বাড়ি যা।'

রামু উত্তর দিল না, এগিয়ে গেল কালিপদকে পেছনে রেখে। সামনে হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ফিরে যাও নিম্বো, ফিরে যাও।'

নিজের ছেলের গলা চিনতে পারলেন না শশধর। অদ্ভুত এক মায়াবী কণ্ঠ। নিম্বোর শরীরটা উঠে দাঁড়াল, 'পাথরটা আমাকে দাও, ওই পাথর আমার চাই।'

হিংস্রভাবে নিম্বো লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে এল। বাকিদের মুখে কোনও কথা নেই, নিঃসাড়ে শুধু দেখে যাওয়া।

রামুর মুখে একচিলতে বাঁকা হাসি, 'পাথর তো পাবে না।'

রামুর হাতের পাথর থেকে নীল আলো গুলে গুলে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। নিম্বো চেঁচাল, 'এ পাথর আমার।'

'না, এ পাথর তোমার নয়। তুমি দুষ্টু।'

শশধর এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কালিপদ হাত ধরলেন, 'যেও না, যদি খুব বুঝতে ভুল না করি, ওর কোনও ক্ষতি হবে না।'

নিম্বোর হাতের লাল পাথরটা আরও বড়ো হয়ে উঠছে। সেটার থেকে সাঁড়াশির মতো দুটো আলোর হাত বেরিয়ে রামুর হাতের পাথরের ওপর গিয়ে পড়ল। রামু হাত সরিয়ে নিতে গিয়েও দেখল হাতটা চুম্বকের মতো লাল আলোয় আটকে গেছে। নীল পাথর আকারে ক্রমশ ছোটো হচ্ছে। তুলোর মতন পেঁজা পেঁজা নীল আলো টেনে শুষে নিচ্ছে লাল সাঁড়াশিটা।

নকুড় ফিসফিস করে নিতাইকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হচ্ছে বলুন তো মাস্টার?'

নিতাই গালে হাত দিয়ে খানিকটা চুলকে নিলেন, 'বুঝতে পারছি না ঠিক। খুব উঁচু দরের পালা বলেই মনে হয়।'

জটাধরের কানের কাছে দিনুখুড়োর গলা শোনা গেল, 'শশধরের বাড়ি যা একবার ঝপ্ করে।'

জটাধর অবাক হলো, 'আবার সেখানে কেন?'

'সময় নেই রে, দৌড়ে যা।'

'তা না হয় যাচ্ছি...কিন্তু সময় বলছেন খুব কম, অথচ যেতেও তো সময় লাগবে।'

'আমি সঙ্গে আছি তো। সময় তেমন লাগবে না। সামনে যা দেখছিস ততটা না হলেও আমরাও একেবারে ফ্যালনা নইরে।'

ভুনুচবুড়ো বুকে হাত দিয়ে চিনচিন করে উঠল, 'শুষে নিচ্ছে, সব শক্তি শুষে নিচ্ছে!'

সেজকা ঘাবড়ে গেল, 'শুষে নিচ্ছে মানে?'

'নীলপাথরের সব শক্তি নিম্বো নষ্ট করে দিচ্ছে। উঃ—'

বুকে হাত ঘষতে ঘষতে কুমড়োগড়াগড়ি করল ভুনুচবুড়ো।

'তাহলে?' সেজকার গলা কাঁপছে।

'সাংঘাতিক শক্তি লালপাথরের। আরসাইনের সমস্ত শয়তান মগজের ঠাসবুনোট চিন্তা ওই পাথরে। নিম্বো আসার আগে পাথরে নতুন করে শক্তি ভরে এনেছে। আমি পালিয়ে আসার পর নীলপাথর আর নতুন করে ঘষামাজা করা হয়নি।'

'লালপাথরটা তৈরি করেছে কে? আপনি?'

'না না, আমি নই। করেছে বুনুচ।'

'সে কে?'

'সে আমার ভাই। আমার মতন দেখতে। একেবারে এক। কিন্তু সে শয়তানদের দলে। সে খারাপের দলে। নিম্বো নীলপাথরকে শেষ করে দেবে, তারপর আর তাকে আটকানো যাবে না।'

সেজকা ভুনুচবুড়োর হাত শক্ত করে চেপে ধরল, 'তা হয় না, হতে পারে না। আপনি আপনি কিছু করুন।'

'আমি? আমি কিছু করতে পারব না। নীলপাথর ছাড়া নিম্বোকে আটকানো যাবে না।'

'পাথরের বদলে অন্য কিছু? যা দিয়ে কিছু করা যায়? একটু ভাবুন।'

ভুনুচবুড়ো মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল—'অন্য কিছু মানে, নীলপাথর—আঃ, ঘুরেফিরে সেই একই জায়গায়! নীলপাথর তো নষ্ট হয়ে গেছে।'

ভুনুচবুড়ো চট করে নিজের গায়ের ছোট্ট পোষাক থেকে ছোট্ট কাচের মতন একটা গোলক বের করল।

'আমার কাছে আর কিছু নেই, খালি এইটে আছে।'

'কী এটা?'

'এটা একটা আধার। নীলপাথর যখন তৈরি হয় এমনই ছিল। তৈরির পর ছোটো করে নেওয়া হয়, তাতে ঘনত্ব বাড়ে। ফোঁটা ফোঁটা করে শক্তি জমা হয় এই আধারে।'

'তুবড়িতে মশলা ঠাসার মতন?'

'তা হবে।'

'কিন্তু এটা তো ফাঁকা?'

'হ্যাঁ, ফাঁকাই তো। আমি যখন নীলপাথর বানিয়েছিলুম

তখন যদি প্রথম কাজে ব্যাঘাত ঘটে তাই দুটো আধার তৈরি করিয়েছিলুম। একটা খালি পড়ে আছে।'

'মানে, মশলা ঠাসলে এটাও শক্তি গোলক হবে?'

'হবে। সে প্রক্রিয়াও আমার জানা। কিন্তু রসদ কোথায়? শত শত জ্ঞানী ফুলোটদের সৎ চিন্তা আর আরসাইনের সমস্ত দয়ামায়া, শুভশক্তি ঢুকেছিল নীলপাথরে। সে সব আমি কোথায় পাব?'

বিড়বিড় করে কীসব বলে নিজের দাড়িতে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট একটা পেনসিল বের করে আনল ভুনুচবুড়ো। সেটার মাথায় একটা ছোট্ট সাদা বলের মতন। টুংটাং আওয়াজ করে পেনসিলটা কাচের মতো স্বচ্ছ গোলকটার গায়ে লাগাতে গোলকের গা বরাবর জলের মতো আঁকিবুকি দেখা গেল।

ভুনুচবুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'কিচ্ছু হচ্ছে না। হবে কী করে? ভেতরটা তো ফাঁপা।'

ভবতারিণী রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে আছেন। হাওয়া থেমে যাবার পর চারদিকে একটানা শুধু ঝিঁঝির আওয়াজ। কাছেপিঠে কেউ বলল, 'বিন্তি, রান্নাঘরে যা একবার!'

ভবতারিণী চমকে উঠলেন যারপরনাই! আশেপাশে কেউ নেই, কে কথা বলে! তার চেয়ে চমকে উঠেছেন, বিন্তি ডাক শুনে। খুব ছোটোবেলায় ভবতারিণীর নাম ছিল বিন্তি। সে নামে ডাকার লোক তো আর কেউ নেই। হঠাৎ নিজের পুরোনো নাম শুনে মাথা ঘুরে গেল তাঁর।

'ভয় পাসনি, আমি দিনু-কা রে মা!'

ব্যাপার বুঝতে দেরি হল না ভবতারিণীর। আঁচলটা মাথায় টানলেন।

'কতকাল পরে এ বাড়িতে এলেন কাকাবাবু!'

'বসতে আসিনি বিন্তি। একটা আরজি নিয়ে এসেছিলুম। তা তোর মুখ শুকনো কেন?'

'ঘরের মানুষরা সব জঙ্গলে ডাকাত তাড়াতে গেছে। মনটা বড়ো কু-ডাকছে কাকাবাবু।'

'এক বাটি পায়েস রাঁধতে পারবি মা?'

'পায়েস, আর পায়েস! কাল থেকে বড়োটা বায়না ধরেছিল ভালো পায়েস খায়নি অনেকদিন। আজ সকাল থেকে হাঁড়ি আগলে বসে আছি। বাড়ির কেউ-ই তো কিছু মুখে দেয়নি। ও ফেলাই যাবে কাকাবাবু।'

'পায়েস আছে বলছিস?'

'যেমনকার তেমনি পড়ে আছে।'

'তবে আয় দেখি হাঁড়িটা আর একটা কান উঁচু থালা নিয়ে। পায়েস কাটাবার হাতাখানাও সঙ্গে নিস।'

ভবতারিণী গেলেন রান্নাঘরে।

'আমাদের গুণের ভাইপো, বুঝলি! বাপ-জ্যাঠার বিস্তর ছিল। এখন তো আর কিছুই নেই। ক-দিন ধরে দু-ফোঁটা পায়েসের জন্য বড়ো হেদোচ্ছে। আজ দেখলুম গুড়-রুটি নিয়ে ছলছল চোখে বসে আছে। তাই তোর কাছে এলুম। ছোঁড়াটাকে দে দেখি বেশ করে দুটি খাইয়ে।'

ভবতারিণী পায়েসের হাঁড়ি নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে

এলেন।

'আহা, দুধের বাছা, খাবে বলে হা-পিত্যেস করছে। এ যে কানে শুনলেও অধম্মো হয়। দেখো দিকি কাণ্ড! কই, সে কই?'

জটাধর কিছুই বুঝতে পারছে না। দীনুখুড়ো তাকে এক জায়গায় বসতে বলে করছেন কী? ভবতারিণী এগিয়ে এলেন—'আহা, ওখানে কী করিস গোপাল? দাওয়ায় আয়। আসন পেতে দিয়েছি। গোছ করে বস দেখি। তোকে মণ্ডা-মেঠাই খাওয়াব, সে দিন কি আর আছে? একটু পায়েস করিচি, মুখে দে।'

জটাধর ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে আসনে বসল। ভবতারিণী সামনে হাঁড়ি নামিয়ে বসলেন। ঢাকনি সরিয়ে দু-হাতা পায়েস থালায় ঢেলে দিলেন।

'আমি একটু জল গড়িয়ে দি, হাতখানা একটু ধুয়ে নে বাপ।'

তা-ই করল জটাধর। থালার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কাঁপা কাঁপা হাতে পায়েসের ওপর আঙুল ছুঁইয়ে ভবতারিণীর দিকে তাকাল।

'রয়ে-সয়ে, ধীরে-সুস্থে খা বাপ।'

জটাধর একটুখানি মুখে তুলতে ভবতারিণী জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, খাওয়ার মতো হয়েছে তো?'

জটাধরের চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ল গাল বেয়ে।

সেজকা রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে কাচের আধারটার দিকে। গোলকটার মধ্যে চুঁইয়ে চুঁইয়ে এক ফোঁটা, দু-ফোঁটা করে নীল রং মিশছে। ভুনুচবুড়ো পাগলের মতো বিড়বিড় করছে!

'কী করে হচ্ছে জানি না। আধার নীল হচ্ছে! কোথাও কিছু একটা ঘটছে, সাংঘাতিক কিছু।'

দু-হাতা শেষ করার পর ভবতারিণী আরও চার হাতা পায়েস ঢাললেন থালায়।

'পায়েস খেতে বড়ো মন করেছিল, না রে?'

জটাধর মাথা নাড়ল।

'যখন খুশি আমার কাছে আসিস বাপ।' ভবতারিণী আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছলেন।

সেজকা লাফিয়ে উঠল, 'বাড়ছে! আরও বাড়ছে! ফোঁটা ফোঁটা নীল আলোতে ভরে যাচ্ছে গোলক।'

শশধর রামুর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছেন। কালিপদকে বললেন, 'রাক্ষসটার হাত থেকে হতভাগাকে সরিয়ে আনতে হবে, আমায় আটকাবেন না কালিকাকা।'

বিশ্বম্ভর তার চালার সামনে দূরে চোখ রেখে পাথরের মতন তাকিয়ে আছে। গোপালকে তার বড়ো দেখতে ইচ্ছে করছে। এতদিন তার কাছে কাছে ছিল। রক্তবস্ত্র, মাদুলি, তাবিজ, সাধনার যত পুঁথিপত্র সব পেছনে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুনে। নীল তীব্র আলো ছড়িয়ে পড়ছে গোলোক থেকে। ভুনুচবুড়ো একগাল হেসে তাকাল সেজকার দিকে। সেজকা হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল, 'ইউরেকা! মার দিয়া কেল্লা!'

হাতের পাথরটা নিশ্চিহ্ন হয়ে উবে যেতে সম্বিৎ ফিরে পেল রামু। শরীরের হালকা চনমনে ভাবটা চলে গেছে। হাত-পাগুলো অসম্ভব ভারী লাগছে। লালপাথরের আকার আগের দু-গুণ হয়েছে। রামুর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। শুধু এটুকু বুঝতে পারল এখন আর কোনও উপায় নেই নিম্বোকে আটকানোর।

'এই নে রামু, ধর।'

রামু চকিতে ঘুরল। একটা অন্ধকারে মানুষের ছায়া দু-হাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড়ের ওপর আর কে একটা যেন গ্যাঁট হয়ে বসে। 'সেজকা, ভুনুচবুড়ো!'

ঠক্ করে পায়ের কাছে কী যেন একটা পড়ল। রামু নীচু হয়ে কুড়োল। সেজকা হাতে করে নীলপাথরটা আস্তে করে শূন্যে ছেড়ে দিল। পাথর ভাসতে লাগল। ক্রমশ নীল রঙের গোলক হয়ে গেল। নিম্বোর হাত থেকে বেরিয়ে এল বিদ্যুতের মতন আঁকাবাঁকা একটা আলোর ঝলক। একটা মস্ত অশ্বত্থ গাছ নিমেষে মাঝ বরাবর দু-টুকরো হয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়তে প্রায় চাপা পড়ছিলেন কালিপদ।

রামু সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাতে তার গুলতি। এক চোখ বুজিয়ে টিপ করল নিম্বোর লালপাথরে।

হলধর সেজকাকে দেখিয়ে তারাপদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছোকরার কাঁধের ওপর ওটা কী বলো তো হে?'

কালিপদ দু-হাত মুঠো করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে আছেন রামুর দিকে।

নিম্বোর হাত থেকে আবার একটা সাপের মতন আঁকাবাঁকা আলোর ঝলক। রামুর হাত থেকে গুলতিটা ঠিকরে পড়ে গেল। নিম্বো শূন্যে ভেসে থাকা নীলপাথরের দিকে এগিয়ে আসছে। রামু হাত বাড়িয়ে পাথরটা ধরতে গিয়ে

দেখল তার হাতটা কিছুতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। সামনে কিছু রয়েছে, অদৃশ্য।

ভুনুচবুড়ো ফিসফিস করে উঠল, 'একটা শক্তিপরিধি। ভেতরে ঢোকা যাবে না। আমরা সবাই এর বাইরে। পাথরটা হাতাবে বলে নিম্বো এটা তৈরি করল।'

নীলপাথরটার সামনে এসে নিম্বো তার হাতের লাল পাথরটা বুকের মধ্যে কৌটোর ঢাকনির মতো ফোকরে ঢুকিয়ে দিল। ধ্বক করে জ্বলে উঠল চোখ দুটো। তারপর খপ্ করে চেপে ধরল নীলপাথরটা।

'ব্যাস, সব শেষ। নীলপাথরটাও এখুনি ওখানেই যাবে।' ভুনুচবুড়ো ফুঁপিয়ে উঠল।

সেজকা দাঁতের ফাঁক চেপে কেটে কেটে বলল, 'তা বোধহয় নয়।'

নিম্বো নীলপাথরটা মুঠো করে কিছুক্ষণ চেপে থাকার পর একটু একটু করে কাঁপতে লাগল। হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে নীল আলো। তীব্র কর্কশ আর্তনাদ করে নিম্বো পাথরটা মুঠো থেকে ছেড়ে দিল। সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। নীলপাথর থেকে দুটো-চারটে-আটটা অজস্র আলোর জাল আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে নিম্বোকে। খটাং। সজোরে একটা আওয়াজ। নিম্বোর মস্ত শরীরটা দড়াম্ করে চিত হয়ে পড়ে গেল।

ভুনুচবুড়ো সেজকাকে বলল, 'কী হল?'

সেজকা একটু থেমে বলল, 'গুলতি।'

রামু ভূত দেখার মতো তার ডাইনে দশ গজ দূরে যে-দিকে তাকিয়ে আছে, সেখানে হাতে গুলতি নিয়ে নিম্বোর দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন শশধর। রামুর দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বললেন, 'বাড়ি গিয়ে পড়তে বসো। খেল খতম্।'

কালিপদর বিগড়ে দেওয়া মহাকাশযানে নীলপাথরটা ভাসিয়ে দেওয়া মাত্রই আলোর কাটাকুটি দিয়ে শুরু করে বেয়াড়া বেঢপ যন্ত্রপাতিগুলো আবার যে-যার কাজে লেগে গেল। নিম্বোর শরীরটা বসিয়ে রাখা হল একটা চৌবাচ্চার মতন জিনিসের ওপর। ভুনুচবুড়ো দাড়িতে হাত বুলিয়ে রামুকে বলল, 'এবার আমায় যেতে হবে রামু।'

রামু সেজকার দিকে চাইল। সেজকা রামুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। বলল, 'নিম্বোর কী হবে?'

ভুনুচবুড়ো ভারি সুন্দর করে হাসল, 'লালপাথর শেষ, নিম্বো একজন ভালো ফুলুট হয়ে যাবে। আরসাইনে আবার নতুন করে সবকিছু ভালো হয়ে যাবে।'

সেজকা নীলপাথরটা ভুনুচবুড়োর হাতে দিল।

'এটা আপনি নিয়ে যান। আরসাইনে হয়তো আবার কোনওদিন এর দরকার হবে।'

'কিন্তু এতো আমি রামুকে দিয়েছি।'

'আপনি যা রামুকে দিয়েছেন তা রামুর কাছেই রইল। আরসাইনের সমস্ত শুভশক্তি রামুর কাছেই রইল। এ-পাথর বাতাসপুরের, এটা রামু আপনাকে দিল।'

ভুনুচবুড়ো আর নিম্বোকে নিয়ে আকাশযান যখন মাটি ছেড়ে হাউই হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল তখন জটাধর নিজের মাদুরে শুয়ে অশ্বত্থ গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আছেন নাকি খুড়ো?'

সাড়া এল, 'আছি রে বাপ, আছি। মাথার ওপর চেয়ে দেখ, গোল থালার মতন চাঁদ উঠেছে। আহা, এমন রাতে একখানা মনমাতানো সুর ভাসিয়ে দে দেখি, প্যাখনা মেলে চাঁদের দিকে উড়ে যাক।'

—সমাপ্ত—

ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

খুলিগুহা

রাজেশ বসু

হার্ক কাউফম্যান দশাসই আকৃতির মানুষ। প্রায় দু-মিটার লম্বা। চওড়াতেও প্রায় তাই। অন্তত আমার সে-রকমই মনে হয়। স্বভাবতই ওজনও তেমন। পাক্কা দু-শো বিশ পাউন্ড। মানে প্রায় একশ কেজি আর কী! এহেন মাপের মানুষকে সম্ভ্রম না করে গতি নেই।

বনসু তাই কুঁইকুঁই করে বলল, 'স্যার, কাজটা মনে হয় আপনি ঠিক করেননি। খুলিগুহার পিছনটা ভালো না। আমরা এড়িয়ে চলি।'

'কেন রে ব্যাটা, ঘাড়ে ভূত চাপবে বলে? নাকি অরণ্যদেব বেরিয়ে এসে গালে বিরাশি-সিক্কার মুষ্টিযোগ কষাবে?' তাচ্ছিল্য করে বলল কাউফম্যান। হেসে উঠল জোরে। আফ্রিকার সিংহের মতোই বিশাল মুখ। দাড়িগোঁফে ভরতি। হাসির দমকে শনের মতো দাড়ির জঙ্গলে ঢেউ খেলে উঠল।

বনসু আর কিছু বলল না। খাবার কখন দেবে জিজ্ঞেস করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাওয়ার সময় চকিতে একবার চাইল আমার দিকে। দৃষ্টিতে বুঝলাম আমার প্রতি আস্থা আছে তার। লালমুখো সাহেবকে আমি যেন বিষয়টা বোঝাই।

কাউফম্যান বেশ ধূর্ত। আমি মুখ খোলার আগেই বলল, 'এইসব আফ্রিকানগুলোকে সভ্য করা গেল না আর। মগজের মধ্যে রাজ্যের কু-সংস্কার ঠেসে রেখেছে।'

আমি ঠিক কার পক্ষ নেব বুঝতে পারছিলাম না। শুকনো হাসি হেসে বললাম, 'তবে ও এখানকার স্থানীয় লোক। ও যখন বলছে—'

কাউফম্যান বেশ চটে গেল, 'ও বলছে মানে? তুমিও দেখছি ওর মতো কুসংস্কারে বুঁদ হয়ে আছ। কত বড়ো আবিষ্কার জানো? আইডিয়া কিছু আছে তোমার? এই নলেজ নিয়ে তুমি পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ, ট্রাভেলগ লিখছ! শেম ম্যান, শেম!'

আমি চুপ করে গেলাম। বাস্তবিকই কিছু চিন্তাভাবনা না করে বনসুকে সমর্থন করা উচিত হয়নি। আফ্রিকায় এই সব অঞ্চলে হাজারো রকম সংস্কার আছে। প্রকৃতি প্রতিকূল বলে আদিম দেশজ মানুষদের নানারকম তুকতাক আর কাল্পনিক বিধিনিষেধের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করতে হয়। খুলিগুহার পিছনটা পাথুরে জঙ্গল আর আগাছায় ভরতি। হয়তো বিষাক্ত গাছড়া বা শ্বাপদে অধ্যুষিত জায়গাটা। বনসু তাই যেতে বারণ করছিল। কাউফম্যান শোনেনি। শুনবেই বা কেন, পেশায় জীবাশ্মবিদ সে। পাহাড় জঙ্গল ঘুরে ঘুরে ফসিল খুঁজে বেড়ানোই তার কাজ। সত্যি বলতে আমি সাধারণ একজন লেখক। তা-ও গল্প, কবিতা বা উপন্যাস লিখি না। একটি বিদেশি পত্রিকায় ভ্রমণসাংবাদিক হিসেবে কাজ করি। পড়াশোনাটা একটু করেছিলাম। ইংরেজিটাও ভালো জানি। চাকরিটা তাই হয়ে গিয়েছিল। এখন পত্রিকার বদান্যতাতেই দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াই। এবার যেমন এসেছি পূর্ব আফ্রিকার এই দেশ ইথিওপিয়ায়। রাস দাসেন পাহাড় দেখব। এখানকার ভূপ্রকৃতি তো বটেই, এখানকার মানুষজন আর পশুপাখিও দেখব। বিরল সিমিয়ান শিয়াল, জিলেদা বেবুন, ওয়ালিয়া আইবেকস-এর মতো জানোয়ার ছাড়াও লামারজেয়ার নামে বিরল প্রজাতির একরকম শকুন দেখা যায় এখানে। এ ছাড়া কলোবাস বাঁদর, হায়েনা, লেপার্ড, বুনোশুয়োর, সিংহ তো আছেই। পাখিও আছে প্রায় আটশো প্রজাতির।

কাউফম্যানের সঙ্গে আলাপটাও হয় এই পাখি দেখার

সময়। সেটা অবশ্য তিনদিন আগে। বুধবার। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে তখন। পশ্চিম আকাশ টকটকে লাল। সারাদিন এলোমেলো ঘুরে ক্লান্ত খুব। বিশাল একটা টিলার নীচে জুনিপারের ছায়ায় বসে একটু জিরোচ্ছি, এমনসময় কর্কশ স্বরের আওয়াজটা পেলাম। সন্ধানী চোখ মুহূর্তে খুঁজে নিল পাখিটাকে। এক নজরেই বুঝলাম লামারজিয়ার। ঠোঁটের নীচে দাড়ির মতো একগুচ্ছ লোম দেখে সহজেই চিনে ফেলা যায় এদের। টিলার মাথায় একটা চোঙাকৃতি পাথরের উপরে বসেছিল লামারজিয়ারটা। ক্যামেরা তাক করে সবে একটা ফটো নিয়েছি, পাখিটা যেন টের পেয়ে গেল। বিশাল ডানাদুটো প্রায় আট-ন-ফিট বিস্তার করে চট করে উড়ে পালাল। অপসৃয়মান পক্ষিটির-ই ফোটোটা তাড়াতাড়ি নিতে গিয়ে আমি প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়েছিলাম। পায়ের নীচে আলগা নুড়ি ছিল কতকগুলো। পড়লাম না এবং দামি ক্যামেরাটিও রক্ষা পেল, তার কারণ এই বিশালবপু মানুষটি। হার্ক কাউফম্যান। আচমকা কোত্থেকে উদয় হয়ে তিনি গোরিলার মতো বিশাল হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন আমাকে। এমন নিঃশব্দ পদক্ষেপে এসেছিলেন টের-ই পাইনি।

যা হোক, আলাপ হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমারই মতো একলা ঘুরছেন। জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময়ে পড়াতেন নাকি। এখন কেবল গবেষণা, আর ফসিল অন্বেষণ। বানর এবং আধুনিক মানুষের অন্তবর্তী একটি প্রাণী ছিল, যা বিজ্ঞানীরা নাকি এখনও সঠিকভাবে খুঁজে পাননি। কাউফম্যান এই 'মিসিং লিঙ্ক' টিকেই অন্বেষণ করছেন। বললেন, ইতিমধ্যেই কেনিয়ার জঙ্গলে তিনি ইগুয়ানাডনের ফসিল আবিষ্কার করেছেন। ইগুয়ানাডনের নামটা জানি। ডাইনোসরগোত্রীয় জীব। যদিও মাংসাশী নয়, শাকাহারী। মেসোজোয়িক যুগে দেখা যেত এদের।

ভদ্রলোকের ধারণা এ তল্লাটেই আছে সেই জীবাশ্ম। লম্বা ছুটি নিয়ে গত তিনমাস ধরে নাকি পূর্ব আফ্রিকা চষে বেরোচ্ছেন। আমিও একলা জেনে বলতে গেলে ঝুলেই পড়লেন আমার সঙ্গে। এতে অবশ্য আমারও লাভ হল। এ অঞ্চলে জিনিসপত্রের ভীষণ দাম। দূরে যেতে হলে গাড়ি এবং গাইড নিতে হয়। দুটোই বেশ মহার্ঘ। আর একজন সঙ্গী থাকলে খরচটা অর্ধেকে নেমে আসে। সুতরাং আমার তরফ থেকে আপত্তির কারণ ছিল না। তাছাড়া কাউফম্যানের পেশা বা নেশার প্রতি যথেষ্টই কৌতূহল বোধ করছিলাম। ষাটের উপর বয়স। আমার মতোই অকৃতদার। কড়া তামাক সহজোগে চুরুটসেবন ছাড়া অন্য কোনওরকম গোলমেলে নেশাটেশাও নেই। বন্ধুই বনে গেলাম একপ্রকার।

দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ রাস দাসেন দেখে গত পরশুই এসে পৌঁছেছি হারেনা বনভূমির এই রুম্বেক গ্রামে। উঠেছি বনদপ্তরের কর্মীদের থাকার জন্য অস্থায়ী একটি বিদ্যুৎবিহীন লগহাউজে। বাঁশের বাড়ি। মাথায় খড়ের চাল। হাউজ বললেও দুটিমাত্র ঘর। একটি একটু বড়ো। তাতে আমি আর কাউফম্যান রয়েছি। দু-হাতের তফাত রেখে নেয়ারের দুটো খাট। একটিতে আমি শুচ্ছি। অন্যটিতে কাউফম্যান। পাশের ছোটো ঘরটি মূলত কিচেন। বনসু সেখানেই একটা ম্যাট্রেস পেতে শুচ্ছে। বনসু হল আমাদের জিপের চালক। গাইডও বটে। স্থানীয় ছেলে। বছর পঁচিশেক বয়স। বেশ হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। ইংরেজিটাও মোটামুটি জানে। এমনকী রান্নাও। রান্নাবাড়ার কিছু সরঞ্জাম আনা হয়েছে গাড়িতে। সকাল-বিকেল-রাত্রি আমাদের পেটের রসদেরও জোগান দিয়ে চলেছে সে। দারুণ কর্মঠ। এপ্রিল মাস এ তল্লাটে বর্ষা বলে ট্যুরিস্ট প্রায় নেই বললেই চলে। বনকর্মীদের মধ্যেও যেন একটু ঢিলেমির ভাব। আমাদের ভাগ্য ভালো বনসু কোফির মতো করিতকর্মা ছেলে পেয়ে গিয়েছি।

যাই হোক, যে-খুলিগুহার কথা বলছি, সেটা মূলত কাউফম্যানের জন্যই আসা। গতকাল দুপুর নাগাদ খুঁজে পাই গুহাটা আমরা। মালভূমি-অধ্যুষিত অসমান এবড়ো-খেবড়ো পথ। গাড়ি চলার প্রশ্নই নেই। পায়ে হেঁটে ঢুকেছিলাম। লগহাইজ থেকে মাইল দুয়েক হেঁটে অনেকগুলি চুনাপাথরের গুহার একদম শেষে ছিল গুহাটা। লি ফকের ফ্যানটম বা অরণ্যদেবের কমিক্‌সে যেমন খুলিগুহার ছবি আঁকা আছে, অনেকটা সে-রকমই। তবে প্রবেশপথটা বেশ নীচু। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়েছিল। তবে ভিতরটা বেশ প্রশস্ত। কাছাকাছি জলের কোনও উৎস আছে। ফলে গুহার মেঝেতে স্ট্যালাগটাইট আর স্ট্যালাগমাইটের স্তম্ভ গজিয়ে নানারকম আকার-অবয়বের সৃষ্টি হয়েছে। বনসু প্রথম থেকেই খুঁতখুঁত করছিল। জায়গাটা নাকি নিষিদ্ধ। অপদেবতাদের বাস। শুনে সে কী হাসি কাউফম্যানের! ভয় করছিল হাসির কম্পনে আলগা পাথর-টাথর না খসে পড়ে মাথার উপর। আমার কিন্তু ভালোই লাগছিল। কেভহান্টিংয়ের মজা পাচ্ছিলাম।

আঁকাবাঁকা কিছুটা চলতে আলো দেখা দিল। অর্থাৎ গুহাটার আরও একটা মুখ আছে। বেরিয়ে এসে দেখি

অনতিদূরে তিরতির করে একটা ক্ষীণ নালা বয়ে চলেছে। কিছুটা তফাতে দেখি গ্রানাইট পাথরের বড়ো বড়ো খণ্ড দিয়ে গোল করে গণ্ডির মতো করে রাখা একটি জায়গা। ব্যাস অন্তত পঞ্চাশ গজ তো হবেই। দেখলাম কাউফম্যান বেশ উত্তেজিত। নিঃশ্বাস ফেলছিল জোরে জোরে। নিজের মাতৃভাষায় কীসব বলল। জার্মান আমি অল্পস্বল্প জানি। তাতে বুঝলাম, পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছে সে। প্রায় দৌড়ে যন্ত্রপাতির ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে পাথর ঘেরা জায়গাটায় ঢুকে পড়ল সে।

'কী করছেন স্যার! কী করছেন!' বলে বনসুও পিছু নিয়েছিল। কিন্তু শোনে কে!

এখানে আমার মতামত দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কারণ হঠাৎই একজোড়া কালো ডানার লাভবার্ড দেখে পিছু নিয়েছিলাম আমি। বলা বাহুল্য বনসুর নিষেধ শোনেনি কাউফম্যান। যন্ত্রপাতি নামিয়ে টানা তিন ঘন্টার চেষ্টায় অবশেষে সফল হয় সে। একলাই খুঁড়ে নিয়ে আসে খুলিটা। তবে আপাতত খুলিটাই নিয়ে এসেছে সে। বাকি হাড়গোড়েরও সন্ধান পেয়েছে। সেগুলি কোনও কারণে খুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়ে ইতস্তত ছড়ানো ছিল। সেগুলি উদ্ধার হবে আগামীকাল। এখন রাত ঠিক আটটা। লগহাউজে ফেরা ইস্তক খুলিটাকে নিয়ে পড়ে আছে সে।

'আফ্রিকার গ্রেট-এপের বিবর্তনেই যে এখনকার মানবকূল, এ বিয়য়ে তুমি কী মনে করো?' হঠাৎ বলে উঠল কাউফম্যান। ঘরে একটি কাঠের তেকোণা পড়ার টেবিল। তার পাশে একটি কাঠের চেয়ারে বসেছে সে। টেবিলের উপরে সেই মানুষের করোটিটা। সেটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়েছে সে।

'কেন তোমার কি অন্য কিছু মনে হয়?' খাটের উপরে আধশোয়া হয়ে ক্যামেরায় আজকের তোলা ফোটোগুলো দেখছিলাম আমি। প্রশ্নটা করলাম আলগাভাবে।

'অবশ্যই।' খুব জোর গলায় বলল কাউফম্যান। টেবিলের থেকে খুলিটা উঠিয়ে সোজা এগিয়ে এল আমার দিকে 'ভালো করে দ্যাখো, অ্যাম্বার। মানব করোটি। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু অন্যরকম না?'

এসব ফসিলটসিলের ব্যাপার আমি ঠিক বুঝি না। তার উপর কোনকালে কে মারা গিয়েছিল, সেই মৃত মানুষের করোটি। আমার ঠিক ভালো লাগছিল না সেটা দেখতে। ঘরে আলোও কম। লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে বনসু। সে এখন পাশের ঘরে। রাতের খাবারের আয়োজনে ব্যস্ত।

'কী হল, ভালো করে দ্যাখো।' তাড়া দিল কাউফম্যান। খুলিটা আমার মুখের সামনে তুলে ধরেছে। অস্বস্তি হলেও দেখতে হল। প্রমাণ সাইজের মানুষের খুলিই। কিন্তু প্রাচীনতার জন্য ধারগুলো ক্ষয়ে গিয়ে আকারটা একটু ছোটোই লাগছে। তবে একটা জিনিস কিন্তু বেশ অদ্ভুত। চোয়ালটা বেশ লম্বাটে। কুকুর বা হায়েনা বা নেকড়ের চোয়াল যেন।

'বুঝতে পারছ কিছু?' উত্তেজিত গলায় বলল কাউফম্যান।

বললাম যা মনে হচ্ছিল। কাউফম্যানের ঠোঁটের কোনায় হাসির রেখা দেখা দিল। খুলিটা নিয়ে ফিরে গেল টেবিলে।

তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'গতবছর পিটার ক্লাউজ নামে আমার একজন ছাত্র অদ্ভুত একটা জিনিস নিয়ে হাজির হয় আমার কাছে। হাতে লেখা একটা ডায়েরি। ঝুরঝুরে সব পাতা। লেখাগুলোও অস্পষ্ট। সেটা নাকি তার এক দূর সম্পর্কের দাদু রুডলফ হেনরিখ ক্লাউজের স্বহস্তে লেখা। তিনিও প্রত্নতত্ত্ববিদ ছিলেন। প্রাণীবিদ্যাতেও পণ্ডিত ছিলেন। নতুন-নতুন ফসিলের খোঁজে দেশ-বিদেশ চষে বেড়িয়েছেন। ইরিট্রিয়া, ইথিওপিয়া, সুদান —এসব দেশেও ঘুরে বেরিয়েছিলেন নাকি। ঘটনা হল, এই ইথিওপিয়াতেই অভিযানের সময়ে কী কারণে হঠাৎ মাথার ব্যামো দেখা দেয় তাঁর। দেশে ফিরে আসেন। ডায়েরিটা অবশ্য তার কিছু আগেই লেখা। কীভাবে যেন লোকচক্ষুর আড়ালে পড়েছিল এতদিন।'

একটু থামল কাউফম্যান। চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে নিল। তারপর কাঠের গরাদ দেওয়া জানালার বাইরে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। আজ পূর্ণিমা। বিশাল বড়ো ঝকঝকে চাঁদ উঠেছে আকাশে। জুনিপার পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফুটফুটে জোৎস্না। সেদিকে তাকিয়ে আবার শুরু করল সে, 'যা বলছিলাম, বেশির ভাগ পৃষ্ঠাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পড়ার উপযুক্ত নয়। মোটামুটি মাত্র আটটি পাতা কোনওমতে স্ক্যান করে পুনরুদ্ধার করি আমি। কী বলব, পড়ে তো চক্ষু চড়কগাছ। অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতার কথা লিখেছে পিটারের দাদু। সত্যি মিথ্যে জানি না, তবে মানুষের পূর্বপুরুষ যে কেবল গোরিলা বা বানর নয়, বরং অন্য কোনও হিংস্র শ্বাপদ, সে বিষয়ে কিছু প্রামাণ্য তথ্য দিয়েছে সে।'

'কীরকম প্রামাণ্য তথ্য?' জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

'সাংঘাতিক। নিজে চোখে সরেজমিনে দেখা সব তথ্য।' লাফিয়ে উঠে বলল কাউফম্যান, 'পিটার বিশ্বাস করেনি। আমি জানি, অ্যাম্বার, তুমিও করছ না। কিন্তু প্রমাণ তো আমার হাতের মুঠের মধ্যেই।' টেবিলে রাখা অদ্ভুতদর্শন খুলিটাকে ইঙ্গিত করল সে।

অ্যাম্বার মানে আমি অম্বর মিত্র কিছু বলতে যাচ্ছি, এমন সময় পাশের ঘর থেকে বনসু এসে বলল, 'ডিনার রেডি স্যার। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়াই ভালো।' দেখলাম আমার মতোই তার চোখে বেশ অস্বস্তি। খুলিটার উপস্থিতি সে তো মেনেই নেয়নি।

কাউফম্যান চুরুটটা নিবিয়ে দিয়ে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি! সবে সাড়ে-আটটা। এমন সুন্দর চাঁদনি রাত। না শুলেও তো হয়। বরং চলো, জঙ্গল থেকে ঘুরে আসি এক চক্কর। গ্যাজেল-ট্যাজেল কিছু পেলে মেরে আনাও যাবে। টাটকা মাংসের স্বাদই আলাদা।'

এ-আবার কেমনতর কথা! তাছাড়া কেবল কথাই নয়, ইচ্ছেটা জানিয়ে সুরুত করে জিভের জল টেনেছে কাউফম্যান। বুঝলাম সারাদিন রোদে রোদে মাথাটি গিয়েছে মানুষটির। যতই ক্ষমতা থাকুক, বয়সটা তো ষাটের উপর। বনসু দেখি আমার পাশে সরে এসেছে একেবারে, ফিসফিস করে বলল, 'স্যার, তখনি বলেছিলাম খুলিটা সঙ্গে না-নিয়ে আসতে।'

খুলিটার কথা একটুক্ষণের জন্যে ভুলে গিয়েছিলাম। বনসুর কথায় একবার তাকালাম সেটার দিকে। টেবিলের উপরে চোয়াল খুলে ঠায় তাকিয়ে আছে সেটা আমাদের দিকে। লণ্ঠনের আলোয় দেখতে সত্যিই কেমন একটা লাগছে। বাঁশের দেওয়ালে ঢেউ-খেলানো ছায়াটাও কেমন বিচ্ছিরি। চোখ সরিয়ে বনসুকে বললাম খাবার রেডি করতে।

মেনু অতি সাধারণ। খিচুড়ি আর ডিমভাজা। নিখাদ ভারতীয় এই পদটি আমিই শিখিয়ে দিয়েছি বনসুকে। ঝালটাল দিয়ে বনসু করেছেও বেশ ভালো। অন্তত আমার আর বনসুর তো ভালোই লাগছে। কিন্তু কাউফম্যানের কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। ভারতীয় এই খাদ্যটি তার নিজেরও বেশ পছন্দের। বিকেলে সে নিজেই এটা করতে বলেছিল বনসুকে। কিন্তু এখন দেখলাম, খেলই না একদম। ওমলেটটা খেল অবশ্য। নিজেরটা খেয়ে আমারটার দিকে চাইছিল। বললাম, 'খেতে পারো। মেনকোর্সটা তো খেলেই না

একদম।' সে অবশ্য খেল না। বরং স্টকে হাফডজন কাঁচা ডিম ছিল, সেগুলো ফাটিয়ে খেয়ে ফেলল পরপর। আমি আর বনসু তো হাঁ। এই বয়সে এত ডিম সহ্য করতে পারলে হয়!

আমরা দুজনে মিলেই বারণ করলাম, কিন্তু শুনলে তো, উলটে বলল, 'জানো তো, আফটার ডিনার ওয়াক আ মাইল। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। আবার টাটকা মাংসের কথা বলবে নাকি!

যা হোক, সেরকম কিছু বলল না। চেয়ার থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলো, শুয়ে পড়ি। ঘুম পাচ্ছে।'

সেটাই ভালো। হাতমুখ ধুয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। এপ্রিল হলেও রাতের দিকে একটু ঠান্ডাই থাকে এখানে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। একটানা খচরমচর আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ। ঘরে মৃদু করে লণ্ঠন জ্বালানো আছে। তাই মাথার পিছনের দুটো জানালাই খুলে রাখা হয়েছে। সেখান থেকেও চাঁদের আলো এসে পড়েছে আবছা। তাতে দেখছি বিছানার নীচে কাঠের মেঝের উপরে কেমন জন্তুর মতো বসে রয়েছে কাউফম্যান। হাতে সেই খুলিটা। গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটার দিকে চেয়ে রয়েছে সে। সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপার, মাঝে-মধ্যে সেটার উপর নিজের জিভ বোলাচ্ছে খরখর করে। মানুষের জিভে কি এমন আওয়াজ হয়! কী বলব, আমার মেরুদণ্ড বেয়ে আস্ত একটি হিমবাহ নামতে শুরু করল।

কেবল তা-ই নয়, এবার দেখছি, জন্তুর মতোই ডান-পা-টা দিয়ে সে নিজের কোমরের পাশটা চুলকোতে শুরু করল খচখচ করে। তারপর খুলিটা নিজের বিছানার উপরে রেখে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল চারপায়ে। হামাগুড়ি দিয়ে। জানোয়ারের মতো!

আমি স্তম্ভিত! বিস্ময়ে পুরো পাথর হয়ে গিয়েছি। কাউফম্যান কি তবে জন্তু হয়ে গেল! কী অসম্ভব ব্যাপার! হঠাৎ মনে হল, ওই খুলিটাই এসব অনাসৃষ্টির মূলে নেই তো? যদিও পরক্ষণেই ভাবলাম, তা কী করে হয়, বনসুর মুখে খুলিটার একটা অবিশ্বাস্য কাহিনি আমি শুনেছি বটে। অবিশ্বাস্য ভূতুড়ে কাহিনি। খুলিটা নাকি শাপগ্রস্ত! ভয়ংকর! কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে এসবে বিশ্বাস করা যায়? গপ্পো উপন্যাসে এমন সব হতে পারে। রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর 'মার্ক অফ দ্য বিস্ট' কিংবা আমাদের সত্যজিৎ রায়ের 'খগম' গল্পে এমন সব অতি-অলৌকিক ঘটনার নিদর্শন আছে। কিন্তু সে সব গপ্পোকথা। এবং গল্প গল্পই। আমার মনে হল, হয় রীতিমতো শরীর খারাপ হয়েছে কাউফম্যানের, নয়তো একটানা শারীরিক এবং মানসিক ধকল নিতে নিতে রুডলফ ক্লাউজের মতো হয়তো নিজের মাথাটিও বিগড়াতে শুরু করেছে। অবিলম্বে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন।

ভাবছি উঠে পড়ে মানুষটিকে সজ্ঞানে ফিরিয়ে আনি, এমন সময় সাংঘাতিক একটা কাণ্ড ঘটে গেল। পাশের ঘরে বনসুও হয়তো জেগে গিয়েছিল। কী কারণে এ-ঘরে এসে ঢুকেছিল সে। কাউফম্যানকে ওই অবস্থায় দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল আতঙ্কে। এবং সেটা শোনামাত্র কাউফম্যান মস্ত একটা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বনসুর উপর।

বনসু শক্তপোক্ত হলেও কাউফম্যানের বিশাল দেহের ওজন সামলাতে পারল না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কাঠের মেঝের উপর। আমিও ততক্ষণে নেমে পড়েছি বিছানা ছেড়ে। আর কাউফম্যান? হিংস্র কোনও জানোয়ারের মতো বনসুর ঘাড়ের কাছটা কামড়ে ধরেছে সে। প্রাণপণ চিৎকার করছে বনসু। ক্ষীণ আলোতেও বুঝতে পারছি কাউফম্যানের দাঁত বিঁধে রক্তের ধারা নেমে এসেছে। সবুজ গেঞ্জি ভিজে যাচ্ছে রক্তে।

কী সাংঘাতিক অবস্থা! শরীরে যত শক্তি আছে সব প্রয়োগ করেও ছাড়াতে পারছি না কাউফম্যানকে। তার উপর কী ভর করেছে কে জানে! শেষে টেবিলের উপর থেকে সেই খুলিটা তুলে নিয়েই সজোরে আঘাত করলাম তার মাথায়। এবার কাজ হল। একটা আঁক শব্দ করে স্থির হয়ে গেল সে। হাত-পা আর মুখের কামড় শিথিল হয়ে গেল ধীরে ধীরে। খুলিটাও তিন টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল চারিদিকে। সেই মুহূর্তে বীভৎস চিৎকারে ভেসে এল ঠিক জানলার ওপাশ থেকে। চকিতে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে হৃৎপিণ্ডের গতিটাই যেন থমকে গেল আমার। একটি মানুষ দাঁড়িয়ে জানালায়। কিন্তু তার মুখটি মোটেও মানুষের নয়, চাঁদের আলোতে পরিষ্কার দেখলাম শ্বদন্তশানিত একটি হিংস্র জানোয়ারের মুখ। সম্ভবত নেকড়ের!

'খুলিটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিন স্যার। ওয়্যারউলফের অভিশপ্ত খুলি ওটা, আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম।' ওই অবস্থাতেই চেঁচিয়ে বলে উঠল বনসু।

কিন্তু ফেলব কী! ঘটনাপ্রবাহ এমন বিস্ময়ে, আতঙ্কে, শরীরের সব জোর হারিয়ে ফেলেছি একদম। তবে ধন্য সাহস এবং শক্তি বটে বনসুর। সেই অবস্থাতেই উঠে মেঝে থেকে খুলির টুকরোগুলো তুলে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর জানালাটা বন্ধ করে দিল ভালো করে। কাউফম্যান তখনও অজ্ঞান। আমি তখনও বসে আছি কিংকতর্ব্যবিমূঢ়। হয়তো বা জ্ঞানই হারিয়েছিলাম।

সংবিৎ ফিরতে দেখি চারিদিকে সকালের রোদ ঝলমল করছে। রাতের বিভীষিকার চিহ্নমাত্র নেই। শুয়ে আছি বিছানায়। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। বনসু আমার পায়ের কাছেই একটি চেয়ারে বসেছিল। আমি উঠে বসাতে দেশীয় ভাষায় কিছু বলে হাঁক দিল সে। একজন মাঝবয়সি আফ্রিকান ঘরে এসে ঢুকলেন। গলায় স্টেথো আর হাতে রক্তচাপ মাপার যন্ত্র দেখে বুঝতে পারছি ভদ্রলোক চিকিৎসক।

যা হোক, আসল কথা হল, কাউফম্যানকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। ডাক্তার ভদ্রলোক আমাকে প্রাথমিক পরীক্ষার পর ফিট ঘোষণা করলে বনসুকে জিজ্ঞেস করলাম কাউফম্যানের কথা। বনসু একটু শুকনো হাসল। কাঁধে তার ব্যান্ডেজ। সে যা শোনাল বিশ্বাস না করে উপায় নেই, কারণ গতকাল যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে অসম্ভব পদবাচ্য বলে হয়তো এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নেই।

প্রথম কথা হল, কাউফম্যানকে ইতিমধ্যেই শহরের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বনসু-ই ফোনে খবর দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে সব ব্যবস্থা করেছে। কাউফম্যান স্বাভাবিক হয়েছে বটে কিন্তু তার মাথায় বিস্তর গোলমাল দেখা দিয়েছে। গতকাল রাতের ঘটনা তো দূরের কথা, নিজেকেই সে চিনতে পারছে না একদম। মনে করাতে গেলে হিংস্র হয়ে উঠছে নাকি খালি।

যাই হোক, দ্বিতীয় এবং চরম অবিশ্বাস্য কথাটি হল ওই খুলিটি নাকি একটি নেকড়েমানুষ বা ইংরেজিতে যাকে বলে ওয়্যারউলফের। আজ থেকে অনেককাল আগে একদল সভ্য সাদাচামড়ার মানুষ এ অঞ্চলে পশুশিকারে এসেছিল। তাদের একজন নেকড়ের আক্রমণে প্রাণ হারায়। ঘটনা হল, সেই সভ্য মানুষগুলি তাদেরই একজন স্থানীয় দেশজ মোট বাহককে দোষী সাব্যস্ত করে। মানুষের ছদ্মবেশে সে নাকি আসলে একটি ওয়্যারউলফ। এমন সন্দেহের কারণ কী জানা যায়নি। তবে এটা শোনা যায় তার চোয়ালজোড়া নাকি স্বাভাবিক মানুষের চোয়ালের চেয়ে অনেকটাই অন্যরকম। সত্যি কী, কেউ জানে না সঠিক। তবে সভ্যমানুষগুলো যে প্রতিহিংসাস্বরূপ লোকটিকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলেছিল। কিন্তু চরম বিস্ময়ের ব্যাপার হল, সেই সভ্যমানুষগুলিও এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে একে-একে সকলেই মারা যায়। এবং প্রত্যেকেই হিংস্র কোনও জন্তুর কবলে পড়ে। শোনা যায়, সেই মোটরবাহকের অতৃপ্ত আত্মাই নাকি নেকড়েমানুষের রূপ পরিগ্রহণ করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছিল। সত্যি মিথ্যে সঠিক কেউ জানে না। লোককথাটাই চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে। প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে সেই মোটবাহকটি নাকি নেকড়েমানুষের রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়ায় এ তল্লাটে।

বনসুর মতে কাউফম্যান যে খুলিটি খুঁজে পেয়েছিল, ওটাই নাকি সেই মোটবাহকের করোটি। তথ্যটা বনসুর মতো স্থানীয় কয়েকজন-ই জানে মাত্র। বছর পঞ্চাশেক আগে আর এক জন সাহেব নাকি কাউফম্যানের মতো অভিশপ্ত অস্থিগুলি নিতে এসেছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা বারণ করলেও সে সাহেব শোনেননি। আশ্চর্যের বিষয় হল, সে সাহেবও শেষকালে পাগল হয়ে গিয়েছিল। বনসু তাই প্রথম থেকেই সাহেবকে নিষেধ করেছিল পাথরের গণ্ডির ভিতরে গিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি যেন না-করেন। বিষয়টা এমন প্রাচীন এবং প্রচলিত সত্যি যে স্থানীয় অধিবাসীরাই ওই পাথরের গণ্ডিটি করে রেখেছিল।

সব শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'খুলিটার কী হল? সেটা তো জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে তুমি?'

বনসু বলল, 'চিন্তা করবেন না স্যার। ওগুলো আবার যথাস্থানে ফিরে গেছে। যার জিনিস সে নিজেই নিয়ে গেছে। শুনেছি সেই সাহেবের সময়েও এমন হয়েছিল। কঙ্কালের হাড়গোড়গুলো নিয়ে এসেছিলেন ঠিকই। কিন্তু কোনও অলৌকিক উপায়ে আবার ফিরে গিয়েছিল স্বস্থানে।'

চরম অসম্ভব ঘটনা! তবু অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই এই মুহূর্তে। হঠাৎ একটা কথা মনে এল আমার। 'পঞ্চাশবছর আগে যে সাহেব এসেছিলেন, তার নামটা কী তুমি বলতে পারো?'

'সঠিক জানি না। আমার নিজেরই জন্মের কত আগের কথা...' আমতা আমতা করল বনসু।

ডাক্তার ভদ্রলোক বললেন, 'আমি জানি। সাহেবের নামটা ছিল রুডলফ ক্লাউজ!'

ছবি: সুদীপ্ত দত্ত

রেল লাইনের হাতি

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

খুব ভোরবেলা একদল হাতি উঠে আসে রেললাইনে
দ্রুত বেগে আসা থামে মেল ট্রেন, ভাবে এটা কোন আইনে।
হুইসেল ছাড়ে ব্যস্ত গলায়—
হাতি শুঁড় তুলে দাপট ফলায়—
আবছা কুয়াশা গায়েতে জড়িয়ে টিলার পাহাড় ডাইনে
হাতি বলে, মিছে কেন উৎপাত, আর কোথা যেতে চাইনে।

থমকে দাঁড়ানো খানদানি ট্রেন, ব্যাপার-স্যাপার ভিন্ন
চকচকে তার লম্বা শরীরে রাজকীয়তার চিহ্ন।
ইঞ্জিন ভাবে আরে ওটা কে রে
ধমকে ওদের যাবো নাকি তেড়ে
বুনো হাতি ভাবে, এ কোন চেহারা, স্বভাব অতি ঘৃণ্য
মুখোমুখি তারা, সরবে না কেউ, সংগ্রামে অবতীর্ণ।

বেলা বেড়ে যায়, কড়া হয় রোদ, প্রান্তর দ্যাখে দৃশ্য
ফসলবিহীন মাঠ পড়ে আছে, মনে হয় কত নিঃস্ব।
শনশন করে ছুটে আসে হাওয়া
ঝলসানো তাপ করে আসা-যাওয়া
বৃংহন তুলে ফিরে যায় হাতি, ট্রেন যেন অস্পৃশ্য
প্রকৃতির কোলে ছবি ধরে রাখে টিলা পাহাড়ের বিশ্ব।

মধুর হাসি

নারায়ণ আচার্য

জোড়াসাঁকোর রাস্তা ছেড়ে
একটু ক্লান্ত পায়ে
আবার যখন রবিঠাকুর
এলেন সবুজ গাঁয়ে,
আমরা সেদিন কেমন খুশি
বলছি তোমায় শোনো—
আগের থেকে আসব বলে
করেননি ভাই ফোন-ও!
কোথায় তাঁকে বসতে দেবো
খাবার দেবো কী যে
আমি তখন ফোরে পড়ি
বুঝি কি ছাই নিজে!
বসতে দিলাম ঠাকুরদাদার
মস্ত রঙিন পিঁড়ে
খেতে দিলাম মায়ের হাতের
শালিধানের চিঁড়ে।
বাতাস দিলাম তালপাখাতে
দিলাম মাদুর পেতে,
ভোরবেলাতে গেলাম নিয়ে
সোনার ধানের খেতে।
তখন তিনি ওঠেন গেয়ে
হেসে মধুর হাসি—
'সোনার বাংলা মাগো আমার
তোমায় ভালোবাসি।'

ছবি: রাহুল মজুমদার

ক্যাথারিন ম্যান্‌স্‌ফিল্ড-এর গল্প 'দ্য ডলস হাউস' অবলম্বনে

পুতুলের বাড়ি

রমেন গাঙ্গুলী

রুমনিপিসি হঠাৎই এসেছিল। আর তেমন কোনও বিশেষ কারণও ছিল না। না বলে-কয়ে এমনধারা আসায় সবাই খুব একটা খুশি হল বললে অপলাপ করা হবে। সবাই অর্থাৎ কিনা বড়োরা।

ছিল মাত্র তিন দিন দু-রাত্তির। তবে শুধু ছিল বললে কম বলা হবে। বলতে হয় হইহই করে ছিল। বড়োরা কে কী ভাবছে, সে - সবের তোয়াক্কা না করে রুমনিপিসি বাড়ির বাচ্চাদের মাতিয়ে রেখেছিল—গল্প বলে, নিত্যি নতুন খেলা শিখিয়ে। বাচ্চারা বলতে তিন বোন। শিখা, রেখা আর তিন্নি - বড়ো থেকে ছোটো।

ছিল যখন, বেশ ছিল শুধুমাত্র ছোটোদের কাছে। কিন্তু চলে গিয়ে সব্বাইকে, এমনকী বড়োদেরও, চমকে দেবার মতো একখানা কাজ করে ফেলল রুমনিপিসি। তিন বোনের নামে একটা বড়োসড়ো উপহার দিল পাঠিয়ে।

বিরাট একখানা পুতুলের বাড়ি!

বিরাট বলে বিরাট, কী নেই তাতে? জানলা দরজা শুধু আছে তা-ই নয়। তাদের দিব্যি খোলা যায়। আবার আঁটো করে বন্ধও করা যায়। ড্রইং রুম, ডাইনিং হল আছে, আছে বেডরুম, কিচেন-ও।

ড্রইং রুম-এ সোফা, সেটি, সেন্টার টেবিল—গদি, ঢাকা, ফুল সমেত ফুলদানি—সব আছে। বেড রুমে আছে কায়দা করে গুটিয়ে রাখা মশারি, খাটের ওপর তোশক, বালিশ বেডকভার যেমন হওয়া উচিত ঠিক ঠিক তেমনি। ঘরের মেঝেতে পুরু, লাল কার্পেট। আর দেয়ালে দেয়ালে ফ্রেমে-আঁটা দুর্দান্ত সব ছবি।

আছে কর্তা পুতুল, গিন্নি পুতুল। এমনকী দোলনা-খাটে শুয়ে আছে বাচ্চা পুতুলও।

সবাই সবকিছুরই তারিফ করছে। তিন্নির সায় আছে তাতে। বটেই তো চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো। কেবল একটা বিষয়ে সে অন্য সবাইকার চাইতে বেশি আত্মহারা। তা হল ড্রইংরুমের বিশাল ঝাড়লণ্ঠনখানা। কে বলবে, সত্যিকারের নয়? জ্বলে না, এই যা। তিন্নি যখন চোখ বুজে দেখে তখন সেটা দুম করে জ্বলেও ওঠে, ঝলমলিয়ে।

তিন বোন কলকলিয়ে উঠল, কালই ইস্কুলের বন্ধুদের বলে তাক লাগিয়ে দিতে হবে।

এমন কিছু যে হবে সে আশঙ্কায় বড়োরা বেশ চিন্তিতই হয়ে পড়েছিল।

ছোটোদের বন্ধুরা আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে, পুতুলের বাড়ি দেখবার নাম করে। লনের ঘাসের দফারফা হবে যে। ড্রইংরুমের দরজার দামি সিল্কের পরদা কি আর আস্ত থাকবে? সদ্য বদলানো, পুরু কাশ্মীরি কার্পেট? তারই বা কী দশা হবে।

ঠিক হল শিখা যেহেতু বড়ো, তাই তাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রতিক্ষেপে দুজনের বেশি বন্ধু আসবে না। লনের ঘাস, সিল্কের পরদা, কাশ্মীরি কার্পেট অক্ষত, অটুট আর অমলিন রাখার দিকে তিন বোনকেই সমবেতভাবে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বেশিক্ষণ যেন না থাকে। আসবে, দেখবে, চলে যাবে, ব্যাস্।

পরদিন প্রেয়ার লাইনে পাশে দাঁড়ানো লীনাকে ফিসফিস করে শিখা জানিয়ে দিল, টিফিন-টাইমে বন্ধুরা সবাই যেন খেলার মাঠের পাশে কদমগাছটার তলায় হাজির হয়। বিশেষ নিউজ বুলেটিন সকলের কর্ণগোচর হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রচারের জন্য ওদের গোপন ব্যবস্থা আছে। লীনাকে জানানো মানেই সবাইকার জানতে দেরিও হল না, কেউ বাদও পড়ল না।

কদমগাছের তলায় যথাসময়ে বন্ধুরা শিখাকে ঘিরে ফেলল। শিখার পাশেই আছে রেখা আর তিন্নি। ওরা লক্ষ্য রাখবে শিখার বলায় যেন কোনও ফাঁক না থাকে।

এই বন্ধুবলয়ের বাইরে অনতিদূরে, শুনতে পাওয়ার সীমার মধ্যেই কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে শুধু দু-জন। তারা দু-বোন। নান্নু আর মুন্নু।

এ প্রশ্ন উঠতেই পারে, ওরা সবাইকার সাথে মিলেমিশে একত্র নেই কেন, সহপাঠী হওয়া সত্ত্বেও। সে এক আলাদা গল্প। আলাদাই হোক আর যা-ই হোক, প্রাসঙ্গিক যখন, তখন যথাসাধ্য সংক্ষেপে সে-বৃত্তান্ত বিবৃত করতেই হয়।

নান্নু-মুন্নু বস্তিতে থাকে। মা শ্যামাদাসী বাড়ি বাড়ি ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে। একদিন ছিল যখন শিখা-লীনাদের সঙ্গে ওদের একই ইস্কুলে পড়ার জো ছিল না। এখন সরকার মাইনে দিয়ে ইস্কুলে পড়ার দায় তুলে দিয়েছে। তাই রামা-শ্যামাদের ছেলেমেয়েরা দিব্যি পড়ছে অতীনবাবু-যতীনবাবুর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একই ইস্কুলে।

তা পড়ছে, পড়ুক। শিখা-লীনাদের বাবা মায়ের কড়া নির্দেশ আছে ওদের সঙ্গে মাখামাখি, মেলামেশা না করার।

এই সাধারণ বারণ তো আছেই, তাছাড়াও বিশেষ কারণ আছে নান্নু-মুন্নুর বেলায়। ওদের বাবার কোনও পাত্তা নেই। কোথায় থাকে, কে জানে! রটনা আছে, একেবারেই জানা নেই এমন নয়, ওদের পিতৃদেব আছেন জেলে। ও হরি, জেল নয় এখন তো থাকে সংশোধনাগারে। নাম বদলালেই তো কাম বদলাচ্ছে না। চোর-জোচ্চোর-পকেটমার কি তাই বলে ভদ্র-সভ্যলোক হয়ে গেল?

তবু একটা সন্দেহ থেকেই যায়। পড়াশুনো শিখে নান্নু-মুন্নু তো নিজেদের হালচাল বদলে দিলেও দিতে পারে। না, সে সম্ভাবনা নেই। নিজের মুখেই ওরা স্বীকার করেছে, আর একটু বয়েস বাড়লেই বাবুদের বাড়ি কাজে লাগিয়ে দেবার কড়ারেই মা ইস্কুলে পড়তে অনুমতি দিয়েছে।

সঙ্গত কারণেই তাই নান্নু-মুন্নুকে দূরে দাঁড়িয়েই শুনতে হল, পুতুলবাড়ির নানা রহস্য, হরেক চমক।

পরবর্তীকালে ওরা আরও অনেক নতুন নতুন তথ্যও জানতে পারল। কেন না যারা স্বচক্ষে, সরেজমিনে দেখে এসেছে তারা তো আর বোবা-কালা নয়।

তবে ওই জানা পর্যন্তই। ওদের তো কেউ দেখতে যেতে ডাকছে না, ডাকবার কথাও নয়। নিজেদের মধ্যে দু-বোনের অনেক কথা হয়, মন্তব্যও হয়। শুনে শুনে মুখস্থও হয়ে গেছে কিনা। সেই কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি বা আমাদের ছোটো নদীর মতো। দেখেনি চর্মচক্ষে, তাই বলে কি অজানা?

তিন বোনের মধ্যে তিন্নি সবার ছোটো। ছোটো বলেই বোধবুদ্ধি কম। আর বুদ্ধি পাকেনি বলেই ওর আপশোস —

সবাই দেখতে পেল, নান্নু-মুন্নুর কী দোষ? ওরা দেখবে না কেন? ওদিকে বাড়ির সব্বাইকার মানা না-মেনে ওদের ডেকে আনাও যায় না।

একদিন হয়েছে কী, বাড়িসুদ্ধ সবাই গেছে বেশ দূরে কোথাও নেমন্তন্ন খেতে। আছে শুধু ওরা তিন বোন। আর আছে রাতদিনের দারোয়ান রামলাল— ও আর যাবে কোথায়? সামনেই টার্মিনাল পরীক্ষা। তাই এ ব্যবস্থা।

দুপুরবেলা। ভীষণ গরম। তার ওপর হয়ে গেল লোডশেডিং। অমলদা অবিশ্যি বলে, লোডশেডিং নয়, পাওয়ার কাট্। তিন্নি ভেবে পায় না লোডশেডিংয়ের বদলে পাওয়ার কাট্ হলে কি গরম কমবে, না আলো জ্বলবে! অমলদার সবতাতেই বাড়াবাড়ি!

সে যাই হোক, শিখা-রেখা এরই মধ্যেও দিব্যি ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে রামলাল আর তার বউও। কেবল তিন্নির চোখেই ঘুম নেই। এদিক সেদিক ঘুর ঘুর করতে করতে চলে এসেছে ড্রইংরুম পেরিয়ে, বাগানে; আর বাগানের লন পেরিয়ে বড়োরাস্তায় বেরোনোর গেটের সামনে।

হঠাৎ তিন্নি দেখতে পেল নান্নু-মুন্নুকে। বড়ো রাস্তা দিয়ে এদিকেই আসছে হাত ধরাধরি করে। এখন তো ওদের পুতুলের বাড়ি দেখতে ডাকাই যায়। কেউ তো আর দেখতে আসছে না। জানতেও পারবে না কেউ।

ঘরে ঢুকবে না। জানলা দিয়ে যতটা দেখা যায়। কতটুকু সময়ই বা লাগবে।

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। আর ওরাও যেন এরই অপেক্ষায় বসেছিল।

ইশারায় ডাকতে- না-ডাকতেই এসে হাজির। বলামাত্র বারান্দায় উঠে এসেছে। মাথাদুটো সেঁটিয়ে গিয়েছে জানলার গ্রিলের ফোঁকরে। বাইরে যা আলোর তেজ। ঘরের ভেতরের জিনিস স্পষ্ট করে দেখতে একটু ধাতস্থ হওয়ার সময় তো লাগবেই।

সময় আর পাওয়া গেল কই?

'এই পালা, ভাগ্। বলা নেই কওয়া নেই বাড়ির ভেতর ঢুকেছিস কোন সাহসে?' রূঢ় কণ্ঠস্বর দারোয়ান রামলালের।

গতিক সুবিধের নয় বুঝে তিন্নি উধাও।

নান্নু-মুন্নুও পালিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র দেরি করে না। ভালো করেই ওরা জানে তিন্নির দোহাইয়ে ওরা পার পাবে না। টুঁ-শব্দটি না-করে দৌড়তে শুরু করে।

দৌড়োতে থাকে গেটের বাইরে বড়ো রাস্তায় পড়েও। থামে সেই খালপাড়ে পৌঁছে। সেই যেখানে আদ্যিকাল থেকে আলিসান সব পাইপ পড়ে আছে, সেখানটায় এসে। মাঝেমধ্যেই যা করে তেমনিভাবে একটা পাইপের মধ্যে দু-জনায় চুপচাপ মুখোমুখি বসে হাঁফাতে থাকে। কী ভাবছে ওরা কে জানে।

খানিক বাদে দম ফিরে পেয়ে মুন্নু বলে ওঠে, 'হ্যাঁরে দিদি, তুই দেখেছিস?'

নান্নুর নিরাসক্ত জিজ্ঞাসা, 'কী?'

মুন্নুর আবেগকম্পিত গলায় ঘোষণা, 'আমি কিন্তু ঝাড়লণ্ঠনটা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি।'

আর কোনও কথা নেই। আবার চুপচাপ বসে থাকে ওরা, মুখোমুখি, যেমন ছিল।

ছবি: রাহুল মজুমদার

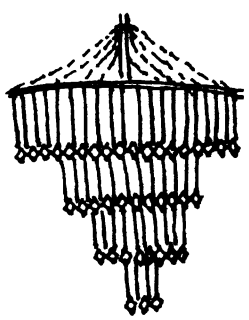

অরুণিমা রায়চৌধুরী

পাহাড়ের কোল-ঘেঁষা এক গ্রাম। সেই গ্রামে এক বিধবা মহিলা থাকত তার দুই মেয়ে নিয়ে। এক মেয়ে তার নিজের, নাম হেলেন। অন্যটি সৎমেয়ে। তার নাম মারোক্‌লা। সৎমেয়েকে সে একেবারেই দেখতে পারত না। নিজের মেয়েকে সে খুবই ভালোবাসত। কিন্তু মারোক্‌লা বেচারিকে তার সৎমা আর সৎবোনের অত্যাচার সারাক্ষণই সহ্য করতে হত।

এক শীতের সকালে হেলেন মারোক্‌লাকে বলল, 'এই, যা তো, পাহাড়ের ওপর উঠে যা। দৌড়ে যা আর কিছু ভায়োলেট ফুল নিয়ে আয়। টাটকা হয় যেন। আমার এই গাউনটাতে ভায়োলেট ফুলের গন্ধ মাখাতে হবে।'

'দিদি!' মারোক্‌লা ভয়ে ভয়ে বলল, 'জানুয়ারি মাসে ভায়োলেট ফুল কোথায় পাব?'

তার সৎমা ক্রূর কণ্ঠে ধমকে বলল, 'যা বলছি। কুঁড়ে মেয়ে কোথাকার! ভায়োলেট ফুল নিয়ে যদি না এসেছিস, তবে আজ দুঃখ আছে তোর কপালে।'

বেচারি মারোকলা কী আর করে! ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠে গেল। পাহাড়চুড়োয় উঠে সে দেখল বারো জন মানুষ, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তরুণ, আর কেউ কেউ বয়স্ক— একটি অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটিকেই মনে হচ্ছে তাদের নেতা।

মারোক্‌লাকে দেখে তারা অবাক হয়ে বলল, 'এ কী খুকু? এই ঠান্ডা হাওয়া, চাদ্দিকে বরফ, এর মধ্যে তুমি বাইরে বেরিয়েছ কেন?'

মারোক্‌লা ম্লান মুখে বলল, 'আমি কয়েকটা বুনো ভায়োলেট খুঁজতে এসেছি। নইলে আমার সৎমা আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না।'

'সে কী? দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি।' বলে সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষটি— যার নাম ফাদার জানুয়ারি— সবচেয়ে ছোটো মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাই মার্চ, তুমি চলে এসো আমার জায়গায়।' সঙ্গে সঙ্গে মার্চ চলে এল ফাদার জানুয়ারির জায়গায়। আর এসেই তার জাদুদণ্ডটি আগুনের ওপর নাড়তে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুন হু-হু করে বেড়ে উঠে প্রায় আকাশ ছুঁয়ে ফেলল। গলে গেল সব বরফ। সবুজ ঘাসে আর ফুলে ঢেকে গেল মাটি। মার্চ বলল, 'দৌড়োও, দৌড়োও। যত তাড়াতাড়ি পারো, ফুল তুলে নাও।' মারোকলাও চটপট ফুল তুলে নিল। 'ধন্যবাদ,' বলে মার্চের দিকে তাকিয়েই ছুটে গেল বাড়িতে।

ওর সৎমা আর সৎবোন ভাবতেই পারেনি যে ও ফুল নিয়ে আসতে পারবে। তবু ফুল নিয়ে যখন এসেই পড়েছে তখন তাকে দরজা খুলতেই হল। ভেতরেও ঢুকতে দিতে হল।

ক-দিন বাদেই হেলেন বলল, 'এই মেয়ে, যা তো, পাহাড়ের ধার থেকে টাটকা স্ট্রবেরি নিয়ে আয়।'

'স্ট্রবেরি! এই প্রচণ্ড বরফের মধ্যে কি স্ট্রবেরি পাবে দিদি?' মারোকলা ভয়ে ভয়ে বলল।

'চুপ!' চেঁচিয়ে উঠল তার সৎমা— 'যা, স্ট্রবেরি না নিয়ে বাড়ি আসবি না।'

বেচারি মারোক্‌লা আবার পাহাড়ি পথ বেয়ে রওনা হল। যেতে যেতে আবার গিয়ে পৌঁছল পাহাড়চুড়োর সেই জায়গাটিতে যেখানে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে বারো জন মানুষ। আবার তারা জিজ্ঞেস করল তাকে, 'কী ব্যাপার খুকু, এই ঠান্ডায় আবার এসেছ?' মারোক্‌লা খুলে বলল সব।

ফাদার জানুয়ারি তাঁর উলটোদিকে বসা তরুণটিকে ডেকে বললেন, 'জুন ভাই, চলে এসো আমার জায়গায়।' জুন তখনই চলে এল, আর এসেই তার জাদুদণ্ডটি দোলাতে লাগল আগুনের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখা লকলক করে উঠে গেল আকাশের দিকে। বরফ গলে গেল। ঝকঝকে রোদ্দুরে চারদিক উজ্জ্বল। গাছগুলো পাতায় পাতায় ভরে গেল। মাঠে মাঠে ভরতি স্ট্রবেরি।

মারোক্‌লা যত পারে স্ট্রবেরি কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটল। তার সৎমা আর সৎবোন নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। এত স্ট্রবেরি। তারা সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রবেরিগুলো খেতে শুরু করল। মারোক্‌লাকে অবশ্য একটাও দিল না।

এরপর ক-দিন বাদেই হেলেন তাকে ডেকে বলল, 'যা তো, পাহাড়ের ধার থেকে কয়েকটা টাটকা লাল টুকটুকে আপেল নিয়ে আয়।' মারোক্‌লা এবার আর প্রতিবাদ জানাল না। সে তো জানেই প্রতিবাদ জানিয়ে কোনও লাভ হবে না। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সে আবার সেই পাহাড়চুড়োয় উঠে গেল। সেই বারো জন এখনও সেখানে আগুন ঘিরে বসে আছে। এতদিনে অবশ্য মারোক্‌লা বুঝে গিয়েছে, এরা হচ্ছে সারা বছরের বারোটি মাস।

ফাদার জানুয়ারি তাকে দেখে বললেন, 'এবার তুমি কী খুঁজতে এসেছ, মারোক্‌লা?'

'পাকা পাকা লাল আপেল, ফাদার জানুয়ারি!' বলেই কেঁদে ফেলল মারোক্‌লা। ফাদার জানুয়ারি ইশারায় একজনকে বললেন, 'ভাই সেপ্টেম্বর, চলে এসো আমার জায়গায়।' সেপ্টেম্বর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল বৃদ্ধ জানুয়ারির জায়গায়। তারপর তার জাদুদণ্ডটি নাড়ল আগুনের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলে গেল। একটা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গেল। সে হাওয়ায় হলদে ঝরাপাতার একটা গালচে পাতা হয়ে গেল সমস্ত পাহাড় জুড়ে। একটিমাত্র গাছে অনেক উঁচু ডালে দুটি লাল টুকটুকে আপেল ফলে আছে। মারোক্‌লা ছুটে গিয়ে গাছটাকে প্রাণপণে নাড়াতে লাগল। নাড়াতে নাড়াতে শেষটায় আপেল দুটো মাটিতে খসে পড়ল। মারোক্‌লা ছুটে গিয়ে আপেল দুটো তুলে নিল, 'ধন্যবাদ ফাদার, ধন্যবাদ ভাইরা!' বলে সে ছুটে বাড়ির দিকে রওনা হল।

বাড়ি ফিরে আপেল দুটো হেলেনের হাতে দিতেই সে চিৎকার করে উঠল 'এ কী! মাত্র দুটো আপেল! নিশ্চয় তুই বাড়ি ফিরবার সময় বাকি আপেলগুলো খেয়ে ফেলেছিস। লোভী মেয়ে কোথাকার! এবার আমি নিজে যাব, আর বেশি করে নিয়ে আসব।'

'ওরে, একা যাসনি। আমি আসছি তোর সঙ্গে।' বলে ওর মা-ও বেরিয়ে এল। ওদের যত গরম জামা আছে সব গায়ে চাপিয়ে দু-জনে বেরিয়ে গেল। শিগগিরই একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠল! সেই ঝোড়ো বাতাসের গর্জন ওদের বাড়ির চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল। চারপাশে ঘন তুষারপাত। মারোক্‌লা অপেক্ষা করেই রইল। কিন্তু দুই মা-মেয়ে আর ফিরল না।

ঝড় থামবার পর মারোক্‌লা ছুটে উঠে গেল পাহাড় বেয়ে। ওই বারো জনকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো হেলেন আর তার মার খবর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নাঃ, পাহাড়চুড়ো ফাঁকা। সেই বারো জনও নেই, অগ্নিকুণ্ডও নেই। ওখানে কোনওদিন আগুন জ্বলেছে বলে মনেই হয় না।

(স্লোভাকিয়ার উপকথা)

ছবি: নীতিশ মুখোপাধ্যায়

শ্যামাপদবাবুর ভূতের গল্প

আশিস কর্মকার

শ্যামাপদবাবু পেশায় সেকেন্ডারি স্কুলের বাংলা শিক্ষক। নিজের কাজটা তিনি ঠিকমতো করতে চান এবং সেই কারণেই উনি আর প্রাইভেট টিউশন করেন না। শিক্ষকতার ফাঁকে একটু-আধটু লেখালেখি করেন তিনি। পাঠকরা অবশ্যই তাঁর লেখার সুখ্যাতি করেন এবং আরও বেশি করে লিখতে উৎসাহিত করেন। ছিপছিপে চেহারার শ্যামাপদবাবু এতেই খুশি।

তিনি যে সব গল্প লেখেন তার বেশির ভাগই ভূতের গল্প। শিশু-কিশোর পাঠকমহলে তাঁর নামটা বেশ পরিচিত। তিনি তাঁর লেখার প্লট সংগ্রহ করেন খবরের কাগজ বা টিভি চ্যানেলের মৃত্যুর খবর থেকে—সেখান থেকেই তিনি লেখার রসদ পান। অপমৃত্যু বা হত্যাকাণ্ডের কোনও খবর তাঁর নজরে এলেই উনি একটা প্লট ভেবে ফেলেন আর সেটা থেকেই শুরু হয় তাঁর নতুন গল্প লেখা।

তাঁর মুখ থেকেই শোনা, তিনি যখন ভূতের গল্প লিখতে বসেন তখন রাত নিঝুম হওয়া দরকার। চারিদিক ঘুমিয়ে পড়লে, কোলাহল থেমে গেলে তিনি তখন ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ করে ঘরের সব বাতি নিভিয়ে দেন। তারপর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তবেই খাতা খোলেন। সিলিং ফ্যানটিও বন্ধ করা থাকে সেই সময়। এতে নাকি দারুণ একটা গা ছমছম পরিবেশ তৈরি হয়। আর তাতেই তাঁর লেখার হাতটা খোলে।

খবরের কাগজওয়ালা ঘরের কাগজটা দিয়ে যাওয়া মাত্রই তিনি খুঁজতে থাকেন মৃত্যুর খবর —হোক না সে আত্মহত্যা বা খুন। রাজনীতি বা অর্থনীতিতে কী হল, না হল, সেটা তাঁর দেখতে ভালো লাগে না। একা মানুষ। সরকারের রং কী হবে না হবে, বাজারদর ওঠা-নামা করুক বা না-ই করুক কোনও হেলদোল নেই তাঁর। সত্যি কথা বলতে কী, কেবল মৃত্যুর খবর পড়ার জন্যই তাঁর রোজ খবরের কাগজ রাখা। আর মৃত্যুর খবরটা কেবল তাঁর গল্পের জন্য, মৃত্যু ভালো লাগে বলে নয়। মৃত্যু তাঁর মোটেই কাম্য নয়। তিনি মনে-প্রাণে চান না কেউ মারা যাক। কিন্তু কেউ মারা যাবার পর সেটা খবর হলে, তা পড়তে তো কোনও অসুবিধা নেই। আজকাল প্রায় রোজই খবরের কাগজের কোনও -না- কোনও কোণে এক-আধটা মৃত্যুর খবর থাকেই। আর এ-নিয়েই উনি লিখতে বসে পড়েন, লেখার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে।

আজ সকালে কাগজটা হাতে পাওয়ামাত্রই তিনি একবার আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন সারা কাগজটার। চার পৃষ্ঠার ডান দিকে নীচে কোণে একটা ছোট্ট খবরে এসে তাঁর চোখ আটকে গেল। শিরোনামটা এইরকম, 'গাছে ঝুলন্ত মৃতদেহ।' তৎক্ষণাৎ খবরটা পড়ে ফেললেন তিনি। এবার শুরু প্লট ভাবা। প্লট ভাবতে ভাবতেই স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি রওনা দেন স্কুলে। স্থান-কাল-পাত্রগুলোকে ইনিয়েবিনিয়ে নিজের সাথে এমন ভাবে মিশিয়ে দেন যে, মনে হয় যেন সত্যি সত্যিই তিনি ওই ঘটনার সাক্ষী!

স্কুল থেকে বেশ ফুরফুরে মনে ফিরলেন শ্যামাপদবাবু। স্কুলে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকেই প্লটটা তিনি ভাবছিলেন— পেয়েও গিয়েছেন চারটে ক্লাস নেওয়ার পর। চট করে গল্পের লাইন-আপ টুকে নেন পাঞ্জাবির বুক পকেটে রাখা নোটবইয়ে। বাড়ি ফিরে এটাকেই একটা গল্পে পরিণত করতে হবে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, শ্যামাপদবাবু অকৃতদার। তাঁর আত্মীয়স্বজন সে-রকম কেউ নেই। তাই তাঁর সম্বন্ধে যেমন কেউ ভাববার নেই, তাঁরও মনে কারও সম্পর্কে ভাবনা না-থাকাই স্বাভাবিক।

রাত্রিবেলা রান্না করে খেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন রাত বারোটা বাজবে। ততক্ষণ তিনি গল্পটা ভালো করে ভাবতে লাগলেন। বারোটা বাজার দশ মিনিট আগে তিনি তাঁর ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ করে দিলেন। লেখার টেবিলের পাশে জানালার আলসের ওপর রাখা স্ট্যান্ড সমেত মোমবাতিটা রাখলেন টেবিলের ওপর। আর রাখলেন একটা জল-ভরা বোতল। ঠিক বারোটা বাজতে তিন মিনিট, উনি সব লাইট, ফ্যান অফ্ করে মোমবাতিটা জ্বালালেন দেশলাই দিয়ে। চারিদিক নিঝুম হয়ে যাওয়ায় দেশলাইয়ের গায়ে কাঠির বারুদের ঘষার 'খস্‌স্' আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'দপ্' করে বারুদ জ্বলে ওঠার শব্দটা বেশ স্পষ্ট শুনতে পাওয়া গেল। ঠিক বারোটার সময় তিনি খাতা খুলে লিখতে শুরু করলেন:

'কর্মসূত্রে আমি এখন দক্ষিণ কলকাতার একটা ভাড়া বাড়িতে থাকি। আমার দেশের বাড়ি হল জগদম্বাপুর। জগদম্বাপুর হাওড়া স্টেশন থেকে ঘণ্টা তিনেক ট্রেনে করে যেতে হয়। সেখান থেকেও মিনিট পনেরো সাইকেল ভ্যানে করে গেলে আমার দেশের বাড়ি। সাইকেল ভ্যান, কারণ আমাদের দেশের বাড়ির দিকে রিকসা চালু হয়নি, কলকাতার মতন অটো তো নয়ই। কলকাতায় থাকার দরুন আমার দেশের বাড়িটা এখন তালা বন্ধ পড়ে রয়েছে। আমি মাঝেমধ্যে গিয়ে তালা খুলি, থাকি দু-একদিন। একান্তই মালিকহীন হয়ে থাকলে বাড়িটা বেদখল না হয়ে যায় সেই কারণেই মাসে কম করে দু-বার যেতে আমাকে হত- নিতান্তই অকারণে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে তিন ঘণ্টা ট্রেন তারপর মিনিট পনেরো সাইকেল ভ্যান ভেঙে আমাকেই কেন যেতে হয়, আর কেউ নয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবেই বলে রাখি যে, আমার ভাইবোন কেউ নেই, আমি বিয়ে-থা করিনি আর বাবা-মা-ও বেঁচে নেই। আত্মীয়-স্বজনও সেরকম নেই। ফলে এই অবস্থায় আমার নিজে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

দিন কতক আগে খবরের কাগজের একটা খবরের দিকে চোখ পড়তে আমি একটু হতভম্ব হই। খবরটা এই রকম—জগদম্বাপুরের পাঁচমুড়োর মাঠে খিরীশ গাছে একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ ঝুলে থাকতে দেখা যায়। তার গায়ে আঘাতের কোনও চিহ্ন না থাকায় পুলিশের অনুমান সেটা আত্মহত্যা। লোকটা কী কারণে আত্মহত্যা করল সেটা জানা যাবে না, যতক্ষণ-না কেউ লোকটার দেহ দাবি করে বা তার পরিচয় জানা যায়। ঘটনাটা পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। পাঁচমুড়োর মাঠ। এই মাঠের সঙ্গে আমার ছেলেবেলার কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কত খেলে বেড়িয়েছি এই মাঠে। এখনও মাঠটা প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের জন্য। আর সেই মাঠেই কিনা এ-ধরণের ঘটনা

ঘটল!

এই ঘটনার হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই আমাকে দেশের বাড়ি যেতে হয়। যথারীতি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে রওনা দিলাম। হাওড়া থেকে ট্রেনে ঘণ্টা তিনেক জার্নি করে জগদম্বাপুরে পা রাখলাম। যদিও এখন ভ্যানে করে না গিয়ে আধ ঘণ্টা হাঁটলেই বাড়ি পৌছে যাব, তবুও আমি স্টেশন থেকে ভ্যান নেব বলে স্ট্যান্ডে গিয়ে দেখি সীতেশ ভ্যানে বসে এক মনে বিড়ি টানছে। সীতেশ ভ্যান চালায়। আমাকে দেখতে পেয়েই বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে মুখটা সরিয়ে মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'দাদাবাবু যে!'

'নিয়ে যাবি না আমাকে?'

'কেন নিয়ে যাবনি দাদাবাবু, বসেন।' দাঁত বের করে চোয়ালের ভেতরে ঢুকে যাওয়া গালে হেসে বলল সে। আমি ভ্যানে বসতেই ভ্যান টানতে শুরু করল সীতেশ। স্টেশন থেকে নেমেই গ্রাম্য পথ। মেঠো পথ ধরে যাচ্ছি সীতেশের সাথে গল্প করতে করতে, উঁচু-নীচু, চড়াই-উতরাই ভেঙে।

মিনিট দশেক গিয়ে পথের পাশেই পাঁচমুড়োর মাঠটা নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। রাস্তাটা এমনই যে প্রায় তিন দিকে মাঠটাকে পরিক্রম করেছে। ভ্যান এখন এই রাস্তার ওপর দিয়ে চলেছে। মাঠটা দেখে আমার খবরের কাগজের কথাটা মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে সীতেশ, এই পাঁচমুড়োর মাঠের খিরিশ গাছে নাকি একটা লাশ ঝুলছিল?'

'হ্যাঁ, দাদাবাবু।'

'কোন গাছটারে? বেশ কয়েকটা তো গাছ রয়েছে।'

'হুই কোণের দিকে, মাজেরটাতে দাদাবাবু।' ভ্যান চালাতে চালাতেই বাঁ-হাতের তর্জনী দিয়ে নির্দেশ করল সীতেশ।

'লোকটার পরিচয় পাওয়া যায়নি?'

'না, দাদাবাবু।'

ভ্যানে বসে আমি ভালো করে মাঠটাকে দেখলাম, তাকালাম গাছগুলোর দিকেও। এই মাঠটায় পাঁচটা কোণ রয়েছে বলে এর নাম পাঁচমুড়োর মাঠ।

'এখন এই মাটের ওপর দিয়ে যাতায়াত বন্দ হয়ে গেচে দাদাবাবু।'

'কেন?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'মাট দিয়ে শটকাট করতি গেলে ওই গাচগুলোর নীচ দিয়েই তো যেতি হয়। তাই।'

'গাছের নীচ দিয়ে গেলে কী হবে?'

'ওই গাচগুলোর একটাতেই তো লোকটা গলায় দড়ি দিয়েচিল।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'গাচের নীচ দিয়ে গেলেই নাকি দেখা যায় দেহটা ঝুলচে!'

'তোরা সব পাগল। কেউ দেখেছে নাকি?'

'হ্যাঁ, জগনখুড়ো একদিন রেতের বেলায় ওই পথে যাচ্চিল, দেকতে পেয়ে জ্ঞান হারায়।'

'বুড়ো বয়েসে চোখে ভুল দেখেছে। আসলে ঝুলন্ত দেহটা সেই সময় দেখেছিল বলে ঘটনাটা চোখে ভাসে। আর এখানে এলেই মনে হয় যেন সত্যি সত্যিই দেহটা ঝুলছে।'

'না গো দাদাবাবু, নবীনও নিজের চোক্কে দেকেচে একদিন। আসলে অপঘাতে মিত্যু তো, তাই আত্মা শান্তি পায়নি। গাচের ডালেই ঝুলচে।' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সীতেশ।

'তুই দেখেছিস কি?'

'এসব শুনেও আমি কি আর ও পতে যাই? পাগল!'

মনে মনে ভাবলাম, সত্যিই পাগল! আমি আর কিছু না বলে চুপ করে গেলাম। বুঝলাম সীতেশকে বুঝিয়ে লাভ নেই। ওর মধ্যেও কু-সংস্কার থাকতেই পারে।

বাড়ি ফিরে দিন দুয়েক বেশ কাটালাম। পাড়াপড়শির সাথে দেখাসাক্ষাৎ করলাম। শনিবার কলকাতায় ফিরব, সন্ধ্যার ট্রেনে। তারপর রবিবার বিশ্রাম নিয়ে সোমবার অফিসে জয়েন করব। এমনই মনস্থির করেছি।

শনিবার বেরোতে বেরোতে বিকেল শেষ হয়ে এল। কর্ড লাইন বলে জগদম্বাপুরে সারাদিনে হাতেগোনা ট্রেন চলে। সন্ধ্যার ট্রেনটা মিস হলে আজ আর কলকাতায় ফেরা হবে না।

রাস্তায় উঠে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একটাও ভ্যানের দেখা পেলাম না। হতচ্ছাড়া সীতেশটাও যে কোথায় গিয়েছে কে জানে! ভাগ্যের বোধহয় এটাই পরিহাস; দরকারের সময় কিছুই পাওয়া গেল না। এদিকে ট্রেনের টাইমটা আমার মাথায় অ্যালার্মের মতন বাজছে। এখন একটা ভ্যান পাওয়া গেলে ঠিক সময় স্টেশনে পৌঁছে যাব। কিন্তু সেটা ভ্যান পেলে। আর নইলে এখন থেকেই খুব জোরে হাঁটা লাগালে ট্রেনটা পেলেও পেতে পারি। ঠিক এমন একটা সন্ধিক্ষণে যখন আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি তখন দোনোমনো মন না করে হেঁটে যাওয়াটাই ঠিক করলাম। আর এটাও ভেবে নিলাম, পথে

কোনও ভ্যান আর বোধহয় পাওয়া যাবে না। সেই ভেবেই আমি খানিকটা রাস্তায় হেঁটে পাঁচমুড়োর মাঠের কাছে এলাম। মাঠের ওপর দিয়ে শর্টকাট করব বলে আমি সেদিকে পা বাড়াতেই পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'ওদিকে চললে কোতায়?' আমি তাকিয়ে দেখি আজিম খুড়ো।

'স্টেশনের দিকে।'

'তা, এই পথে!'

'ট্রেন ধরতে হবে খুড়ো; ভ্যান পেলাম না।'

'তা বলে এই পথে! তুমি জানো না?' চোখ বড়ো বড়ো করে কপালে তুলে বললেন আজিম খুড়ো। সত্যিই তাড়াহুড়োর বশে আমি সীতেশের কথাগুলো ভুলেই গিয়েছিলাম। অবশ্য সীতেশের কথায় আমি একদমই গুরুত্ব দিইনি। এখন খুড়োর কথায় তা আবার মনে পড়ল। কিন্তু খুড়োকে এড়িয়ে যাই কী করে! আমতা আমতা করে বললাম, 'জানি, শুনেছি।'

'শুনেও তুমি—! আজ শনিবার তার ওপর আজ অমাবস্যা!'

'কিন্তু খুড়ো শর্টকাট না করলে যে ট্রেনটা বেরিয়ে যাবে।'

'তা ট্রেন বেরোয় বেরোক, প্রাণটা তো বেরোবে না।'

'ও কিছু হবে না খুড়ো। চলি, ট্রেনটা বেরিয়ে যাবে।' বলতে বলতে আমি নেমে পড়লাম পাঁচমুড়োর মাঠে। খুড়োকে এখন বোঝাতে গেলে আমার ট্রেনটা মিস হয়ে যাবে। খুড়ো চিৎকার করে বললেন, 'না গেলেই পারতে।' আমি আর কোনও জবাব দিলাম না।

অনেকদিন জোরে জোরে হাঁটার অভ্যাস নেই। তাই হাঁটার স্পীডও আগের মতন নেই। আর বেশ কষ্ট হচ্ছে। তবুও যতটা জোরে পারলাম এগোনোর চেষ্টা করতে লাগলাম। অমাবস্যার রাত। আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ আছে বটে, তবে মাঠে আর কে আলো জ্বালাতে আসবে? মাঠটাকে এখন ভুষো কালি মাখানো কাচের বাক্সের মতন লাগছে। অমাবস্যা হওয়াতে চাঁদের আলো নেই। মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘাস উঠে গিয়ে তৈরি হওয়া পথটাতে এখন মানুষের পা পড়ে না বলে সেখানেও বেশ ঘাস গজিয়ে গিয়েছে। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে ভালোই টের পাচ্ছি সেটা। অন্ধকারে একটু অসুবিধাই হচ্ছিল, সেটা দূর করার জন্য এবার পকেট থেকে লাইটারটা বের করলাম। ট্রেনে হকারের কাছ থেকে কিনেছিলাম এই লাইটারটা। এটা একদিকে যেমন গ্যাস লাইটার, অন্য দিকে এর পেছনে সাদা আলোর টর্চ রয়েছে। এটা যেমন দেশলাইয়ের কাজ করবে তেমনি অন্ধকারে টর্চের কাজও চালিয়ে নেওয়া যাবে। এখন সেই টর্চটাকেই কাজে লাগালাম। এই টর্চের সাদা আলোতেই পথ চলতে লাগলাম। বেশ ভালোই আলো হচ্ছে। আমার পায়ের কাছেই খালি আলো, আর বাকি মাঠটা ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। এই অন্ধকারে এত বড়ো মাঠে আমি একা— একথাটা ভেবে আমারও যে মনটা একটু কেঁপে কেঁপে উঠছে না, তা নয়। তবে এই ব্যাপারটাকে বেশি পাত্তা দিলাম না।

চলতে চলতে পৌঁছে গেলাম সেই খিরিশগাছগুলোর দিকে। খিরিশগাছগুলো মাঠটার কোণে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে যে রাস্তায় উঠতে গেলে গাছগুলোর নীচ দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এখানে চলার সময় কেমন একটা বুনো গন্ধ নাকে ভেসে এলো। আর ঠিক এই সময় সীতেশের কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। ঝুলন্ত দেহটা না দেখলেও আমার মানসপটে যেন ছবিটা আঁকা হয়ে রয়েছে। যেদিকেই তাকাচ্ছি, যেন অন্ধকারের ক্যানভাসে ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! যতই অবহেলা করি না কেন, এখন এই নির্জন অন্ধকার মাঠে গাছগুলোর তলায় সীতেশের কথাগুলো যেন প্রতিবারই নতুন করে ভয় দেখাতে লাগল। আমি একপ্রকার জোর করেই নীচের দিকে তাকিয়ে পা ফেলে এগোতে থাকলাম সামনের দিকে। হঠাৎ আমার কপালে কী যেন একটা ঠেকল।

এখন আমার এ সমস্ত বিষয় গুরুত্ব দেওয়ার মতন সময় নেই। কিন্তু মনে একটা প্রশ্নের উদয় না হয়ে পারল না, কপালে ঠিক লাগলটা কী? মনকে বোঝালাম, গাছের নীচের দিকের কোনও ডাল হয়তো একটু বেশি ঝুলে রয়েছে। সেটাই লেগেছে মাথায়। কিছুক্ষণ পর আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল! এবার আমি অবাক না-হয়ে পারলাম না। স্বভাবতই এবার আমি থমকে গেলাম। ওপর দিকে তাকালাম। অন্ধকারে বেশ বুঝতে পারছি কী যেন একটা দুলছে আমার মাথার ওপর। এবার টর্চটা ফেললাম সেদিকে, টর্চের আলোতে যা দেখলাম তাতে যেন এক অদৃশ্য ধাক্কায় আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে সমস্ত রক্ত বেরিয়ে পড়তে চাইল। আমার মাথার ওপর দুলছে মানুষের একজোড়া নগ্ন পা! এতটা পথ হেঁটে ঘেমে ওঠা শরীরেও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা ঘামের স্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে নামছে! তবুও মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। এর পর কী দৃশ্য দেখতে

পারি তা মোটামুটি আঁচ করেও আমি টর্চের আলোটা ধীরে ধীরে ঝুলন্ত পা-জোড়া থেকে ওপর দিকে তুলতে লাগলাম। নগ্ন পায়ের পাতা থেকে ওপর দিকে হেঁটো ধুতি, কোমরে সেটা শেষ হবার পর জামাহীন একটা রোগা শরীর, তার কাঁধের পাশ থেকে ঝুলছে দু-পাশে দুটো হাত, তার ওপরে গলায় দড়ি বাঁধা, মাথাটা একদিকে হেলে রয়েছে। সেই অবস্থায় চক্ষু কোটর থেকে চোখ দুটো যেন আমাকে গিলে ফেলতে চাইছে। মুহূর্ত সেই দিকে তাকিয়ে এক ঝটকায় চোখ নামিয়ে ফেললাম। আমার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে যেন হিমায়িত জলের ধারা বয়ে চলেছে। নীচের দিকে তাকিয়ে হাঁফাতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি ছুট লাগাব ভাবছি, কিন্তু আমার পা দুটো যেন কেউ ধরে রেখেছে। কিছুতেই নড়তে পারছি না। চিৎকার করার চেষ্টা করছি, কিন্তু গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোচ্ছে না! আমি প্রাণপণ চিৎকার করার চেষ্টা করছি, কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। হঠাৎ দেখি নগ্ন পা দুটো আমার চোখের সামনে দুলছে। চমকে উঠে ওপর দিকে তাকাতে দেখি দেহটা নীচের দিকে নেমে আসছে আমার সামনে। আমি যেন সংজ্ঞা হারাতে লাগলাম, আমি সংজ্ঞা হারাতে চলেছি—' এই পর্যন্ত এসে শ্যামাপদবাবুর কলম থেমে গেল। এরপর কী লিখবেন সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

আসলে লাইন-আপটা তিনি নোটবইতে এটুকুই লিখেছিলেন। বাকিটুকু পরে ভেবে লিখবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এখানে এসে এমনভাবে তিনি আটকে পড়বেন সেটা বুঝতে পারেননি। ভেবেছিলেন লেখা শুরু হলে তার ফ্লো-তেই শেষটা হয়ে যাবে। তিনি ভাবতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর আবার লেখা শুরু হল— 'সেই দেহ নীচে নেমে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে আমাকে বলল, 'আপনাকে দাঁড় করালাম কেন জানেন?' আমার তো তখন প্রাণ যায় যায়, কী উত্তর করব বুঝতে পারছি না। তবুও মুখ থেকে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে পড়ল, 'না!'

'আমার মৃত্যু সম্পর্কে যা জানেন তা ঠিক নয়, মিথ্যা—'

' মি - থ্যা!'

'হ্যাঁ, আমি আত্মহত্যা করিনি। আমাকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন! কে করল?'

'শেখ ইসমাইল। সে-ই আমার গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করে গাছের ডালে লটকে দেয়। সবাই জানে আমি আত্মহত্যা করেছি।'

আমি জানি শেখ ইসমাইল আমাদের ওদিকে

ডাকসাইটে মস্তান। তোলাবাজি, রাহাজানি ছাড়াও বেশ কয়েকটা খুনের কেস রয়েছে ওর নামে। বললাম, 'খুন করল কেন?'

'তিরুপতি সামন্তের খুনটা আমি দেখে ফেলি। তাই সাক্ষী রাখতে চাইল না। রঘু দারোগা আমার ব্যাপারটা একটু আঁচ করেছিল, কিন্তু ঘাঁটাতে সাহস পায়নি। আমার দেহটা পুলিশে নিয়ে গেলেও সেদিন থেকেই আমি এভাবে ঝুলে রয়েছি, সত্যি কথাটা কাউকে জানাব বলে। কিন্তু ওই দিনের পর থেকে কেউ এ পথে আসে না যে কাউকে বলব। দু-জন যা-ও এসেছিল, একজন জ্ঞান হারায় আর একজন দূর থেকেই পালায়। আপনিই একমাত্র সামনে এলেন। আজ আপনাকে বলে শান্তি পেলাম। তবে এটাও বলে রাখি আপনাকে যে, শেখ ইসমাইলকে ছাড়ব না; ওকে শেষ আমি করবই।'

প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া মোমবাতির শিখার দপ্‌দপানিতে হঠাৎ করে সম্বিত ফিরে পেলেন শ্যামাপদবাবু। খাতার দিকে চোখ যেতে অবাক হলেন তিনি। তিনি নিজে যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকেও আরও বেশ কিছুটা পর্যন্ত লেখা হয়ে রয়েছে! এমন সময় মোমবাতিটা দপ্‌দপানি থামিয়ে নিভে গেল। অন্ধকারে ডুবে গেল গোটা ঘর! তিনি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ঘরের লাইট জ্বালালেন। এবার যা দেখলেন যেটা তাঁর লেখকজীবনে কেন, গোটা জীবনেও প্রথম! তিনি যেখানে লেখা থামিয়েছিলেন, তার পর থেকে শেষ পর্যন্ত অন্য হাতের লেখা! এ কী করে সম্ভব! এ যে অবিশ্বাস্য! লেখাটা তবে শেষ হল কী ভাবে?

এতগুলো বিস্ময়কর অবিশ্বাস তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। তিনি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দিলেন। খাতাটা হাতে নিয়ে চোখের খুব সামনে নিয়ে এসে ভালো করে দেখলেন, না, ভুল হচ্ছে না মোটেই। এ লেখাটা তাঁর নিজের নয় এবং সেটা যে একজন গ্রাম্য মানুষের হাতের লেখা, তিনি তা নিজের শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝতে পারলেন! গলাটা কেমন শুকিয়ে আসছে তাঁর! বাইরেটা অন্ধকার! ঢক্‌ঢক্‌ এক নিশ্বাসে বোতলের প্রায় সমস্ত জল শেষ করে ফেললেন তিনি।

এ-অবস্থায় কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পর লেখাটা এখানেই শেষ না করে উনি তাতে আরও কয়েকটা লাইন জুড়ে দিলেন —'এর ঠিক দিন দুয়েক পরের কথা। আমি রোজকার মতন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সেটা মেলে ধরেছি চোখের সামনে। এ খবর সে খবর দেখতে দেখতে চারের পাতায় ওপরের দিকে চোখ যেতেই দৃষ্টি আটকে গেল আমার। খবরটা এরকম—শেখ ইসমাইল নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার হয় জগদম্বাপুরের পাঁচমুড়োর মাঠের খিরিশ গাছের নীচে। শেখ ইসমাইল ডাকসাইটে মস্তান বলে জানা যায়। বেশ কয়েকটা খুনের কেস চলছিল মৃতের নামে। পুলিশের অনুমান গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই হত্যা। কিন্তু মৃতের গায়ে কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে একই গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল এক ব্যক্তি। তার পরিচয় জানা যায়নি এখনও পর্যন্ত...।'

গল্পের শেষটা এ ভাবেই করলেন তিনি। গল্পের একটা যুতসই নামকরণ করলেন— 'পাঁচমুড়োর আতঙ্ক!'

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একটা ফাইনাল কপি তৈরি করে পাঠিয়ে দিলেন 'কিশোর' পত্রিকার দপ্তরে, যেখানে নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। কিন্তু মনের খুঁতখুঁতানিটা তখনও যায়নি তাঁর মন থেকে, যে মাঝখানে লেখাটা লিখল কে?

দু-দিন পর সম্পাদকমশায় নিজেই ফোন করে জানান যে, লেখাটা ভালোই হয়েছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

নতুন গল্পের প্রশংসায় প্রফুল্ল মনে পরদিন শ্যামাপদ বাবু খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সেটা মেলে ধরলেন চোখের সামনে। অন্যান্য খবর থাকলেও তাঁর দু-চোখ খুঁজতে লাগল মৃত্যুর খবর, যদি আবার কোনও নতুন প্লট পাওয়া যায়। চারের পাতায় ওপরের দিকে চোখ যেতেই খুশিতে মনটা ভরে উঠল তাঁর। পেয়েছেন একটা মৃত্যুর খবর। কাগজটা এগিয়ে নিয়ে এসে চিনি মন দিয়ে খবরটা পড়তে লাগলেন — 'শেখ ইসমাইল নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার হয় জগদম্বাপুরের পাঁচমুড়োর মাঠের ক্ষিরিশগাছের নীচে। শেখ ইসমাইল ডাকসাইটে মস্তান বলে জানা যায় ...।' পুরো খবরটা আর পড়তে পারলেন না শ্যামাপদবাবু। হাত দুটো কেঁপে উঠল তাঁর। তিনি গল্পটা যেভাবে শেষ করেছেন এখানেও হুবহু একই খবর বেরিয়েছে! এমন কী মৃতের নাম পর্যন্ত এক! মাথার ওপর ফুল স্পিডে ফ্যান চললেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল। গল্পের মাঝখানটা কি তাহলে....!

এরপর তিনি ঠিক করলেন, মৃত্যুর খবর থেকে গল্প তিনি আর কোনওদিন লিখবেন না।

ছবি: হর্ষমোহন চট্টরাজ

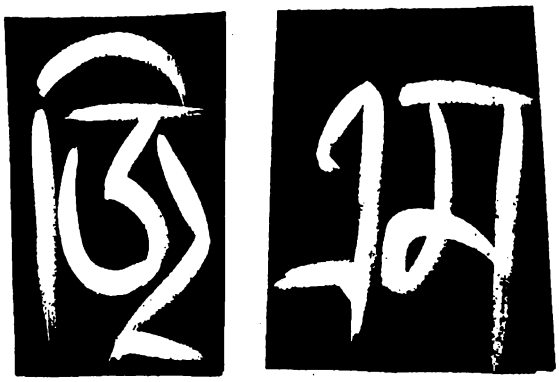

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এইজন্যই বাবা বাপ্পার হাতে মোবাইল ফোন দিতে চান না। সারাসকাল পড়া শিকেয় তুলে তিনি শুধু ফোন ক্যুইজ খেলেন বন্ধুদের সঙ্গে। আচ্ছা, বাপ্পাকে 'তিনি' কেন বললাম? কারণ শ্রীযুক্ত বাপ্পা, মানে বুয়ার বুজ্যাম ফ্রেন্ড, একজন গণ্যমান্য ছাত্র। ইস্কুলের ডিবেট ক্লাসে তিনি ভালো তার্কিক। পরীক্ষার খাতায় তিনি ভালো প্রাবন্ধিক। কম্পিউটার গেমসে তিনি প্রথিতযশা খেলুড়ে। এহেন বাপ্পার রিসেন্ট ফ্যাড—ফোন ক্যুইজ। বন্ধুদের ফোন করে, মানে বাবার মোবাইল ফোনের ব্যালান্স নষ্ট করে তিনি বন্ধুদের সাথে কুশল বিনিময়—না, ভুল বললাম কোয়েশ্চন বিনিময় করেন।

সেদিন, মানে গত রোববার বাবার ফোনে সুনামি আক্রমণ ঘটল। ঘটাল বাপ্পা। এক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সকাল কাবার। খাবারদাবার ভুলে শুধু ফোনেটিক আড্ডা চলল। বাবা তো অগ্নিশর্মা! শেষে মেজকার মধ্যস্থতায় যখন সব মিটল তখন দুপুর দুটো। রবিবারের সকাল এক জি এম-এই খতম।

'জি এম মানে?' আকাশ থেকে পড়ল জেসি। এতক্ষণ বাপ্পাচরিতমানস যিনি পাঠ করছিলেন সেই জিকো বলল, 'ওই জি এম নিয়েই যত গণ্ডগোল।'

'ইন্টারেস্টিং!' বলল জেসি।

'রিয়েলি ইন্টারেস্টিং,' মন্তব্য করল বুয়া। বলল, 'ইভন মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান আ ক্রাইম থ্রিলার।'

ছুটির দিনে জেসির বাড়িতে আড্ডা জমেছে তিন বন্ধুর। জেসি, জিকো, বুয়া। আর একজন বন্ধুও থাকতে পারতেন, তিনি বাপ্পা। কিন্তু গত রোববারের ঘটনার পর তিনি আপাতত গৃহবন্দি।

'আচ্ছা বলতো, এইচ এম মানে কী?' প্রশ্ন করল জিকো।

'হেড মাস্টার,' জেসির সপ্রতিভ উত্তর।

'কারেক্ট।' ক্লাসটিচারের মতন গম্ভীর ভাবে বলল বুয়া, 'অনেকগুলো বড়ো শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে ছোটো করে বলার রীতির নাম অ্যাব্রিভিয়েশন। যেমন 'এম পি ২০১০' মানে, ২০১০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেই রকম জি এম হল দুটো শব্দের অ্যাব্রিভিয়েশন। এই অ্যাব্রিভিয়েশন নিয়েই একটি সিন ক্রিয়েশন ঘটিয়েছিল বাপ্পা।'

'কী রকম?' কৌতূহলী জেসির প্রশ্ন।

সকালবেলায় পাশের ঘর থেকে বাপ্পা শুনতে পেল বাবা কাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'এই, জি এম-এর খবর জানিস?' ব্যাস, ওইটুকুই। বাপ্পার মাথায় ঢুকল জি এম মানে কী? তাঁর খবরটাই বা কী? নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু। আচ্ছা, জি ফর জিওগ্রাফি আর এম ফর ম্যাথ্‌মেটিকস্। না, তা তো নয়! তাহলে?

সকালের জলখাবার ঠান্ডা জল হল। বাপ্পা মাথা চুলকাল। মাথার চুল ছিঁড়ল, দাঁত দিয়ে নখ কাটল। উত্তর তবুও অধরা। উত্তরের আশায় বাপ্পা ফোন ক্যুইজ শুরু করল। চটপট অ্যানসার, ঝটপট শান্তি। কিন্তু কোথায় শান্তি? কান্তি জেঠুর ছোটোছেলে মধু, ও-ই তো পুরো জিনিসটা কেঁচিয়ে দিল।

মধু বলল, 'জি এম-এর খবর জানিস তো? জি এম

তো রেগে কাঁই। এবার অ্যানুয়াল পরীক্ষায় অঙ্কে সবাই জিরো পাবে।'

'লে হালুয়া, জি এম কে?' বাপ্পা আকাশ থেকে পড়ল।

'কেন, জি এম তো গদাই মজুমদার। আমাদের স্কুলের ম্যাথস টিচার। আড়ালে আমরা বলি জি এম মানে জ্ঞানের মেশিন।'

'তোর মাথা,' ফোঁস করে উঠল বাপ্পা। বলল, 'তোদের স্কুলের ম্যাথস টিচারকে আমার বাবা চেনেন না। এ অন্য জি এম।'

অতঃকিম! বাপ্পা আবার মাথা চুলকাল, মাথার চুল ছিঁড়ল। ডায়েরি ঘেঁটে ফোন নম্বর বের করে ডায়াল করল বিশুকে। বিশু মানে বিশ্বনাথ। পাড়ার দাবা চ্যাম্পিয়ান। পড়াশুনো শিকেয় তুলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে দাবা খেলে বেড়ায়। ওতেই ওর আনন্দ। বন্ধুরা মজা করে বলে, 'বিশ্বনাথ আনন্দ'। সেই বিশু তো লাফিয়ে উঠল, 'বলিস কী? জি এম-এর খবর জানব না? জি এম মানে তো গ্র্যান্ড মাস্টার। কিন্তু এখন কী করে জি এম হব! সবে তো পাড়া চ্যাম্পিয়ন। এরপর সাবডিভিশন, তারপর জেলা, তারপর রাজ্য। এসব ঘুরে তারপর আই এম, মানে ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার। এসব সামলে টিকে থাকতে পারলে তবে তো জি এম। কিন্তু তুই এখনই আমাকে জি এম বলছিস কেন?'

একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে বিশু যখন থামল, বাপ্পার মেজাজ তখন আরও তিরিক্ষে; বলল, 'আরে দুর বাবা, তোকে জি এম বলব কেন? তুই কী এমন বেড়ে খেলিস?'

ব্যাস, বিশু গেল চটে। ফোন কাটা। বাপ্পা আবার মাথা চুলকাল, মাথার চুল ছিঁড়ল, দাঁত দিয়ে নখ কাটল এবং আবার ফোন করল।

এবার ফোনাক্রান্ত হল সেজোঠাকুমা। বালিগঞ্জে বাড়ি, আশি ছুঁই ছুঁই বয়স। হাসিমাখা মুখ। এই বয়সেও ওষুধ পথ্যের ধার ধারেন না। তথ্যের ভাণ্ডার। সেই সেজোঠাকুমা গলা সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, 'এ কী বলিস বাপ্পা? জি এম মানে জানব না? জি এম মানে গ্র্যান্ডমাদার। তোরা আজ-কালকার ছেলেপুলেরা আমাদের মনে রাখিস না। উপদেশ গায়ে মাখিস না। আমার দিদি —শুনছিস তো, অ্যাই ছেলে শুনছিস তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনছি শুনছি, তুমি বলে যাও,' কাঁচুমাচু স্বরে বলল বাপ্পা।

'আমার বড়োদিদি, বড়দির বয়স সাতাশি, পাড়ার লেডিস ক্লাবে আমাকে সেক্রেটারির দায়িত্ব দিয়েছে। কেন জানিস, কারণ ক্লাবে ইয়ং ব্লাডের প্রয়োজন। আর তোরা—আজকালকার ছেলেছোকরারা গ্র্যান্ডমাদারকে ভুলে যাস। বেঞ্জামিন

ফ্রাঙ্কলিনের নাম শুনেছিস তো? বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন দেশের কাজ নিয়ে ফ্রান্সে গেছিলেন আশি বছর বয়সে। গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিস তাঁর ওয়াদিপাস নাটক লিখেছিলেন নব্বই বছর বয়সে। তোর বাবা অনাদির বিয়াল্লিশ বছর বয়েস। ও তো একটা বুড়ো। কেন জানিস? ও এখন যৌবনের বার্ধক্যে পৌঁছে গেছে। তোর জ্যাঠা অনন্ত পঁয়তাল্লিশে পা দিল, ও তো এখন কিশোর। কেন বল? কারণ ও এখন বার্ধক্যের কৈশোরে। কি, খুব খটমট লাগছে? তোরা না-শিখেছিস ইংরাজি, না-জানিস বাংলা।'

বাপ্পার তখন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। কোনওক্রমে ফোন রেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বাঁচলই বা বলি কী করে? জি এম-এর ভূত যে তখনও ওর ঘাড়ে! সুতরাং আবার ফোন—এবার লক্ষ্য বরেনকাকু।

বরেনকাকু মানে বরেন বোস। একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানে 'এন জি ও' অর্থাৎ 'নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেসন'। এন জি ও মানেই বড়ো বড়ো প্রজেক্ট। বড়োসড়ো কাজ। বরেনকাকুর সংগঠন বড়ো নয়। ছোটো সংস্থা, কিন্তু বড়ো কাজ। কী কাজ? তিনি পাড়ায় পাড়ায় উঠতি মস্তানদের কড়কে দেন। চোর ধরেন, মারেন না। পুলিসের হাতে তুলে দেন।

ইদানীং বরেনকাকুর পাড়া পূর্ব পুঁটিয়ারির পশ্চিম প্রান্তে মস্তানদের উপদ্রব বেড়েছে। কাকু ব্যস্ত, ফোনে কারও সাথে বেশি কথা বলেন না। সময় নেই, তবুও তিনি সময় দিলেন। এমন দিলেন যে বাপ্পা স্পিকটি নট। বললেন, 'বাপ্পা, তোরা দেশের ভবিষ্যৎ। তোরা যদি জি এম-এর খবর না রাখিস তো কারা রাখবে? জি এম মানে তো গুণ্ডামস্তান। এই দ্যাখ না আমার পাড়ায় গুণ্ডা মস্তানদের উপদ্রব বেড়েছে। আমরা কি বসে আছি? জি এম অর্থাৎ গুণ্ডামস্তানদের কথা ডি এম মানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সি এম মানে চিফ মিনিস্টার, মায় পি এম মানে প্রাইম মিনিস্টারকেও জানিয়েছি।'

বাপ্পা জানত বরেনকাকু অল্প কথার মানুষ। বড় বড় লেকচার তিনি দেন না। তাই কথা না বাড়িয়ে বার কয়েক ঢোঁক গিলে ফোন রাখল সে।

'তারপর?'

তারপর হেডস্যারের ইংরাজি ক্লাসে বেঞ্চে বসে ম্যাগাজিন পড়তে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লে যা হয় তাই হল। বাবা ঘরে এলেন। বাপ্পার হাতে মোবাইল দেখে রেগে ফায়ার। ফায়ার সার্ভিসের মতো ঘরে ঢুকল মেজকা। বাপ্পার বাবাকে বুঝিয়ে বললেন বাবার অফিসের জি এম মানে জেনারেল ম্যানেজার অবলোকন আচার্য অসুস্থ। তাই তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নিচ্ছিলেন বাপ্পার বাবা। বাপ্পা তার বাবার সেই প্রশ্নের সূত্র ধরে সকালের পড়া এবং বাবার মোবাইলের ব্যালেন্সের সর্বনাশ ঘটিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত বাপ্পা আপাতত গৃহবন্দি।

ছবি: সুদীপ্ত দত্ত

WITH BEST COMPLIMENTS :

from

K. N. GROUP

Mumbai **Kolkata** **Gujrat**

ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

সপ্তম কিস্তি

হেরম্যান সারা পৃথিবী চষে বেড়ান নানা রহস্যময় প্রাণীর খোঁজে। ইয়েতির খোঁজে নেপালে গিয়ে সুদীপ্তর সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। আফ্রিকার রিফ্‌ট্ ভ্যালী অঞ্চলে অভিযানে হেরম্যানের সঙ্গী সুদীপ্ত—উদ্দেশ্য প্রবাদিত সবুজ বনমানুষের সন্ধান করা। পাদ্রী কলিন্স -এর ডায়েরিতে দু-পেয়ে দশ ফুট লম্বা 'সবুজ মানুষ'-এর উল্লেখ আছে।

তাঙ্গানিকা হ্রদের পূর্ব তীরে যাচ্ছে ওরা। সঙ্গে গাইড টোগো, মালবাহী কুলি ও বন্দুকধারী রক্ষী বা আস্কারি। একটি গ্রামে ওরা শুনল যে এই পথে গিয়েছে আফ্রিকাবাসী শ্বেতাঙ্গদের নেতৃত্বে একটি বড়ো দল। তারা খোঁজখবর নিচ্ছিল সবুজ বনমানুষের বিষয়ে। তাঙ্গানিকা হ্রদের উত্তরে গিরিশিরার বেশ কিছুটা উঁচুতে উঠল ওরা। হরিণ মারতে বন্দুকের গুলি ছুঁড়তেই তার উত্তরে শুনতে পেল আরেকটি গুলির আওয়াজ। পরের উপত্যকায় আফ্রিকান্ডার দলটির তাঁবু। তাদের দলপতি ম্যাকুইনা ডায়ার সাত ফুট লম্বা, জাঞ্জিবারের বাসিন্দা ও এক হিরের খনির মালিক।

হেরম্যান বললেন যে তিনি জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা করতে এসেছেন। ম্যাকুইনা বললেন, তাঁদের উদ্দেশ্য সিংহ শিকাব, কিন্তু মাসাইদের বন্দুকগুলি সিংহ শিকার করার মতো শক্তিশালী নয়। সন্ধ্যের মুখে একটি সিংহ চকিতে এক মাসাইকে টেনে নিয়ে গেল। অন্ধকার হবার মুখে অনেকগুলি আগুন জ্বালাল ওরা—তবু এক দল সিংহ এগিয়ে এল। চারটি সিংহ মরার পর বাকিরা পিছু হটল। সিংহশঙ্কুল বিস্তীর্ণ ঘাসবন পেরিয়ে ওরা চলল রুভুভু নদীর তীর দিয়ে। পৌঁছাল ওদের লক্ষ্যস্থলের কাছে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে দেখতে পেল কলিন্সের বর্ণিত পিগমিদের গ্রামটা। পরদিন সকালে নিচে গেল ওরা।

গ্রামে শ-দুয়েক লোক, গোটা পঞ্চাশ কুঁড়ে ঘর। চারদিক ঘিরে গাছের পাঁচিল। ওদের বল্লম আর তিরে মারাত্মক বিষ মাখানো থাকে। গ্রামের প্রধান ওটুম্বার শর্ত—এই অঞ্চলে শিকার করতে গেলে ওদের দুটো বন্দুক দিতে হবে, উত্তরের পাহাড়ের গোরিলাদের মারতে সাহায্য করতে হবে, রাতে গ্রামের পাশে এতজনের থাকা চলবে না, আর পশ্চিমে ওদের পবিত্র পাহাড়ে শিকার করা যাবে না। গ্রামের মধ্যে ওঙ্গো দেবতার বীভৎস মূর্তিবিশাল ভয়ংকর মুখসর্বস্ব দেহ। পাশে বলি দেওয়া বানরের হাড়ের স্তূপএকটা মানুষের খুলিও পড়ে। শর্ত মেনে গোরিলা মারতে গেল কিছু মাসাই ও কিছু পিগমি, ওটুম্বা সমেত।

ওরা পশ্চিমের পাহাড়ে গিয়ে দেখল একটি গাছ থেকে ঝুলছে তিনটি কঙ্কাল, চামড়ার ফিতে দিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তাদের। দীর্ঘাকৃতি কঙ্কালটি ম্যাকুইনার চেনা কারও, তিনি সঙ্গের লোকেদের বললেন, কঙ্কালটি নামিয়ে কবর দিতে।

মাঝরাতে ওদের তাঁবুর কাছে এসেছিল এক বিশালাকৃতি বনমানুষ, আট ফুট লম্বা, পায়ে চারটি করে আঙুল।

পরদিন পশ্চিমের উপত্যকায় গভীর বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে এগোল ওরা। হঠাৎ একটা গোল ফাঁকা জায়গায় একটা লম্বা বাঁশের মাথা থেকে ঝুলছে একটা কঙ্কাল। যাকে গতদিন ওরা কবর দিয়েছিল তারই কঙ্কাল। চতুর্দিকে পিগমি ও বিশাল বনমানুষের পায়ের ছাপ। ম্যাকুইনা যেন রাগে ফেটে পড়বেন—বললেন, তাঁর বাবা ছিলেন ইনি।

বিকেলে পাহাড়ের উপরের আস্তানাতে ফিরে আকালা ও টোগো নীচের গ্রামে গিয়ে ওটুম্বাকে ডেকে আনল, সঙ্গে চার রক্ষী। বনমানুষের কথা জিজ্ঞেস করতে ওটুম্বা বলল— ওরকম কোনও প্রাণীর কথা ওরা জানে না।

ম্যাকুইনা বলল, ওটুম্বাকে ও ছাড়বে না। সুদীপ্তরা আপত্তি করলে ওদের ওপরেও রেগে আগুন। বিপদ বুঝে ছুট দিল ওটুম্বারা, পিছু নিল ম্যাকুইনারা। দু-জন পিগমিকে গুলি করল আর ওটুম্বাকে দড়ি দিয়ে বাঁধল। পিগমির বিষাক্ত তিরে মরল একজন মাসাই। দু-জন পিগমি ছুটে গ্রামে পৌঁছে গেল।

সুদীপ্তরা ঠিক করল পরদিনই এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে।

ম্যাকুইনার তাঁবুতে প্রবেশ করার আগে মুহূর্তের জন্য সুদীপ্তরা দাঁড়িয়ে পড়ল, ম্যাকুইনার তাঁবুর ঠিক পেছনে একটা ঝাঁকড়া গাছের সাথে বাঁধা আছে ওটুম্বা। জায়গাটা আধো-অন্ধকার। শুধু তাঁবুর সামনের অগ্নিকুণ্ডের মৃদু আভা গিয়ে পড়েছে সেখানে। স্পষ্ট বোঝা না গেলেও ওটুম্বা সম্ভবত তাকিয়ে দেখছে সুদীপ্তদের।

তার দিকে একবার তাকিয়ে সুদীপ্তরা প্রবেশ করল তাঁবুতে। ম্যাকুইনা তাঁবুর দরজার দিকে পিছন ফিরে কী যেন করছিলেন। পায়ের শব্দে চমকে উঠে পিছন ফিরলেন তিনি। সুদীপ্ত খেয়াল করল ম্যাকুইনার হাতটা তার কোমরের রিভলভারের কাছে চলে গেল। অর্থাৎ তিনি এখন বেশি সতর্ক হয়ে গেছেন। ম্যাকুইনার তাঁবুতে বেশ কয়েকটা কাঠের প্যাকিং বাক্স রয়েছে। ম্যাকুইনা ইশারায় সুদীপ্তদের তার ওপর বসতে বললেন। বসল সুদীপ্তরা। ম্যাকুইনা বসলেন তাদের মুখোমুখি আর একটা বাক্সর ওপর। সুদীপ্তদের একবার জরিপ করে নিয়ে ম্যাকুইনা গম্ভীরভাবে বললেন, 'বলুন, আপনারা কী আলোচনা করতে এসেছেন?'

সুদীপ্তই আলোচনা শুরু করল। বলল, 'আপনি ওটুম্বার ব্যাপারে নতুন কিছু ভাবলেন?'

ম্যাকুইনা জবাব দিলেন, 'না, নতুন কিছু ওর সম্বন্ধে আমার ভাবার নেই। আমার ভাবনা তো আগেই আপনাদের বলেছি। সবুজ বানরের সন্ধান যতক্ষণ না ও দিচ্ছে, ততক্ষণ ওর মুক্তি নেই।'

হেরম্যান এবার শান্তভাবে বললেন, 'ওর সঙ্গী দু-জন তো গ্রামে ফিরে গেছে। ওরা ওদের সর্দারকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য যদি আক্রমণ করে তাহলে রাইফেল দিয়ে ওদের কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখবেন? তাছাড়া মাসাইটার ওপর ওদের তিরের প্রভাব তো সকলে নিজের চোখেই দেখলাম। ওরা নিশ্চয়ই এত সহজে আমাদের ছেড়ে দেবে না।'

ম্যাকুইনা বললেন, 'ওরা আমার কিছু করতে পারবে না। শুধু রাইফেলের ওপর নির্ভর করে আমি বসে নেই। আপনারা যে প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে আছেন ওর ভেতরে কী আছে জানেন? মেশিনগান। পুবের পাহাড় আর এ পাহাড়ের মাথায় দুটো মেশিনগান বসিয়েছি আমি। বামনগুলো ও পাহাড়ে উঠে আমার আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমি তৈরি হয়েই এখানে এসেছি।'

সুদীপ্তরা এবার বুঝতে পারল, ম্যাকুইনার লোকসংখ্যা হঠাৎ কমে গেল কেন? সে লোকগুলো নিশ্চয়ই মেশিনগান নিয়ে লুকিয়ে রয়েছে।

সুদীপ্ত ম্যাকুইনার কথা শুনে বলল, 'এ ব্যাপারটা নয় বুঝলাম, কিন্তু যদি ওটুম্বা কোনও কথা বলতে না চায় তখন?'

এবার একটা হিংস্র হাসি ফুটে উঠল ম্যাকুইনার মুখে। উঠে দাঁড়ালেন ম্যাকুইনা। তারপর বললেন, 'বলতে ওকে হবেই। আজ নয়তো কাল। সে পথ আমার জানা আছে। দরকার হলে আমি ওকে...'

'কী? খুন করবেন?' ম্যাকুইনার কথা শেষ হবার আগেই প্রশ্ন করলেন হেরম্যান।

নিঃশব্দে আবার হিংস্রভাবে হেসে তিনি বললেন, 'খুন করব না। কথা বার করার জন্য আমার অন্য রাস্তা জানা আছে। আপনারা জাঞ্জিবার নাইফ কাকে বলে জানেন?'

ঘাড় নাড়ল সুদীপ্তরা।

ম্যাকুইনা এবার তার পোশাকের পকেট থেকে অনেকটা সুপুরি-কাটা জাঁতির মতো ছোট্ট যন্ত্র বার করলেন। তার সামনে ছোট্ট একটা ছিদ্র আছে। ম্যাকুইনা মাটি থেকে একটা মোটা কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে সেই ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে যন্ত্রটা সুদীপ্তর সামনে নাচিয়ে বললেন, 'এ হল এক প্রাচীন

যন্ত্র। একসময় জাঞ্জিবারের হিরের খনিতে বুনো আফ্রিকান শ্রমিকদের বশ মানানোর জন্য শ্বেতকায় মালিকরা এ যন্ত্র ব্যবহার করত। এ যন্ত্র দিয়ে কী করা হত জানেন? কাঠিটা যেভাবে আমি কাটলাম, সেভাবে শ্রমিকদের হাত-পায়ের আঙুল কেটে নেওয়া হত। অসহ্য যন্ত্রণা! সিংহের মতো সাহসী আফ্রিকানরাও বশ মানত তাতে। আমি ওটুম্বার ওপর এ যন্ত্র ব্যবহার করব। একটা-দুটো আঙুল যাবার পর আশা করি ওটুম্বা মুখ খুলবে।'

ম্যাকুইনার কথা শুনে শিউরে উঠল সবাই। নিঃশব্দে শয়তানের হাসি হাসতে লাগলেন ম্যাকুইনা। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে আসা আগুনের লাল আভাতে ম্যাকুইনার মুখটা যেন শয়তানের প্রতিচ্ছবি। সুদীপ্তর ইচ্ছা হচ্ছিল এই মুহূর্তে রিভলবার দিয়ে লোকটার খুলি উড়িয়ে দিতে। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকুল নয়, নিজেকে সংযত রাখল সুদীপ্ত।

বেশ কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে রইল সকলে। সুদীপ্তরা ভেবে পাচ্ছিল না ম্যাকুইনাকে তারা কী বলবে! সুদীপ্তদের কথার প্রত্যাশায় থাকার পর ম্যাকুইনা নিজেই মুখ খুললেন, 'অবশ্য এ-সবের কিছুই প্রয়োজন হবে না যদি ওটুম্বা মুখ খোলে। এ ব্যাপারে টোগো যদি ওকে বুঝিয়ে বলে তাহলে কাজ হতে পারে। টোগো কি এখন ওর সঙ্গে কথা বলবে?' এই বলে তিনি তাকালেন টোগোর দিকে।

ওটুম্বার সাথে টোগোর কথা বলার সুযোগটা ছাড়া উচিত হবে না বুঝতে পেরে সুদীপ্ত তার পাশে বসা টোগোর হাতে আলতো করে চাপ দিল। টোগো ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাকুইনাকে বলল, 'ঠিক আছে চলুন, আমি কথা বলতে রাজি।'

ম্যাকুইনা বলল, 'বাঃ এই তো সুবুদ্ধি হয়েছে। তবে ওর সঙ্গে কথা বলার সময় জাঞ্জিবার নাইফের ব্যাপারটা কিন্তু বোলো।'

ম্যাকুইনার তাঁবু থেকে বেরিয়ে তাঁবুর পিছন দিকে এগোল সুদীপ্তরা। সঙ্গে ম্যাকুইনা। কিছু দূরে একটা রোজউড গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে ওটুম্বা।

সুদীপ্তরা গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওটুম্বা তাদের দিকে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠে দড়ি ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। ঠিক যেন সে একটা দড়ি বাঁধা সিংহ।

ম্যাকুইনা তাকে দেখে বললেন, 'কী তেজ দেখছেন বামনটার?'

তার কথা শুনে হেরম্যান বা সুদীপ্ত কোনও মন্তব্য করল না।

টোগো এবার কী যেন বলল ওটুম্বার উদ্দেশে। ওটুম্বা শুনে আরও চিৎকার করে উঠল।

টোগো আবারও কী একটা বলল। ওটুম্বা এবার চুপ করে তাকাল টোগোর দিকে। তার উদ্দেশে এরপর একটানা কথা বলতে শুরু করল টোগো। কিছুক্ষণ টোগোর কথা শোনার পর আস্তে আস্তে মুখ খুলল ওটুম্বা। শুরু হল টোগো আর ওটুম্বার কথোপকথন। দুর্বোধ্য সেই কথাবার্তা সুদীপ্তদের কারোরই বোধগম্য হল না।

তাদের কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ম্যাকুইনা এক-সময় অধৈর্য্য হয়ে টোগোকে বললেন, 'এবার আমাকে বলো ও কী বলছে।'

টোগো অবশ্য আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর থামল। ওটুম্বা যেন বেশ কিছুটা শান্ত হয়েছে বলে মনে হল সুদীপ্তর। ওটুম্বার সাথে কথা শেষ হলে টোগো ম্যাকুইনাকে বলল, 'আমাদের কথা ওকে বললাম। বললাম ও সবুজ মানুষের কথা বললেই ওকে আপনি ছেড়ে দেবেন। আপনার যন্ত্রের কথাটাও ওকে বলেছি, তাতে মনে হয় কিছুটা ভয় পেয়েছে। ও বলছে ওকে ভাববার জন্য একদিন সময় দিতে হবে।'

শুনে ম্যাকুইনা একটু খুশির স্বরে বললেন, 'ও ভয় পেয়েছে বলছো? ভালো, আমার তাড়া নেই, তবে এক দিনের বেশি ভাবতে চাইলে প্রত্যেক দিনের জন্য একটা করে আঙুল গুনাগার দিতে হবে। এ-কথাটা বলে দাও ওকে।'

টোগো কী যেন বলল ওটুম্বাকে। শুনে সে ঘাড় নাড়ল। সুদীপ্তরা এবার পা বাড়াল সে জায়গা ছেড়ে ফেরার জন্য।

ম্যাকুইনা ঢুকে গেলেন নিজের তাঁবুতে। সুদীপ্তদের দুটো তাঁবু ম্যাকুইনাদের তাঁবু থেকে কিছুটা দূরে খাদের কিনারায় পাতা হয়েছে। তাঁবুর সামনে বসে জটলা করছিল হুটু আস্কারি আর তুতসি কুলিরা। তাদের চোখমুখ দেখে সুদীপ্ত বুঝতে পারল সাম্প্রতিক ঘটনায় তাদের মধ্যেও চাপা উত্তেজনার ভাব। তাঁবুতে ঢোকার মুখে হেরম্যান তাদের উদ্দেশে বললেন, 'সবসময় সতর্ক থাকবে। যে কোনও মুহূর্তেই কোনও ঘটনা ঘটতে পারে।'

তাঁবুতে ঢুকে বসার পর হেরম্যান টোগোকে বলল, 'ওটুম্বার সাথে তোমার কী কথা হল?'

টোগো বলল, 'আমি ওকে সংক্ষেপে সবকথা খুলে বলেছি। বলেছি আমরা ক-জন ম্যাকুইনার দলের লোক নই। ওর সঙ্গে আমাদের রাস্তায় দেখা হয়েছে। আপনি ও আপনার

বন্ধু আফ্রিকার লোক নন। অনেক দূরদেশে থাকেন আপনারা। সবুজ বানরের খোঁজে আপনারা এখানে এলেও ওটুম্বার কোনও ক্ষতি করবেন না। এ-ও বলেছি আমরাও এখন প্রায় ম্যাকুইনার হাতে বন্দি। তার কথা শুনে আমাদের চলতে হচ্ছে। তাই ইচ্ছা থাকলেও আমরা কিছু করতে পারছি না। তবে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি ওকে মুক্ত করার। এ জন্য আমি কৌশলে ওটুম্বার নাম করে আফ্রিকান্ডারের কাছ থেকেএক দিনের সময় চেয়ে নিলাম।'

হেরম্যান টোগোর বুদ্ধির তারিফ করে বললেন, 'বাঃ! একটা দিন বাড়তি সময় পাওয়া গেল। আমাদের চলে যাবার কথাটা তাই ওকে বললাম না।'

'আচ্ছা, তোমার কথা শুনে ওটুম্বা কী বলল?'

টোগো জবাব দিল, 'আমার কথা সম্ভবত কিছুটা বিশ্বাস করেছে। কারণ ওর সামনেই আমরা দু-দল বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি ওকে আরও বলেছি আফ্রিকান্ডার ওকে বেঁধে রাখবে জানলে ওকে ডেকে আনতাম না। আফ্রিকান্ডাররা আমাদেরও ঠকিয়েছে, তাই যুদ্ধ হতে যাচ্ছিল। আমরা দলে কম বলে পিছিয়ে এসেছি। সুযোগের অপেক্ষায় আছি।'

এরপর থেকে টোগো বলল, 'তবে সবুজ বানর যে এ-তল্লাটে আছে, ওর কথা শুনে নিশ্চিত হয়েছি।'

'তাই নাকি!' বিস্মিত কণ্ঠে একসাথে বলে উঠল সুদীপ্ত আর হেরম্যান।

টোগো বলল, 'হ্যাঁ, ওটুম্বা বলল—সে যদি মুক্তি না পায় তাহলে দেবতা টাইবুরু আফ্রিকান্ডার সমেত সকলকে হত্যা করবে। আফ্রিকান্ডার যতই তার ওপর অত্যাচার করুক না কেন সে বা পিগমিরা প্রাণ থাকতে কিছুতেই তাদের সবুজ দেবতা টাইবুরুকে তাদের হাতে তুলে দেবে না।'

বিস্মিত সুদীপ্ত বলল, 'তার মানে ওরা ওই দানববানরকেই দেবতা বলে পুজো করে।'

হেরম্যান বললেন, 'ওটুম্বা যা বলছে তাতে তো তাই মনে হচ্ছে। তাই তাঁকে আগলে রাখার এত প্রচেষ্টা ওটুম্বাদের।'

টোগো বলল, 'তবে পশ্চিম পাহাড়ে আমাদের যাবার ব্যাপারটা কিন্তু ও জেনে গেছে। ঢাকের বাদ্যির মাধ্যমে নীচ থেকে এ খবরই তাকে পৌঁছে দিয়েছিল পিগমিরা। যে কারণে ওটুম্বা গ্রামে ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত গ্রাম থেকে ওটুম্বাকে নিয়ে এখানে আসার পথেই পশ্চিমের পাহাড়ে আমাদের যাবার খবরটা গ্রামে এসে পৌঁছয়। সামান্য সময়ের পার্থক্যের জন্য ওটুম্বা ধরা পড়ে গেল।'

হেরম্যান বললেন, 'এখন আমাদের কর্মপন্থা নিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে। কিন্তু তার আগে খাবার আর বিশ্রামের প্রয়োজন। কালকের মধ্যে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।'

সুদীপ্ত সম্মতি জানাল তার কথায়।

সারাদিন অনেক পরিশ্রম আর উত্তেজনা গেছে। রাত আটটা নাগাদ খাওয়া সেরে আস্কারিদের পাহারায় রেখে তাঁবুর ভিতর শুয়ে পড়ল সুদীপ্তরা। ক্লান্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম এল তার চোখে।

মাঝরাতে চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল সুদীপ্তদের। বাইরে বেরিয়ে এসে তারা দেখতে পেল মাসাইরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটছে খাদের ধারে গ্রামে নামার পথের দিকে। সেখানে নীচের দিকে তাকিয়ে তারা কী যেন দেখছে! সেই দঙ্গলে ম্যাকুইনাও আছেন। সেদিকে যাবার আগে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কান খাড়া করে বলল, 'শুনতে পাচ্ছেন?'

মাসাইদের চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে এবার শব্দটা কানে এসে লাগল সুদীপ্তর। ঢাকের শব্দ! সে শব্দ নীচ থেকে ওপরে উঠে আসছে।

হেরম্যান বললেন, 'সম্ভবত পিগমিরা তাদের রাজাকে মুক্ত করে নিতে আসছে। আমাদেরও বিপদের আশঙ্কা আছে। ওরা তো আমাদের আর ম্যাকুইনার তফাত করতে পারবে না। তারপর আবার টোগোই ওটুম্বাকে ডেকে এনেছিল। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা বিপদের সম্ভাবনা দেখব ততক্ষণ আমরা লড়াই করব না।'

টোগো বলল, 'হ্যাঁ, আমিও আপনার সাথে একমত।'

হেরম্যান তুতসি কুলিদের তাঁবুর কাছেই থাকতে বলে তাদের নিরাপত্তার জন্য সেখানে একজন আস্কারি নিযুক্ত করলেন। তারপর বাকি তিনজন আস্কারিকে নিয়ে সুদীপ্তরা এগোল যেখানে ম্যাকুইনা দাঁড়িয়ে আছেন সেদিকে।

তাদের কাছে পৌঁছে পাহাড়ের নীচের দিকে তাকাতেই সুদীপ্তরা দেখতে পেল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অনেক মশালের আলো সার বেঁধে ওপরে দিকে উঠে আসছে। তারা সংখ্যায় অন্তত জনা পঞ্চাশেক হবে। ঢাক বাজছে। মশালের আলোতে চিক্‌চিক্ করছে বর্শার ফলা, কাঁধে তির তুনির। হাতে ধরা ঢাল। তার আড়ালে প্রায় অদৃশ্য পিগমিদের ক্ষুদ্র

অবয়বগুলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওটুম্বাকে ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ উপরোধ জানাতে আসছে না। পুরোদস্তুর যুদ্ধের মেজাজে তারা পাহাড়ের উপরে উঠছে ওটুম্বাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকে যেন বুকের মধ্যে অনুভব করতে পারছে তাদের ঢিপ ঢিপ পদশব্দ। পিগমিরা যত ওপরে উঠে আসছে ততই যেন ম্যাকুইনার দুর্ধর্ষ মাসাইদের চোখেমুখে ফুটে উঠছে আতঙ্কের চিহ্ন। তিরের খোঁচায় তাদের সঙ্গীর মৃত্যুর টাটকা স্মৃতি কাঁপন ধরাচ্ছে বুকে। তারা মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ম্যাকুইনার দিকে, কখন তিনি রাইফেল ছোঁড়ার নির্দেশ দেন তার অপেক্ষায়। ম্যাকুইনার মুখ কিন্তু ভাবলেশহীন। স্থির দৃষ্টিতে তিনি নীচের দিকে তাকিয়ে আছেন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যেতে লাগল। ক্রমশই উপরের দিকে উঠে আসছে মশালের সারি। সুদীপ্ত চাপা স্বরে হেরম্যানকে বলল, 'ম্যাকুইনা ওদের ওপরে ওঠার সুযোগ দিচ্ছেন কেন?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'সম্ভবত ও ওদের বুলেটের পাল্লার মধ্যে আনতে চাচ্ছে।'

হেরম্যানের অনুমান যে সত্যি তা কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমাণিত হল। মিনিট তিনেক পর অন্যান্যদের মতো সুদীপ্তরাও সঙ্গে সঙ্গে খাদের কিনারে ম্যাকুইনাদের একটু তফাতে বসে পড়ল। পিগমিরা তখন বেশ কিছুটা ওপরে উঠে এসেছে। ম্যাকুইনা কিন্তু খাদের ধারে বসে থাকা সারবদ্ধ মাসাইদের রাইফেল চালাবার নির্দেশ দিল না। সকলে বসার পর তিনি হঠাৎ বসে পড়ে রিভলবার বার করে তিনবার শূন্যে গুলি ছুঁড়লেন। আর তার পরক্ষণেই সুদীপ্তদের পিছন দিকের পাহাড়ের একটা খাঁজ থেকে শুরু হল মেশিন গানের র‍্যাট-র‍্যাট আওয়াজ। সুদীপ্তদের মাথার ওপর দিয়ে শোঁ-শোঁ বাতাস কেটে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি নামতে শুরু করল নীচের দিকে। পুবের পাহাড় থেকেও ভেসে আসতে লাগল একই আওয়াজ।

সুদীপ্তরা দেখতে পেল ওপরে উঠে আসা পিগমি দলটা যেন ভেঙে যেতে শুরু করেছে। কয়েকটা মশালের আলো গড়িয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বুলেট গিয়ে লাগছে তাদের গায়ে। ওপরে না-উঠে সম্ভবত তারা পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এরপরই তারা মশালের আলোগুলোকে সবাই এক সাথে নিভিয়ে ফেলল। পুরো দলটা হারিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। সেই অন্ধকার লক্ষ্য করেই ছুটতে লাগল মেশিনগানের গুলি। ম্যাকুইনা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'ওরা মশাল নিভিয়ে গ্রামে পালাচ্ছে। কিন্তু কাল সকালেই সারা গ্রাম শেষ করে দেব আমি।'

ম্যাকুইনার কথা শুনে মাসাইদের মধ্যেও যেন একটা উল্লাসের ভাব ফুটে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই একজন মাসাই ঢাল বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল। আর তারপরই একজন মাসাই হাঁউমাউ করে চিৎকার করে উঠল। সকলে তার দিকে তাকিয়ে দেখল তার হাতে ধরা আছে ক্ষুদ্রাকৃতি একটা তির। মাসাইটা তার বাহু থেকে সেই মুহূর্তে টেনে বার করেছে সেটা। দু-একবার চিৎকার করে সে-ও নীচের দিকে গড়িয়ে গেল। তার হাতে ধরা তির দেখে সকলে তখনই বুঝে গেল ব্যাপারটা। পিগমিদের একটা দল তার কাছে উঠে এসেছে। অগ্রবর্তী সেই দল মশাল জ্বালায়নি, পিছনের দলটা মশাল জ্বালিয়ে ছিল তাদের তাদের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা জন্য, যাতে প্রথম দলটা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বিনা বাধায় ওপরে উঠে আসতে পারে।

আরও একটা তির এসে বিঁধল। আতঙ্কে এবার চিৎকার করে উঠল অন্য মাসাইরা। তারপর আর ম্যাকুইনার নির্দেশের অপেক্ষা না-করে অদৃশ্য শত্রুকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করল। ম্যাকুইনাও রিভলবার চালাতে লাগলেন। নীচের অন্ধকারে আবার ঢাক বাজতে শুরু করল। মেশিনগানের আওয়াজ, রাইফেলের শব্দ, মাসাইদের আর্তনাদ, ঢাকের বাজনা, এসব মিলিয়ে নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হল। সুদীপ্তরা ম্যাকুইনাদের বেশ কিছুটা তফাতে রয়েছে। সামনে বেশ বড়ো একটা ঘাসের ঝোপ থাকায় সম্ভবত অন্ধকারে মিশে থাকা পিগমিদের চোখের আড়ালে রয়েছে সুদীপ্তরা। কারণ তাদের দিকে তির আসছে না। কিন্তু যে কোনও সময় তারাও বিপদে পড়ে যেতে পারে।

হেরম্যান হঠাৎ চাপা স্বরে বললেন, 'এই সুযোগ! ম্যাকুইনা আর মাসাইরা পিগমিদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের এবার পালাতে হবে। পিগমি আর ম্যাকুইনা উভয়ের হাত থেকেই বাঁচতে হবে আমাদের।'

টোগো বলল, 'হ্যাঁ, এ সুযোগ আর আসবে না। তবে তাঁবু এখানে ফেলে যেতে হবে। যে ঢাল বেয়ে আমরা উঠে এসেছি সে পথেই পালাব আমরা। আফ্রিকান্ডার এই মুহূর্তে আমাদের পিছু ধাওয়া করতে পারবে না। তবে তার আগে ওটুম্বাকে মুক্ত করতে হবে।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ।' তারপর পিছনের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'পিছনে কেউ নেই

ঠিকই, কিন্তু যে মেশিনগান চালাচ্ছে সে ওপর থেকে দেখে নিতে পারে আমাদের। একবার সে নলের মুখ আমাদের দিকে ঘোরালেই তো আমরা মুহূর্তের মধ্যে সাবাড় হয়ে যাব।'

টোগো একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তাহলে একটা কাজ করা যাক। মেশিনগানের গুলি থেকে মাথা বাঁচিয়ে আমরা আগে তাঁবুর কাছে যাই। তারপর আপনি সেখানে পৌঁছে আস্কারি আর কুলিদের নিয়ে এগোবেন উলটো দিকের ঢাল বেয়ে নীচে নামার জন্য। আমি দাঁড়িয়ে পাহারা দেব। যে মেশিনগান চালাচ্ছে বা অন্য কেউ আপনাদের দিকে গুলি চালালে তাকে রোখার জন্য। আর এই সাহেব যাবেন আফ্রিকান্ডারের তাঁবুর পিছনে ওটুম্বার দড়ি কাটার জন্য। ওদিকের কথা এখন আর খেয়াল নেই। সাহেব দড়ি কেটে ফিরে এলে আমরা দু-জনও নীচে নামার পথ ধরব। কি আপনি পারবেন তো?' এই বলে তাকাল সুদীপ্তর দিকে।

সুদীপ্ত বলল, 'হ্যাঁ, পারব।'

এরপর আর সময় নষ্ট করল না কেউ। মেশিনগানের গুলি থেকে মাথা বাঁচিয়ে হামা দিয়ে আস্কারিদের সঙ্গে নিয়ে তারা এগোতে লাগলেন তাঁবুর দিকে। কেউ তাদের খেয়াল করল না। পিছনে চলতে লাগল লড়াই আর বীভৎস চিৎকার চেঁচামেচি। ঢাকের শব্দ যেন ক্রমশই ওপরে উঠে আসছে। তারা উপরে উঠে এলে কেউই আর বাঁচবে না।

সবার অলক্ষ্যে সুদীপ্তরা পৌঁছে গেল তাঁবুর কাছে। তাঁবু থেকে গুলি-বারুদ-অস্ত্র আর সামান্য কিছু খাবার তুলে নিয়ে কুলি আর আস্কারিদের সঙ্গে হেরম্যান দ্রুত এগোলেন পাহাড়ের উলটোদিকের ঢালের উদ্দেশে। যাবার আগে সুদীপ্তকে তিনি বললেন, 'তুমি পারবে তো? নইলে আমি ওটুম্বার কাছে যাচ্ছি, তুমি ওদের নিয়ে যাও।'

সুদীপ্ত বললেন, 'না, আপনি এগোন। আমি এখনই কাজ সেরে টোগোকে নিয়ে আপনার পিছনে যাচ্ছি।'

টোগো সুদীপ্তর হাতে একটা লম্বা ছুরি তুলে দিল। হেরম্যান এগোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ্তও পা বাড়াল ম্যাকুইনার তাঁবুর দিকে। রাইফেল হাতে চারপাশে নজর রাখতে লাগল টোগো।

ইতিমধ্যে আর ক-জন মাসাই পড়ে গেছে পিগমিদের বিষাক্ত তিরে। বাদবাকিদের নিয়ে ম্যাকুইনা লড়ছেন অদৃশ্য শত্রুর সাথে; কোনওদিকে তাঁর খেয়াল নেই। সুদীপ্ত দ্রুত পৌঁছে গেল ম্যাকুইনার তাঁবুর কাছে। তারপর তাঁবুটাকে বেড় দিয়ে পৌঁছে গেল সেই গাছটার কাছে। ওটুম্বা তাকাল সুদীপ্তর দিকে। এরপর সুদীপ্তর হাতে ছুরি দেখে আতঙ্কে সে চিৎকার করে উঠল। সুদীপ্ত তার ভাষা জানে না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করতে ইশারা করল। ওটুম্বা থামল ঠিকই, কিন্তু সুদীপ্ত তার দিকে পা বাড়াতেইসে আবার চিৎকার করে উঠল। ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল তার দড়ির বাঁধন। সুদীপ্তকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। না করাটাই স্বাভাবিক। সুদীপ্ত আরও একবার থমকে দাঁড়াল। কিন্তু আর অপেক্ষা করা যাবে না। ওটুম্বার চিৎকার কানে যেতে পারে ম্যাকুইনাদের। কাজেই সুদীপ্ত আর দেরি না করে ওটুম্বার একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটা আর্ত চিৎকার করে প্রচণ্ড আতঙ্কে চোখ বন্ধ করল ওটুম্বা। রজ্জুবদ্ধ শরীরটা কাঁপতে লাগল। সুদীপ্ত কাটতে লাগল দড়ি। খুব বেশি হলে আধ মিনিট সময় লাগল সুদীপ্তর কাজ সারতে। দড়ির বাঁধন খসে পড়তেই আবার চোখ খুলল ওটুম্বা। বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে তাকে সে কী যেন বলতে শুরু করল। সে কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার ভাব স্পষ্ট। সুদীপ্ত কিছুই বুঝতে পারছে না তার কথা। কিন্তু কথা বলতে বলতেই হঠাৎ তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। চিৎকার করে সুদীপ্তর উদ্দেশে কী একটা বলে একটা লাফ দিয়ে তিরের বেগে সে ছুটল পিছনের জঙ্গলের দিকে। আর ঠিক সেইসময় পিছনে মৃদু শব্দ। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আকালা। চোখে তার হিংস্র দৃষ্টি। আগুনের লাল আভা তার কাটা দাগওয়ালা মুখটাকে আরও বীভৎস করে তুলেছে। যেন মূর্তিমান এক শয়তান দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

তাকে দেখেই সুদীপ্ত কোমরের রিভলভারের দিকে হাত বাড়াতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। আকালা তার রাইফেলের কুঁদো দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল সুদীপ্তর মাথায়। সুদীপ্তর চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন মুহূর্তের মধ্যে পাক খেয়ে উঠল। কেউ যেন একটা কালো পর্দা ঢেকে দিল তার চোখে। যেন মূর্তিমান কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গেল সুদীপ্ত।

সুদীপ্তর যখন প্রথমবার জ্ঞান ফিরল তখন সে বুঝতে পারল না সে কোথায় আছে। চোখের সামনে যেন আবছা পর্দা একটা তখনও আছে। পাশ ফিরতে গিয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল সে। অসহ্য যন্ত্রণা তার মাথায়। আস্তে আস্তে একটা হাত সে মাথায় দিল। সারা মাথা চটচট করছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকার পর তার দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল। সুদীপ্ত দেখল সে একটা তাঁবুর মধ্যে পড়ে আছে। বাইরে মনে হয় দিন। তাঁবুর ক্যাম্বিসের ফাঁক দিয়ে মৃদু আলো ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে কীসের যেন শব্দ হচ্ছে বাইরে। সুদীপ্ত মাথা থেকে হাতটা চোখের সামনে আনল চটচটে জিনিসটা কী তা দেখবার জন্য। হাতটা দেখার পরই চমকে উঠল সে—রক্ত!

কিন্তু রক্ত কেন? আর এর পরমুহূর্তে সব কথা মনে পড়ে গেল। অতি কষ্টে পাশ ফিরতেই চোখে পড়ল তাঁবুর মধ্যে রাখা কাঠের প্যাকিং বাক্সগুলো। তাঁবুটা চিনতে পারল সুদীপ্ত—এ তাঁবু ম্যাকুইনার! কিন্তু টোগো, হেরম্যান—এরা সব কোথায় গেলেন? তারা কি তাকে ফেলে পালাল? সে কি ম্যাকুইনার হাতে বন্দি? না-কি পিগমিরা দখল করেছে ম্যাকুইনার তাঁবু? কিন্তু লড়াই তো এখনও চলছে। বাইরে মাঝে মাঝে যে শব্দটা হচ্ছে ওটাতো মেশিনগানের শব্দ! এসব চিন্তা করে সুদীপ্ত বসতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় তাঁবুর পর্দা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল ম্যাকুইনা, আর তার পিছনে একটা মোটা দড়ি হাতে আকালা।

শুয়েই রইল সুদীপ্ত। ম্যাকুইনা একদম তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পোশাক ঘামে ভিজে আছে। চেহারায় পরিশ্রমের ছাপ স্পষ্ট। মুখ গম্ভীর। সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'জ্ঞান ফিরেছে দেখছি। এবার কী করবেন আপনি? আপনার সঙ্গীরা তো সব আপনাকে ফেলে পালাল!'

সুদীপ্ত তাঁর কথায় কোনও জবাব দিল না।

ম্যাকুইনা আকালাকে বললেন, 'বেঁধে ফেল ওকে।'

আকালা এগিয়ে এল। সুদীপ্ত বুঝল তাকে বাধা দিয়ে কোনও লাভ হবে না। সে এখন সম্পূর্ণ ম্যাকুইনার কবজায়। ম্যাকুইনার ইচ্ছার ওপর তার জীবন নির্ভর করছে। সুদীপ্তর পাশে বসে মোটা দড়ি দিয়ে ঝটপট তার হাত-পা বেঁধে আকালা উঠে দাঁড়াল।

ম্যাকুইনা এবার সুদীপ্তর উদ্দেশে বললেন, 'আপনি ওটুম্বাকে ছেড়ে দিয়ে আমার যে ক্ষতি করেছেন তার খেসারত আপনাকে দিতে হবে। ওটুম্বার লোকজন আমার বারো জন লোককে শেষ করেছে। পিগমিরা সব গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ওরা কেউ বাঁচবে না। সবাইকে শেষ করব আমি।'

সুদীপ্ত এবার মুখ খুলল, 'সবাইকে শেষ করে আপনারাও কি বাঁচবেন?'

ম্যাকুইনা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে নিঃশব্দে হাসলেন। এরপর ট্রাউজারের ডানপাশের পায়ের কাপড়টা একটু টেনে তুলতেই সুদীপ্তর চোখে পড়ল তাঁর হাঁটুর নীচে ইঞ্চিখানেক একটা ক্ষতচিহ্ন! সেটা দেখিয়ে ম্যাকুইনা বললেন, 'পিগমিদের তিরের চিহ্ন! ওদের তির আমার কিছু করতে পারবে না।'

এরপর তিনি পকেট থেকে একটা তরলপূর্ণ ছোট্ট শিশি আর সিরিঞ্জ বার করে সুদীপ্তকে দেখিয়ে বললেন, 'এই অ্যান্টিডোট আমার নেওয়া আছে। পিগমিদের বিষ কাজ করবে না আমার শরীরে। তবে মেশিনগান-রাইফেলের কোনও অ্যান্টিডোট নেই পিগমিদের কাছে।'

এই বলে জিনিস দুটো পকেটে ভরে রেখে বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'তবে আপনারও চিন্তা নেই। আপনি বাঁচবেন, আপনাকে আমি প্রাণে মারব না। ওটুম্বার ওপর ব্যবহার করা না গেলেও জাঞ্জিবার নাইফটা আপনার ওপর ব্যবহার করব আমি। শুধু আপনার আঙুলগুলো কেটে দেব আমি। আজ সন্ধ্যায় কাজটা সেরে ফেলব, তারপর আপনাকে বনে ছেড়ে দেব। এখানে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াবেন।'

সুদীপ্ত এবার চিৎকার করে উঠল, 'শয়তান।' তার চিৎকার ঢাকা পড়ে গেল ম্যাকুইনার অট্টহাস্যে। হাসতে হাসতে ম্যাকুইনা আকালাকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

তারা চলে যাবার পর একইভাবে শুয়ে রইল সুদীপ্ত। হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা, উঠে বসার ক্ষমতা নেই। কান খাড়া করে সে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল বাইরে কী ঘটছে। মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট কথাবার্তা ভেসে আসছে বাইরে থেকে। কোনও কোনও সময় আবার কেউ হেঁটে চলে যাচ্ছে তাঁবুর পাশ দিয়ে। ছায়া পড়ছে তাঁবুতে। অর্থাৎ তাঁবুর কাছাকাছি বা পাহাড়ের ওপর কোনও লড়াই নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে মেশিনগানের র‍্যাট্-র‍্যাট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে কেন? ঠিক বুঝতে পারল না সুদীপ্ত। সময় এগিয়ে চলল। তাঁবুর মধ্যে অসহায়ভাবে পড়ে রইল সে। একসময় অবসাদ আর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। তাঁবুর বাইরে আফ্রিকার সূর্য তখন মধ্যগগনে।

ছবি: সুদীপ্ত দত্ত

(চলবে)

বকুল ফুলের গাছ

ভবানীপ্রসাদ দে

'কী গাছের চারা নেবে ভাই? শাল, সেগুন, মেহগনি, শিশু. শিরীষ?'

'ফুলগাছের চারা নেই?'

'নেই আবার! কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, বকুল, জারুল, অশোক। তিনটে বছর যেতে দাও, গাছের ডাল ফুলে ফুলে ভরে যাবে।'

'টবে লাগাবার মতো ফুলগাছ নেই?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না, নেই। তোমরা ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকো বুঝি?'

ঋজু হেসে ফেলল। বলল, 'আমরা যে-বাড়িতে থাকি, সেখানে ওসব বড়ো গাছ লাগানোর জায়গা নেই।'

তিতলি বলল, 'একফালি উঠোনের দু-দিকে বারো ঘর লোক। উঠোনে গাছ লাগালেই কুরুক্ষেত্তর বেধে যাবে। চল রে ঋজু!'

টানা দু-দিন ধরে কী বৃষ্টিই না হল! সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া। উলটোডাঙার ভিতরপাড়ার বারো ঘর এক উঠোনের সেই বাড়ির দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষজন অনেকেই কাজে যেতে পারিননি, তাই মনখারাপ তাঁদের। ছেলেমেয়েরা অবিশ্যি খুশি, স্কুলে রেনি ডে। তিন দিনের দিন বৃষ্টি থামলে ঋজুর মা ঋজুর হাতে থলে দিয়ে বললেন, 'বলাই সাহার দোকানে যা, খাতায় লিখিয়ে এক কিলো চাল আর হাফ কিলো আলু নিয়ে আয়। এক বাক্সো দেশলাইও নিস। বলিস বাবা এসে দাম দিয়ে দেবে।'

তিতলির মা বললেন, 'দাঁড়া ঋজু, তিতলিও যাবে তোর সঙ্গে। আমাদেরও চাল আর ডাল বাড়ন্ত। স্টোভের তেল পর্যন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে।'

ঋজুর বাবা লরি চালান। মালবোঝাই লরি নিয়ে রায়গঞ্জ গিয়েছেন, ফিরতে এখনও দিন দুয়েক লাগবে। ঋজুদের পাশের ঘরে থাকে তিতলিরা। তিতলির বাবা মারা গিয়েছেন চার বছর আগে। তিতলির মা তাঁদের ঘরের কোলে একচিলতে ঘেরা বারান্দায় সেলাইমেশিনে সারাদিন হাতিবাগান বাজারের দরজির দোকানের জন্যে জামা-প্যান্ট সেলাই করেন। পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে তিতলিও তাঁকে সাহায্য করে।

তিতলিদের ঘরের উলটোদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ কৃষ্ণকিংকর। বললেন, 'অপু-দুগ্‌গা বাজার যাচ্ছিস বুঝি? আমাদের জন্যে পাঁচশো গ্রাম আটা আর দু-টাকার নুন আনিস। এই নে অপু, টাকাটা যত্ন করে পকেটে রাখ, পড়ে না যায়।'

শহরতলির গ্রামে গ্রামে বই ফিরি করেন কৃষ্ণকিংকর— ছোটোদের রামায়ণ, মহাভারত, টুনটুনির বই, গৃহস্থের বান্ধব, নিজে নিজে ম্যাজিক শেখার বই, লালন ফকিরের গান, রবীন্দ্রসংগীত আর নজরুলগীতির অল্প দামের বই। তিনি ঋজু আর তিতলিকে বলেন অপু-দুগ্‌গা। ঋজুর বয়েস বারো আর তিতলির এগারো, সত্যি যেন অপু-দুগ্‌গা। সেই বাড়ির বেশির ভাগ মানুষই জানেন না অপু-দুগ্‌গা ব্যাপারটা কী। কৃষ্ণকিংকর মাঝে মাঝে ঋজু-তিতলিদের গল্প বলেন— এভারেস্ট জয়ের গল্প, চাঁদে মানুষ যাওয়ার গল্প, সুধা চন্দ্রনের গল্প, রাজেন মুখুজ্যে আর চারলি চ্যাপলিনের গল্প। বিবেকানন্দ, পি.সি. রায়, সুভাষ বসুদের গল্প তো আছেই। ঋজু, তিতলি আর তাদের বন্ধুরা অবাক হয়ে শোনে তাঁর কথা।

বৃষ্টি থামতেই পাড়ার লোকজন পথে বেরিয়ে পড়েছে। পাড়ার ভিতরের পথে খানাখন্দয় জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে কেউ কেউ জোরে সাইকেল আর মোটরসাইকেল ছোটাচ্ছে। নোংরা জলকাদা ছিটকে উঠে তিতলি আর ঋজুর গায়ে এসে পড়ছে। বাজারের থলে আর কেরোসিন তেলের

পাত্র নিয়ে তারা যাচ্ছে বাজারপাড়ায় চেনা দোকানে। চাল ডাল আলু পেঁয়াজের দাম পাড়ার দোকানের চেয়ে কিলোগ্রামপিছু এক টাকা দু-টাকা কম কিনা সেখানে, তাই।

তারাপদ সরকার লেন যেখানে এসে বড়োরাস্তায় পড়েছে, সেখানে একটা পার্ক। পার্কের মাটি ভিজে, জায়গায় জায়গায় জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পার্কের ভিতর একটা তাঁবু। তাঁবুর সামনে কয়েকজন লোক পিছনে পিছনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে গেলেও তাঁদের কারও কারও মাথায় এখনও খোলা ছাতা।

তিতলি বলল, 'ওখানে কী হচ্ছে রে?'

ঋজু বলল, 'জানি না। চল তো, দেখি গিয়ে।'

তাঁবু খাটিয়েছেন সরকারি বন-বিভাগের লোকজন। হরেকরকম গাছের চারা বিলি করছেন তাঁরা। সেসব গাছ সময়কালে বড়ো হবে, কোনওটা ফল দেবে, কোনওটা ফুল দেবে, আবার কোনওটা বুড়ো হয়ে শুকিয়ে গেলে ভালো কাঠ পাওয়া যাবে। এ-অঞ্চলের অনেক বাড়িতে এখনও ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে। সেখানে বসাবেন বলে চারাগাছ চেয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কেউ কেউ। তাঁবুর সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল ঋজু আর তিতলি। পায়ে পায়ে তাঁবুর সামনে এসে তারা জানতে পারল টবে লাগানোর মতো ফুলগাছ পাওয়া যায় না সেখানে। ভারী মনখারাপ হয়ে গেল তাদের। বাজারপাড়া থেকে জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফিরে এল তারা।

'তিতলি, এই তিতলি!'

শনিবার দুপুরে স্কুলের ছুটির পর বাড়ির দরজা থেকেই চিৎকার করতে করতে বাড়ি ঢুকল ঋজু। তার গলা শুনে তাদের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি তার মা বেরিয়ে এলেন, তিতলিদের ঘর থেকে তিতলি আর তার মা। ঋজুর হাতে একটা গাছের ডাল। হাত খানেক লম্বা সরু ডালটার দুটো মাথাই ছাঁটা আর দুটো গাঁটে সবসুদ্ধ গোটা পাঁচেক পাতা।

তিতলি বলল, 'ওটা আবার কী গাছের ডাল?'

পিঠ থেকে বইয়ের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে ঋজু বলল, 'কাগজফুলের গাছ। টবে লাগাব।'

তিতলি বলল, 'কোথায় পেলি রে?'

ঋজুর মা বললেন, 'কারও বাগান থেকে না বলে

ছিঁড়ে অনিসনি তো?'

ঋজু বলল, 'কুণ্ডুবাবুদের বাগানবাড়ির জায়গায় ছ-তলা বাড়ি উঠবে। বাগানের সব গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। সেখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলাম। রাজমিস্ত্রিরা গর্ত খুঁড়ছে। ফুটো ডেকচিটা দাও মা, মাটি চেয়ে আনি।'

ঘরে তক্তপোশের তলায় নানা জিনিসের সঙ্গে তলা ফুটো হয়ে যাওয়া পুরোনো একটা ছোটো অ্যালুমিনিয়ম ডেকচি আছে। পুরোনো জিনিসপত্র কেনার জন্যে মাঝে মাঝে পাড়ায় একজন লোক আসে, গলিতে গলিতে হাঁক দিয়ে যায়। এবার লোকটা এলে তাকে ডেকচিটা আর কিছু টাকা দিয়ে অ্যালুমিনিয়মের একটা নতুন হাঁড়ি নেবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন ঋজুর মা। ঋজু নিজেই তক্তপোশের তলায় ঢুকে ডেকচিটা বের করে আনল। মা বললেন, 'আজ তো শনিবার, ইস্কুলে মিড-ডে মিল দেয়নি। খিদে পেয়েছে, খেয়ে যা।'

ঋজু বলল, 'আগে গাছের জন্যে মাটি নিয়ে আসি। পরে খাব এখন।'

ঋজু-তিতলিদের বাড়িতে ঢোকার দরজার পাল্লা দুটো অনেকদিন আগেই উধাও হয়ে গিয়েছে। রাস্তার কুকুর বিড়াল ঢুকে পড়ে বাড়ির উঠোনে। খালের ধারের গোয়ালাদের একটা গরু একবার সেই বাড়ির উঠোনে ঢুকে তুলসীগাছ খেয়ে ফেলছিল। তাই কাগজফুল গাছের ডাল সমেত মাটি ভরতি ডেকচিটার জায়গা হল ঋজুদের ঘরের কোলে ঘেরা বারান্দার এক কোণে।

ঋজুর মা বললেন, 'ডেকচির এইটুকু মাটিতে এ-গাছ বাঁচবে নাকি?'

বাবা বললেন, 'এখনকার মতো থাকুক -না। ক-দিনেই শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাবে।'

ঋজু আর তিতলির যত্নআত্তিতে কাগজফুলের গাছের ডালটা কিন্তু বেঁচে রইল আর তার গায়ে আরও কয়েকটা পাতা গজাল। ঋজু সকালে বিকেলে গাছের গোড়ায় জল দেয়। তিতলির সকালে স্কুল আর ঋজুর স্কুল দুপুরে। দুপুরবেলা ঋজু যখন স্কুলে থাকে, তিতলি তখন বার কয়েক এসে গাছটা দেখে যায়। গাছটা বাড়তে লাগল খুব ধীরে ধীরে। আরও কিছুদিন পর সেটার দুটো গাঁট থেকে দুটো ডাল বের হল। ক্রমে গাছটা আরও একটু লম্বা হল, মাথাটা বাড়িয়ে দিল বাইরের আলোর দিকে। একদিন সকালে ঋজু আর তিতলি আবিষ্কার করল গাছের ডালদুটোয় লাল রঙের খুদে খুদে কয়েকটা কুঁড়ি ধরছে।

বারো ঘর লোককে অবাক করে দিয়ে একদিন সেই কুঁড়িগুলো থেকে সাত-আটটা ফুল ফুটল। ফুলের পাপড়িগুলো দেখে মনে হয় ফিনফিনে পাতলা লাল কাগজ দিয়ে তৈরি। ফুল তো নয়, যেন ছোটো ছোটো লাল প্রজাপতি, এই বুঝি ডানা মেলে উড়ে যাবে।

এ-বাড়ির বাসিন্দাদের কাছে এ-এক নতুন ঘটনা। উঠোন দিয়ে যেতে-আসতে তাঁরা একনজর দাঁড়িয়ে ঋজুর গাছের ফুল দেখে যাচ্ছেন। বাবা বললেন, 'এ-গাছ একদিন ডালপালা মেলে বড়ো হবে, লতিয়ে পড়বে। তখন কী করবি?'

ঋজু বলল, 'গাছের লতানো ডগাটাকে বারান্দার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ওপরের দিকে তুলে দেব। গাছটা বাড়তে বাড়তে এক সময় একতলা ছাড়িয়ে দোতলার জানলার গরাদ ধরে ঝুলতে থাকবে। ফুলে ভরা ডালগুলো তখন হাওয়ায় কেমন দোল খাবে!'

তিতলি উপরের দিকে তাকাল। তাদের সেই একতলা বাড়ির ঘরগুলোর মাথায় লম্বা টালির চাল। তার উপরে বসে তিনটে শালিক কিচিরমিচির করছে। সত্যি, ঋজুটা কী গল্পই না বানাতে পারে!

বাবা হেসে ফেললেন। বললেন, 'লোকে রাতে ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখে। তুই দেখছি দিনমানে জেগে জেগে স্বপন দেখছিস।'

ঋজু বলল, 'বাবা, আমি অনেক লেখাপড়া শিখব, ডাক্তার হব, ইঞ্জিনিয়ার হব, নয়তো বড়ো অফিসার হব, লালবাতি লাগানো গাড়িতে চড়ব। আমরা তখন কি আর এ-বাড়িতে থাকব নাকি?'

এরই মাঝে একসময় কৃষ্ণকিংকর এসে দাঁড়িয়েছেন, বাবা আর ছেলের পিছনে। ঋজুর বাবাকে তিনি বললেন, 'ওকে স্বপ্ন দেখতে দাও হে! একদিন দেখবে স্বপ্নটা কখন সত্যি হয়ে গিয়েছে।'

ছবি: রাহুল মজুমদার

ইলিশ ইলিশ

পঙ্কজ সাহা

জলের মধ্যে ইলিবিলি ওটা কী ঝলকালো?
একটা নদী সাঁতরে যেন ঝিলিক মারে আলো।
উঠল জালে রূপো,
বললে দেখি মাপো।
কী মাপবো কী মাপবো রূপো বন্দী জালে,
রূপো নয়রে রূপো নয় রে ইলিশ ঝলকালে।

টুংটাং

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলগাল পুতুলটি নাড়া দিলে পরে
হেলেদুলে কী মিষ্টি টুংটাং করে।
বড়ো বড়ো গোল চোখ, নীল দুটি তারা,
টুকটুকে লাল দেহে আলোর ইশারা।
এইট-এ তখন পড়ি, দিদি পড়ে টেন-এ
ছোটোমাসি দিয়েছিল মেলা থেকে এনে।
দিদি মজা পেয়ে দিল টুংটাং নাম,
যত্নে শো-কেসে তাকে তুলে রাখলাম।

টুংটাং করে আজও সে-পুতুল নাচে।
দিদি আর ছোটোমাসি ছবি হয়ে আছে।
আমায় সে রোজ যেন বলে কানে কানে
আজই কাজ সারো, কাল কী হবে কে জানে!

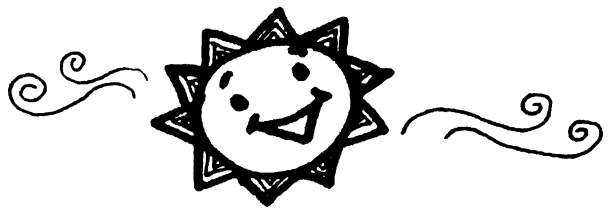

কথা ছিলো

দীপঙ্কর বিশ্বাস

কথাছিলো সব জল ঝরলে
গাছে গাছে শিউলিরা ফুটবে
নীল গোল আকাশের প্রান্তে
আলো ভরা সূর্যটা উঠবে।

কথাছিলো দীঘি জলে ভরলে
সারে সারে হাঁস সব চরবে
কথাছিলো পুজো পুজো গন্ধে
বাংলার মাঠ ঘাট ভরবে।

কথাছিলো হাওয়া এসে দুলবে
প্রান্তের দুধসাদা কাশেতে
স্বপ্নেরা তারা হয়ে ফুটবে
শরতের সোনামাখা মাসেতে।

কথাছিলো কথা আছে থাকবে
পুজো এসে এভাবেই ডাকবে
কবেকার কৈশোর-স্মৃতিকে
এভাবেই রঙে ভরে রাখবে।

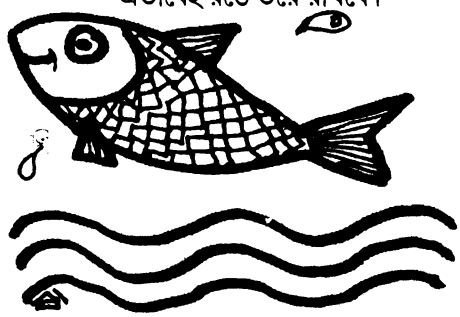

ছবি: রাহুল মজুমদার

ভালো ভূতেদের গল্প

ঈশা দাশগুপ্ত

সে এক ছোট্ট মেয়ে ছিল, তোমাদের মতো কিংবা তোমাদের থেকে ছোটোই হবে, বছর ছয় বয়েস। কিন্তু তোমাদের মতো আলো ঝলমল রাস্তার ধারে টিভি গম্‌গম্‌ করা ছোট্ট ফ্ল্যাটে সে থাকত না। কোথায় থাকত সে? তার নিজের কথায়: 'আমার ছোটবেলাটি কেটেছিল পাহাড়ের বুকে, ছোট্ট নদীর কলধ্বনিতে ঝরণার ঝরঝর শব্দে বর্ষার প্রচণ্ড বরিষণে, গ্রীষ্মের মিষ্টি রোদে, শীতের বরফজমা স্পর্শে দিনরাত অবিরাম সরল গাছের শোঁ-শোঁ শব্দের মধ্যিখানে জন্তু-জানোয়ার, পাখি, প্রজাপতি, পোকামাকড় পরিবেষ্টিত হয়ে তারা আমার মনের পটে যে দাগ রেখে গিয়েছিল, কোনও মানুষের প্রভাবের চাইতে সে কম নয়।'

তবে শুধু সুন্দরই ছিল না সবকিছু। তোমাদেরই কি চারপাশে সবকিছু ভালো? কোনও ভীষণ দুষ্টু বন্ধু নেই, বা মোটা পালোয়ান বড়ো ক্লাসের দাদা? কিংবা বদরাগী দিদিমণি বা ভীষণ কড়া বাবা? মায়েরা সবসময় বেজায় ভালো মানুষ। কিন্তু বাবারা? পান থেকে চুন খসলেই ভীষণ কড়া! ওই ছোট্ট মেয়েটির বাবাও ছিল ঠিক তেমনই: 'নিরাপদ নিশ্চিন্ত সুখে ছোটবেলাটি কাটলেও বাবা বেজায় কড়া ছিলেন। তাঁর মনে কোনও সন্দেহই ছিল না যে ছেলেপিলেকে কষে না পেটালে তারা মানুষ হয় না। আমাদের জন্য বাবা সম্ভবত সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কথার এতটুকু নড়চড় হলেই এমনি এক হুঙ্কার দিতেন যে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা।'

বেশ চেনা চেনা, কী বলো? সেই সুনীল গাঙ্গুলীর ছড়াটার মতন। 'মায়েরা সব মায়ের মত বাবারা সব বাবাই।'

গল্প শুনতে ছোটো থেকেই ভালোবাসত মেয়েটি। 'গল্প বলার লোকের অভাব ছিল না আমাদের। অবিশ্যি বেশিরভাগ বলত আমাদের খাসিয়া ঝি'রা। ভয়াবহ সব গল্প—যদি নায়ককে বাঘ না খেত, কি কাত্তুরে না তীর মারত, তাহলে অপদেবতারা পিছু নিত, নিদেন হতাশ হয়ে তারা আত্মহত্যা করত।'

মনে রয়ে গেল কিছু দুঃখের ঘটনাও। একবার তারা চেরাপুঞ্জিতে বেড়াতে গেছিল। সেখানে এক বড়ো ভূমিকম্প হয়েছিল, সবাই পালাচ্ছিল। তখন একটি ছোট্ট মেয়ে মা কোথায় খুঁজতে বাড়ি ঢোকে আর তক্ষুনি বাড়ি ভেঙে পড়ে। মা কিন্তু বাইরে ছিলেন। এই ঘটনা অনেকদিন কাঁদিয়েছিল স্পর্শকাতর মেয়েটিকে।

ছোটোবেলার ঘটনা কিংবা গল্প কেউ ভোলে না জানো। এই যে আমরা বড়ো হয়েছি, কত দরকারি কথা ভুলে যাই। কিন্তু ছোটোবেলার কত ছোটো কথা মনে থাকে। তাই এই ছোট্ট মেয়েটি যখন বড়ো হয়ে মস্ত লেখিকা হয়ে উঠল, বেশ নামডাক হল, তখনও তার মধ্যে রয়ে গেল বোধহয় সেইসব গল্প—'আমরা বিকট গল্প শুনতে বেজায় ভালো বাসতাম।'

কিন্তু তার কলমের জাদুতে সেই খাসিয়া অপদেবতারা যেন তার পাহাড়ের ছোটোবেলার মতো দুষ্টুমিষ্টি রূপ নিল। এমনকী ভূতের মতো যে ভয়ংকর বস্তু যারা অন্য বইতে দাঁত খিঁচিয়ে, চোখ লাল করে রক্ত খেতে আসে তারা হয়ে গেল ভীষণ বন্ধু, সব মুশকিলের আসান। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে পড়বে চলো আমার সঙ্গে লীলা মজুমদারের ভূতের গল্প। ঠিক ধরেছ, সেদিনের সেই পাহাড়ের কোলে বড়ো হওয়া ছোট্ট মেয়েটিই পরবর্তীকালে বিখ্যাত লেখিকা লীলা মজুমদার। তাঁর জন্ম ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮, কলকাতায়। জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়িতে। বাবা প্রমদারঞ্জন রায়, যাঁর কথা একটু আগেই লেখিকার নিজের আত্মজীবনী 'পাকদণ্ডী' থেকে তুলে দিলাম। বুঝতেই পারছ, লেখালেখি ছিল তাঁর রক্তে। বিশেষত উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রভাব লীলা মজুমদারের নিজের কথাতেই স্পষ্ট, '...আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল, আমাদের

ওপর যাঁর প্রভাব ছিল সুদীর্ঘ ও সুদূরপ্রসারী। সে হল উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশ পত্রিকা প্রকাশ। ১লা বৈশাখ, ১৩২০ ওই যে জ্যাঠামশাই 'সন্দেশ' ঢুকিয়ে দিলেন আমাদের জীবনে, আমার মনে হয় কালে কালে ও-ই আমাকে আমাকে যতখানি প্রভাবিত করেছিল, তেমন আর কিছু নয়।'

বড়দা সুকুমার রায়ের প্রভাবও অনস্বীকার্য।

'কী উচ্ছল প্রাণশক্তি ছিল মানুষটার। যেখানেই যেতেন সঙ্গে করে একটা আনন্দের ঝড় নিয়ে যেতেন। আমি ভাবতাম, এই আশ্চর্য মানুষের স্নেহছায়ায় আমার লেখকজীবন কাটবে, ইউ রায় অ্যান্ড সন্স থেকে সুন্দর রূপ নিয়ে আমার বইও বেরোবে। আমার কী সৌভাগ্য! সেসব কিছুই হয়নি অবিশ্যি। তবু বড়দা আমার হাতে খড়ি দিয়ে গেছিলেন।'

সন্দেশের জন্য তাঁর প্রথম লেখা এমনকী গল্পের ছবিও আঁকা। প্রথম ছোটোদের বই—'বদ্যিনাথের বড়ি', প্রথম বড়োদের উপন্যাস—'শ্রীমতী'। কুড়ি বছর ধরে 'সন্দেশ' যুগ্ম-সম্পাদনা করেছেন। আমরা কিন্তু শুধু তাঁর ভূতের গল্পগুলোই পড়ব। তেনারা আমার খুব প্রিয়, দেখি তোমাদের ভালো লাগে কি না!

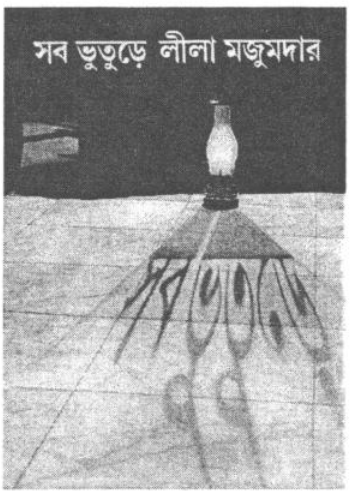

প্রথমেই যাই চলো 'পেনেটিতে'। ক্লাস নাইনে পড়ে এক ছেলে, তার বড়োমামা ভূতের উপদ্রব জেনেও গঙ্গার ধারে এক বাড়ি কিনেছেন। ছেলেটির মা-বাবা বদলি হয়ে গেছেন, একা একা বড়োমামার বাড়িতে থাকে। মন ভালো নেই এমনিতেই, তার উপর আবার ক্লাসের তিন মস্তানের শত্রুতা। তিনজন লোকের সঙ্গে ভাব হয়েছে, ওই বাড়ির ধারেপাশে থাকে। বুড়ো লোক শিবু আর তার দুই ভাইপো 'সিজি' আর 'গুজি'। বেশ ভালো লোক, ফাঁকা বাড়িতে যাতে একা ছেলে ভয় না পায় তাই এসে কত গল্প করে। শুধু লোকজনের সামনে যায় না এই যা। তিনটে সাদা চাদর নিয়ে শিবু, সিজি, গুজি ভূত সেজে জব্দ করবে স্কুলের তিন মস্তানকে। এমনটাই প্ল্যান হল। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ওঁ-ওঁ শব্দে ভূতের নকল। যেই না তাদের ধরতে গেল মস্তানেরা—অমনি ঝুর-ঝুর করে উবে গেল হাওয়ায়। শুধু চাদর তিনটি পড়ে রইল। কত বন্ধু ছিল তারা, কোথায় উবে গেল কে জানে!

'আহিরিটোলার বাড়িতে' কিন্তু অন্য ছেলেটির ভারী লাভ হয়েছিল। প্রিটেস্ট-এ অঙ্কে পনেরো পেয়ে, বাবার বকুনি খেয়ে, কাপড়জামার পুঁটলি কাঁধে পূর্বপুরুষের প্রায় ভেঙে পড়া সেই বিশাল বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। পেটে খিদে, মনে দুঃখ। কিন্তু বাড়ি তো ফাঁকা নয়। সেখানে এক বুড়ো লোক রয়েছেন —নাম শিবুবাবু। পরনে জোব্বা, পায়ে সাদা নাগরাই, মাথায় ছোট্ট সাদা টুপি, আঙুলে আংটি। শিবুবাবুর নাকি কখনও আঁক কষতে ভুল হত না, এমনকী তার জন্য নবাবের কাছ থেকে সার্টিফিকেটও পেয়েছিলেন। তবে লোক খুব ভালো। তার মনের দুঃখ, পেটের খিদে বুঝে পরদেশি বলে এক খানসামাকে ডেকে পাঠালেন। পরদেশি রূপোর থালায় করে লুচি, সন্দেশ, ছানামাখা আর এক গেলাস বাদামের সরবত দিল। সকালবেলায় কুট্টিবাবু এসে এমন আঁক শেখালেন যে কতদিনের না-পারা অঙ্ক জল হয়ে গেল। এমনকী শিবুবাবু মোহরও দিলেন ভালো আঁক কষার পুরস্কার। কিন্তু কী আশ্চর্য, যেই না তাকে খুঁজতে খুঁজতে বাবা মা-রা এসে পৌঁছল আহিরিটোলার বাড়িতে, মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার তকতকে বাড়ি উড়ে গিয়ে খাঁ-খাঁ করতে লাগল। শুধু কি তাই, বাবার কাছে জানা গেল, শিবুবাবু নাকি বাবার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদা, পরদেশি তাঁর খাস খানসামা। সে যাই হোক গে, অঙ্কের ভয় তো কেটে গেল, উপরি পাওনা একটি গোটা মোহর।

এমন উপকারী ভূতদের কি আর ভূত বলতে ইচ্ছে করে? মানুষই, শুধু এখনকার নয়, এই যা! লীলা মজুমদারের গল্পে এ-রকম আরও কতজনই যে আছে! আহিরিটোলার গল্পের প্রিটেস্টের মতনই 'যুগান্তর' গল্পেও হাফ-ইয়ারলিতে ভয়ঙ্কর রেজাল্টের ফলে বাড়িতে টেকা দায় হয়ে উঠল ওরকম আরেকটি ছেলে আর তার বন্ধু গুপীর। তারা দুজনে পালিয়ে মালবোঝাই জাহাজে চড়ে আন্দামান যাবে বলে রাত বারোটা নাগাদ গঙ্গার দিকে রওনা হয়েছে। এমন সময় ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে ঝলমলে এক চার-ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়ার পা থেকে নাল খসে পড়ল। গুপী সেটা কুড়িয়ে দিতেই সামনের নাল মেরামতের জায়গা চেনাবার জন্য দু-জনকেই উঠতে হল

গাড়িতে। গাড়ির লোকটিকে তো থিয়েটার পার্টির রাজা বলেই মনে হয়, এমন তার মখমলের পোশাক, গলায় মুক্তোর মালা, কানে হিরে, গায়ের রংও তেমনি ফরসা। খালি বলছেন, দেরি করলে নাকি নন্দকুমার বলে একজনের প্রাণ যাবে। কিন্তু যতক্ষণে মেরামতির কারখানা পৌঁছল ঘোড়ার গাড়িও উধাও, তার সেই বিশাল নালও আর নেই। চার-ঘোড়া টানা গাড়ি এখন আর হয় নাকি? সেই গাড়ি নাকি আরও অনেকে দেখেছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। ওই রাজা বাহাদুর মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু সময়কালে পৌঁছতে পারেনি।

তবে এমন দেশপ্রেমিক ভূতের জন্য মনখারাপ হয় না? 'শেল্টার' গল্পের ভূতও ওইরকম। যদি সত্যি তাকে ভূত বলো। জায়গাটার নাম বলা বারণ। ভারতের উত্তরপূর্ব কোণের নাকের ডগা। দু-দিকে ভারত, এদিকে বাংলাদেশ, একদিকে ভুটান। আরও ইঙ্গিত আছে। সব পাহাড়ের চেয়ে উঁচু এখানকার পাহাড়, ধরতে পারলে জায়গাটার নাম? ভূগোল বই খুলতে পারবে না কিন্তু। এই গল্পের ছেলেটির নাম অসীম, ষোলো বছর বয়স। আর তোমরা তো জানোই, এ বয়সে সব সময়ই যেন খিদে পায়। আর লীলা মজুমদার খাওয়াতে পারেন কিছু। কবেকার খানসামা পরদেশি লুচি করে খাইয়েছিল। আর এই গল্পে আছে মাসির হাতের ব্রেকফাস্ট—ভুট্টার পরিজ, ঘন লালচে দুধ, বিচিওয়ালা মিষ্টি কলা, টোস্ট, মাখন, ডিম সেদ্ধ, বাড়িতে করা জ্যাম। আসলে লীলা মজুমদারের বাড়িতেও ছিল খুব রান্নার ঘটাপটা। নিজেই লিখেছেন: তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল। শিক্ষিত বাড়ির মেয়েরাও রান্না করবে, পরিবেশন করে সবাইকে খাওয়াবে, এইরকমই সকলে আশা করত। আমাদের বাড়িতেও ওই রকম নিয়ম ছিল। আমার পিসিমার বাড়িতে, মাসিমার বাড়িতে, সব জায়গাতেই তাই।'

এবার বুঝেছ তো, কেন তাঁর গল্পে ভূত বা মানুষ, রান্নার তরিবতিতে কেউ কম যায় না। যাই হোক, যা বলছিলাম—'শেল্টার' নামে গল্পেও অসীম খুঁজে বের করেছিল পাহাড়ের উপরে শেল্টারে লুকিয়ে থাকা এক মানুষভূত বা ভূতমানুষ, নাম বিশু খ্যাপা। সে আসলে ছিল ইংরেজদের স্পাই, কিন্তু কবে থেকে পাহারা দিচ্ছিল এক থলে মোহর, দেশের সম্পত্তি হিসেবে। তবে, ভূতেদের কি বিবেক বলে কিছু থাকতে নেই?

এমনিতে থাকে কি না জানি না, লীলা মজুমদারের গল্পে বিলকুল থাকে। তারা এসে পুরোনো ঋণ শোধ করে দেয়, চুরি করা জিনিস ফেরত দেয়। যেমন ধরা যাক 'পাঠশালা' গল্পের ছ্যাঁচড় আর পণ্ডিতমশাই। আমেরিকায় থাকা মেজদাদুর বন্ধু ছ্যাঁচড় সেই কবে মেজদাদুর বাবার লেজওয়ালা ঘড়ি সারাবে বলে নিয়ে গিয়ে স্রেফ হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এবার যখন আমেরিকা থেকে মেজদাদু গ্রামে এসে পাঠশালা খুলল, ছ্যাঁচড় তার মিস্ত্রিদের নিয়ে শুধু বিনি পয়সায় বাড়ি সারিয়ে দিল না, কোথা থেকে পিসির বিয়েতে হারিয়ে যাওয়া ক্যাশবাক্স ভর্তি যৌতুকের মোহর খুঁজেও দিল। এমনকী পণ্ডিতমশাই, তার ছাত্ররা, এমনকী ছ্যাঁচড়ও আর কোনও দিন এল না। শেষে খবর নিয়ে জানা গেল ছ্যাঁচড় নাকি শেষ বয়সে ভারী ধার্মিক হয়ে গিয়ে বুড়ো পণ্ডিতমশায়ের শিষ্য হয়ে চলে গেছিল হিমালয়ে। শুধু একটাই নাকি শেষ দুঃখ ছিল তার। মেজদাদুর কাছ থেকে নাকি অন্যায়ভাবে কী সব নিয়েছিল, সেটা যেমন করে হোক শোধ করবে।

অথবা 'নাথু' গল্পের নাথুর কথাই ধরা যাক। নাথু আসে হঠাৎ, চলে যায়ও হঠাৎ। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজারে যত দুর্লভ জিনিস, তা সে ডায়াবিটিসের ওষুধ হোক কি দিল্লি যাবার থ্রি টায়ারের টিকিট, সঙ্গে সঙ্গে থলি থেকে বের করে দেয়, তা-ও আবার রিবেটেড্। কিন্তু তাকে যখন সন্দেহবাতিক বড়জেঠি পুলিশে ধরিয়ে দিতে গেল, নাথু নাকি স্রেফ দেয়ালে মিশে গেল, এমনকী থলিও আর পাওয়া গেল না। সবাই বড়জেঠির উপর রেগে গেল, সেই কবেকার পুরোনো ধার শোধ করতেই তো নাথুর আবির্ভাব।

ভূতেদের বিবেক যেমন আছে, দুঃখও আছে তেমনি। অহিদিদির কথাই ধরো না কেন—স্বামী যখন গড়িয়া ছাড়িয়ে এক ভারী নির্জন জায়গায় একটা পোড়ো বাড়িতে থাকতে এলেন, সবাই অবাক হল! তবে এর মধ্যে অহিদিদির যা রান্নার গোছগাছ, তা পড়ে আমাদেরই জিভে জল আসে, ভূতেদের আর দোষ কী? 'পড়ন্ত আঁচে দুধ বসিয়ে রাখা আধ ইঞ্চি পুরু সর পড়ে সোনালী রঙ, তাতে চাঁদের গায়ের মতো ফুটফুট দাগ। রাতে সেই সর তুলে কাশ্মিরী বাটা চিনি ছড়িয়ে ভাঁজ করে রাখেন অহিদিদি। সরটি রোজ সুগন্ধী গোল টইদুম্বুর হয়ে থাকে।'

কি, তোমাদের জিভে জল এসেছে তো? আর কখনও সর ছেঁকে খাবে? আর ওই যে বললাম, ভূতেদেরও জিভে জল এসেছিল। রাতে হারিকেন জ্বেলে রান্নাঘরে গিয়ে

অহিদিদি দেখলেন, সরের একপাশ থেকে খানিকটা কে ছিঁড়ে নিয়েছে, মেঝেতে টপটপ করে দুধ ফেলেছে; নতুন রং করা দেয়ালে ছোটো ছোটো আঙুল মুছেছে।' কাউকে কিছু না বলে অহিদিদি নিজেই খুঁজে বের করল তাদের। আট-দশটা রোগা রোগা ছেলেমেয়ে, গায়ে জামা নেই, রুক্ষ চুল, সাদা সাদা দাঁত বের করে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। ওমা, চোর নয় কিছু নয়, বেচারিদের বোধহয় খিদে পেয়েছিল। ওদের সাধ মিটিয়ে খাওয়ান অহিদিদি—মুড়ি, ল্যাবেঞ্চুস, পান, কুচো নিমকি, নোনতা বিস্কুট, আলু-নারকেল, ঘুগনি, কুচো চিংড়ি ভাজা। ওরাও আর খাবার নষ্ট করে না, কোনও চোর বা ভূত বা দুষ্টু লোক ওদের চোখ এড়িয়ে আসতে পারে না। পৌষপার্বণে অহিদিদি পাটিসাপটা, গোকুলপিঠে, নারকেল নাড়ু, দুধপুলি করে খাওয়ালেন। পৌষ মাসে বাড়ি বদল করে নতুন কোয়াটার্সে যাবার সময় আর তাদের দেখতে পেলেন না, শুধু পাঁচমাস পরে গয়লা-বউ হঠাৎ জানাল, ওই পোড়োবাড়িতে নাকি ন-জন জিবকাটা থাকে। ওই বাড়িটা ছিল এক মস্ত সওদাগরের। একবার ভোরবেলায় গয়লাদের ছেলেমেয়েরা পৌষপার্বণে বাসি পিঠে খেতে এসে এমনি হট্টগোল্ করেছিল যে কর্তা তাদের ন-জনের জিভ কেটে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড়োটা পালিয়েছিল।

সত্যিই তো শুধু বড়োজন মানে বগেশই যা কথাবার্তা বলত অহিদিদির সঙ্গে, তা-ও খোনা গলায়। বাকি ন-জন শুধু নোংরা হাত পেতে গোলাপি বাতাসা নিত, কথা তো বলত না। সেই ঘটনার পর থেকে ওই পোড়ো বাড়ির পাশে বিশাল আমবাগানে বোল ধরত না, কিন্তু এবারে গাছে গাছে মুকুল এসেছে। অহিদিদির আদরযত্ন ভূতেদের দুঃখ মুছিয়ে দিতে পেরেছিল।

আবার গয়নাদিদির কথাই ধরো—গয়নাদিদি তার আসল নাম নয়, চটে যাবেন বলে ওই নাম দেওয়া। ছেলে-বউয়ের ওপর রাগ করে বাপ-পিতামহের ভিটেয় এলেন ঠিকই, কিন্তু সেখানে রাতে ছাদে নাকি কারা ধুপধাপ পড়ে, গোয়ালে কারা রাত কাটায়, তুলসীতলায় আলো দেয়। কেউ কাজ করতে রাজি হয় না সেই বাড়িতে। গোয়ালা দরজার বাইরে থেকেই দুধ দিয়ে যায়। অহিদিদির মতো না হলেও গয়নাদিদির রান্নার তোড়জোড়ও খারাপ নয়। কলাপাতায় তালের বড়া, তালের ক্ষীর খেতে দেন এক কালো রোগা ছেলেকে, নাম পেঁচো। সাতদিন দিব্যি ছিলেন গয়নাদিদি, কোনও কষ্ট হয়নি। দিনের বেলায় শুনশান, রাতে তারা কাজ সেরে দিত। বাড়ি যাবার সময় চাদর জড়ানো পেঁচো আর তার রোগা কালো নাক-কাটা মা দিনের বেলাতেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গেল। বুড়ো কর্তার সময়েই নাকি গয়লা পাড়ার এক নাক-কাটা বউ আর তার ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছিল। তারাই বাড়ি আগলায়, কাউকে আধঘণ্টা টিকতে দেয় না। তাই কাজের লোকও পাওয়া যায় না। গয়নাদিদি ফোঁস করে উঠলেন, 'যত রাজ্যের বাজে কথা। লোক ওখানে যথেষ্ট আছে। রেতে টেমির আলোতে স্পষ্ট দেখেছি, দু-দুটো লোক কাজ করে যায় মাটিতে এতটুকুও ছায়া পড়ে না। হাঁ করে আছিস যে বড়, কী হ'ল তোদের?'

তোমরাও গয়নাদিদির কথা শুনে হাঁ হয়ে গেলে নাকি? দিব্যি তো সাতদিন রইলেন গয়নাদিদি, কিছু তো হল না। শুধু কি গয়নাদিদি, আরও কত লোকের মুশকিল আসান করেছে এইসব ভূতেরা। 'খাগায় নমঃ'-র ঠাকুরদার কথাই ধরা যাক। অভাবে অনটনে গভীর রাতে ঠাকুরদা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলেন, ভুতুড়ে বটগাছের তলায় এক হাঁড়ি শুটকি মাছ নিবেদন করে বসে রইলেন। বোঝো কাণ্ড! ভগবানের কাছে লোকে হত্যে দিয়ে বসে থাকে, তা বলে ভূতের কাছে? তবে ওই যে বললাম, এরা তো আর যেমন তেমন ভূত নয়, এরা হল স্বয়ং লীলা মজুমদারের ভূত। তাই ঠাকুরদার সমস্যার সমাধান হতে দেরি হল না। তাই বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পেলেন কুচকুচে কালো পালক, যেটা একটু ছেঁটে নিলেই চমৎকার খাগের কলম হয়ে গেল। সেই কলম হাতে নিলেই হাতের আঙুল বিড়বিড় করে ওঠে, গায়ের রক্ত হিম করা সব ভূতের গল্প লেখা হয়ে যায়। এমনি করে ঠাকুরদা এক বছর ধরে তিনশো পঁয়ষট্টিটা ভূতের গল্প লেখেন, রাজাকে শোনান আর টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলেন।

কিংবা ভুতুড়ে গল্পের মেজো পিসেমশাইয়ের সমস্যার কথাই ধরা যাক—ভূতে বিশ্বাস করেন না বলে ক্লাবে বাজি রেখে ভূতের বাড়িতে রাত কাটাতে তো এলেন, কিন্তু দেখা

হয়ে গেল বাড়ির কবেকার মালিকের সঙ্গে। তার গলায় মুক্তোর মালা জড়ানো, কানে মুক্তো, হাতে হিরের আংটি। তিনি হবি তো হ, পিসেমশাইয়ের গোলাপি বিড়ির প্যাকেটের বদলে হিরের আংটি দিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। তাতেই অজ্ঞান হয়ে পিসেমশাই বাজি হারলেন ঠিকই, কিন্তু বুক পকেটে হিরের আংটি দিনের বেলাতেও জ্বলজ্বল করতে লাগল।

তাহলে ভূতেরা শুধু দুষ্টু ছেলেদেরই উদ্ধার করে না, বড়ো মানুষদেরও করে। আর দুষ্টু মেয়েদের? শোনো তাহলে, লক্ষ্মী বলে এক মেয়ে ছিল, যে থাকত বোর্ডিং-এ। সে দুষ্টু ছিল কিনা জানি না, তবে কেউ এসে খাবার টেবিলে বসার আগেই কোথাকার এক পাতি বেড়ালকে অর্ধেক মাখন ও জ্যাম খাইয়ে দিয়েছিল, বোর্ডিং-এর মাসিমা তাই লক্ষ্মীকে সেই বেড়ালসুদ্ধু স্নানের ঘরে থাকার শাস্তি দিয়ে বাকিদের নিয়ে ঝরনাতলায় পিকনিকে যাবার তোড়জোড় করতে লাগলেন। যাবার আগে একটা বাক্সে শুকনো পাঁউরুটি আর এক বোতল জল তার জন্যে দিতে আসায় মালতীকে চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে দু-বার মাথা ঠুকে দেওয়া ছাড়া লক্ষ্মীর কীই বা করার ছিল। বিশেষত মালতী যখন হেসে হেসে এ-ও বলল যে তারা পিকনিকে লুচি, কপিভাজা, আলুর দম আর খিরের সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও স্নানের ঘরের জানলা দিয়ে অনুদিদিকে মাকড়সা ছুঁড়ে মারল, যাবার আগে মাসিমা লক্ষ্মীকে দলে নেবার জন্য ডাকতে এলে তাঁকে কাঁচকলা দেখাল। মাসিমা আর কী করেন, বাইরে থেকে দরজা জানলার শিকল তুলে চলে গেলেন। রেগে গিয়ে লক্ষ্মী মাসিমার চুল কালো করার ওষুধের শিশি থেকে সব ওষুধটা নর্দমায় ঢেলে দিয়ে শিশিটা টবের পেছনে লুকিয়ে রাখেন। ভারী শান্ত মেয়ে এই লক্ষ্মী, যাই বলো।

কিন্তু যাদের লোকে দুষ্টু বলে, তারা তো আসলে খুব ভালোদের থেকেও ভালো, সে তো তোমরাই জানো। তাই তাদের উদ্ধার করতে চলে আসে একদল মেয়ে। তাদের কাছে আছে অদ্ভুত এক চাবি, যা দিয়ে মাসিমার বিলিতি তালাও খুলে গেল। তাদের সঙ্গে লক্ষ্মী গেল তাদের ইস্কুলে। সেটা হল দুষ্টু মেয়েদের ইস্কুল। সেখানে পড়তে পড়তে তারা ভালো হয়ে যায়। ওই যে বললাম—দুষ্টু মেয়েরাই তো আসলে ভালো মেয়ে। সেই ইস্কুলে থোপা থোপা লাল-কালো বেরি, ঘরের মধ্যে তাকের ওপর সারি সারি ছবির বই, গল্পের বই, বোয়াম বোঝাই লজঞ্জুস, টফি, ভাজা মশলা, কুলের আচার, চিনেবাদামের তক্তি, আমসত্ত্ব। যার যত খুশি নাও আর খাও। কী ভালো যে দিনটা কাটল লক্ষ্মীর! এমনকী মাসিমার বাথরুম পর্যন্ত ঝকঝকে তকতকে করে গেল। অথচ লক্ষ্মী সবসময় শুনে এসেছে মণিঝোরার ওদিকে ইস্কুল সেই কবে পাহাড়ের গা খসে বাড়িঘর, লোকজন নিয়ে পড়ে গেছিল। অনেকটা সেই লেখিকার ছোটোবেলার শোনা ধসের গল্পের মতো। কিন্তু তাহলে এরা এল কোত্থেকে?

খুঁজতে যাবে নাকি এদের? আর কিছু না হোক, ভালো-মন্দ খাবার পাওয়া যাবে এন্তার। কী চাইবে আগে ভেবে রেখো কিন্তু। তা না-হলে সেই 'আকাশ পিদ্দিম' গল্পের মতো হবে। আকাশে পিদ্দিমের আলো দেখে দেবতাদের বদলে ভূতেরা ভুল করে গুপেদের ছাদে নেমে এসেছিল। কিন্তু ভূতেদের একটা প্রেস্টিজ বলে ব্যাপার আছে, তাই তারা বর দিতে চাইল। তাই শুনে গুপে দুটো স্টিলের পেনসিল কাটা, বঙ্কু একটা ভালো ডট পেন আর ছ-টা রিফিল চাওয়ায় বুড়িভূত প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছিল। 'এঁকটা ভাঁলো বঁরও চাঁইতে জাঁনিস নাঁ, স্টুঁপিড।' তাই শুনে তোতা একটা আলাদিনের প্রদীপ চাইল বটে, কিন্তু প্রদীপ ঘষতে যখন বেঁটে বামন এল, তার কাছে চাইল গুপেদার চেয়ে আরও বড়ো চারটি স্টিলের পেনসিল কাটা, দুটো আরও ভালো ডটপেন, আরও বারোটা রিফিল। তার ফলে কী হয় জানো? বেঁটে বামন ফেরত নিয়ে নিল সেই প্রদীপ—একটা ভালো বরও চাইতে পারিস না, তুই এটার যোগ্য নোস।

তাহলে আগে থেকে ভেবে রাখো কী কী চাইবে। বলা তো যায় না, তোমার কোন মুশকিলে তারা হঠাৎ হাজির হবেন। তেনারা আবার বন্ধ দরজাতেও দিব্যি ঢুকতে পারেন কিনা। এই সব ভালো ভূতেদের স্রষ্টার কথাতেই শেষ করি—'ভূতে বিশ্বাস করে কিনা, একথা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না। বিশ্বাস না করলেও কিছু এসে যায় না। তবে একটা কথা বলি, শুনেছি মরে গেলে শরীরের এককণাও নষ্ট হয় না। সবই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে চিরকাল রক্ষা পায়। তাহলে মানুষের সত্ত্বার শ্রেষ্ঠাংশই বা বিনষ্ট হবে কেন? আরও বলি, মরে গেলে সেই শ্রেষ্ঠাংশের এক অশুভ পরিণতিই বা হবে কেন? বিধাতার মঙ্গলবিধানে আমার আস্থা আছে, তাই আমার ভূতদের একটু সু-নজরে দেখতে হবে।' (লীলা মজুমদার, সব ভুতুড়ে)

সাঁতারের সোনার মেয়ে-নাটালি দ্যু তয়

পরিমল রায়

পৃথিবীতে ইতিহাস সৃষ্টি করেন সামান্যকিছু মানুষ আর সেটা লেখেন অন্যেরা, আর আমরা সেই ইতিহাস পড়ে তাঁদের কথা জানতে পারি আর তাঁদের দেখানো রাস্তায় নিজেদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করি। খেলার জগতেও এ-রকম কিছু বিরল প্রতিভার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাঁরা সমস্ত রকম প্রতিকূলতা ছাপিয়ে তাঁদের নিজেদের ক্ষেত্রে একের পর এক শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে যান। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, সমাজের প্রতিকূলতা তাদের কোনও ভাবেই কোনওদিন থামাতে পারে না। ইতিহাস এঁরাই রচনা করেন। আমরা যারা শারীরিক সুস্থতা নিয়ে বেঁচে আছি তারা ঈশ্বরের অশেষ করুণার পাত্র। তা সত্ত্বেও আমরা খুব সহজেই সামান্য বিপদ বা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলে ভেঙে পড়ি। সেইসব কৃতী অসীম সাহসী মানুষেরা, যাঁরা জন্ম থেকে বা পরে কোনও দুর্ঘটনার শিকার হয়ে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন, তাঁরা যখন সমস্ত বাধা ডিঙ্গিয়ে জীবনের কোনও ক্ষেত্রে যুদ্ধে জয়ী হন তখন আমাদের চোখ খুলে যায়, আমরা তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি আর ভাবি কীভাবে তাঁরা এইসব অবিশ্বাস্য কীর্তি স্থাপন করেন। এরকমই একজন আজও আমাদের মধ্যে এই পৃথিবীতে রয়েছেন শুধু তা-ই নয়, পরের পর অবিশ্বাস্য উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে গিয়ে বার বার প্রমাণ করেছেন—ইচ্ছা আর অদম্য চেষ্টা থাকলে মানুষের না পারার মতো খুব কম কাজ আছে। ইনি আর কেউ নন, দক্ষিণ আফ্রিকার এক-পা বিহীন সাঁতারু, নাটালি দ্যু তয়। শুধু তাই নয়, নাটালি কৃত্রিম পায়ের সাহায্য ছাড়াই সাঁতারের দুনিয়ায় তাঁর অভূতপূর্ব কীর্তি স্থাপন করেছেন।

১৯৮৪ সালের ২৯শে জানুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে ভবিষ্যতের খেলার দুনিয়ার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জন্ম নেয়। মিষ্টি মেয়েটি, মানে আমাদের নাটালি দ্যু তয়, শত বাধাবিপত্তি কাটিয়ে খেলার দুনিয়ায় বিরল নজির স্থাপন করে আমাদের অবাক করে দিতে মায়ের কোল আলো করে খুবই সাধারণ পরিবারে সে আসে ওইদিন। বাবা ডেভিড ছিলেন পেশায় ফোরম্যান আর মা ডেইড্রে রিসেপসনিস্টের কাজ করতেন। ছোটোবেলায় নাটালি অয়েনবারগ গার্লস হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরে কেপ টাউন ইউনিভার্সিটি থেকে বিজ্ঞা ন স্নাতক হন। তাঁর বিষয় ছিল জেনেটিকস ও ফিজিওলজি।

১৯৯৮ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে নাটালি সর্বপ্রথম আর্ন্তজাতিক স্তরে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমস সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ছোটো থেকেই নাটালি বেশ ডাকাবুকো ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই দুরন্তপনা একদিন এক ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে সাঁতার শিখে ফেরার সময় নাটালি যখন স্কুটার চালিয়ে আসছিলেন, তখন একটা গাড়ি এসে ধাক্কা মারলে তিনি গুরুতর ভাবে জখম হন। এর ফলে অস্ত্রোপচার করে তাঁর একটা পা বাদ দিতে হয়। কিন্তু এই দুর্ঘটনা তাঁকে থামাতে পারেনি। সেই অস্ত্রোপচারের মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভালো ভাবে হাটতে শুরু করার আগেই তিনি আবার সাঁতারের পুলে ঝাঁপিয়ে পরেন ২০০২-এর কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ করার তাগিদে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, কোনও কৃত্রিম পা ছাড়াই তিনি এই দুঃসাহসিক কাজে এগিয়ে যান। এরপর শুধু সাফল্য আর সাফল্য। ২০১২ সালে ম্যানচেস্টার অলিম্পিকে যোগ দিয়ে নাটালি ১৮ বছর বয়সে নয় নয় করে দুটো বিশ্ব রেকর্ড করেন ৫০ মিটার ও ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায়। শুধু তা-ই নয়, সেই অলিম্পিকে সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধী খেলোয়াড় হিসেবে শারীরিকভাবে সক্ষম প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ৮০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলের ফাইনালে উঠে নাটালি খেলার জগতে ইতিহাস রচনা করেন। এর আগে কোনও প্রতিবন্ধী খেলোয়াড় সক্ষম

প্রতিযোগীদের সঙ্গে একই খেলায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেননি বা এত সাফল্য পাননি। তাঁর এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ডেভিড ডিকসন এ্যাওয়ার্ড প্রদান করে ম্যানচেস্টার অলিম্পিক কমিটি তাঁকে এক অসামান্য ক্রীড়াবিদ হিসেবে বরণ করে নেয়।

এরপর ২০০৩ সালে অল আফ্রিকান গেমসে নাটালি আবার শারীরিক ভাবে সক্ষম প্রতিযোগীদের সঙ্গে একই সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন ও ৮০০ মিটার সাঁতারে সোনার পদক জয় করেন। এছাড়াও, তিনি অ্যাফ্রো এশিয়ান গেমসে ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে রুপো ও ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে ব্রোঞ্জ পদক পান।

সফল মানুষদেরও মাঝে মাঝে খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, নাটালিও তার ব্যতিক্রম নন। ২০০৪ সালের এথেন্স অলিম্পিকে অল্পের জন্যে নাটালি যোগ্যতা অর্জন করতে পারলেন না। কিন্তু সাময়িক এই ব্যর্থতা তাঁকে দমাতে পারেনি। সেই শহরেই অনুষ্ঠিত প্যারালিম্পিকে সবাইকে অবাক করে দিয়ে নাটালি ৫টা সোনা ও ১টি রুপোর পদক জয় করে নেন। সেই একই বছরে নাটালির সাহস আর বাহাদুরিকে কুর্ণিশ জানিয়ে লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টসপার্সন খেতাবের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ করা হয়।

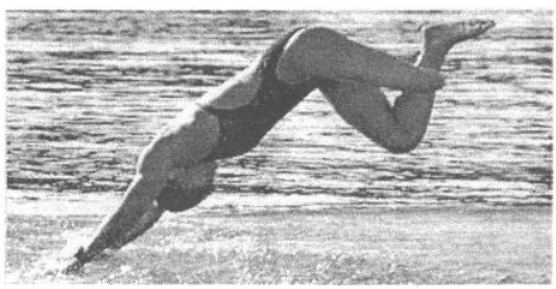

এরপর ২০০৬ সালের কমনওয়েলথ গেমসে যোগ দিয়ে নাটালি তাঁর আগের ম্যানচেস্টার অলিম্পিকের সাফল্য পুনরাবৃত্তি করেন ২টো স্বর্ণপদক জয় করে। সেই বছরেই তিনি চতুর্থ আই পি সি ওয়ার্ল্ড সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ দিয়ে ৬টা সোনার পদক জয় করে মোট ৫৬ জন পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীদের মধ্যে তৃতীয় হন। এখানেই নাটালি দ্যু তয়ের জয়যাত্রার শেষ নয়। স্পেনের সেভিলে ওপেন ওয়াটার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ১০ কিলোমিটার ওপেন ওয়াটার রেসে চতুর্থ হয়ে ২০০৮ সালের মে মাসে বেইজিং অলিম্পিকে যোগদান করার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই প্রতিযোগিতার মহিলাদের ১০ কিলোমিটার রেসে নাটালি সক্ষম প্রতিযোগীদেরও সঙ্গে মোকাবিলা করে ১৬ তম স্থান দখল করেন। একই বছরে তিনি গ্রীষ্ম প্যারালিম্পিকে ৫টা সোনার পদক জয় করে সবাইকে অবাক করে দেন। তাঁর এই ধারাবাহিক সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকা অলিম্পিক কমিট দ্যু তয়কে ২০০৮ সালের গ্রীষ্ম অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর দেশের পতাকা বহন করার বিরল সম্মান প্রদান করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ক্রীড়াবিদ যিনি একই বছরে অলিম্পিক ও প্যারাওলিম্পিক দুটো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেই এই বিরল সুযোগের অধিকারী হন।

খেলার দুনিয়ার এই ঈর্ষা-জাগানো প্রতিভা খেলোয়াড়োচিত মনোভাব দেখিয়ে মাত্র ২৮ বছর বয়সে ২০১২ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে যোগদান করেন ও প্রতিযোগিতা শুরু হবার ৩ দিন আগেই ঘোষণা করেন তিনি এই প্রতিযোগিতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন ও সেইমতো তিনি নিজেকে আন্তর্জাতিক সাঁতার থেকে সরিয়ে নেন। নিজে কৃতিত্বের চূড়ায় থাকতে থাকতে এভাবে আগামী প্রজন্মকে জায়গা করে দিতে ক-জন এভাবে অবসর নিতে পারেন, ভাবা যায়! পৃথিবীর ইতিহাসে এই দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই।

অবসর নাটালির মতো মানুষদের জন্য নয়। সাঁতার প্রতিযোগিতা থেকে সরে যাবার পর তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অতিথি বক্তা হয়ে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সাবলীল বলার ধরণ আর তাঁর এই লড়াকু জীবনের গল্প সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এক বিস্ময় আর সেটা উদ্বুদ্ধ করার এক অতুলনীয় চাবিকাঠি। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে নিজের জীবনের থেকে নেওয়া শিক্ষা, নিজের ওপর আস্থাই যে-কোনও মানুষের জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার রসদ। শুধুমাত্র অসংখ্য পদক বা পুরস্কার জয়ী বলে পৃথিবীর খেলা-পাগল মানুষেরা কোনওদিন তাদের প্রিয় নাটালিকে মনে রাখবেন না, তাঁরা তাঁকে মনে রাখবেন তাঁর এই শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জীবন যুদ্ধে লড়াই করার মনোভাব আর তাঁর নিজের ক্ষেত্রে অসম লড়াইতে জয়ী হবার অদম্য ইচ্ছাশক্তির জন্য। তাঁর এই অতুলনীয় দৃষ্টান্তমূলক জীবন তাঁদের সব সময় রসদ যোগাবে নিজের নিজের ক্ষেত্রে শত বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে নিজেদের চূড়ান্ত উচ্চতায় নিয়ে যাবার পাথেয় হিসাবে।

জল ছেড়ে

শক্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

মরশুমের প্রথম বৃষ্টি। সারাদিন ঝরছে তো ঝরছেই। সঙ্গে মেঘের ডাক আর বিজলির ঝলকানি। খাড়া পাড় থেকে দুরন্ত বেগে জল ঝাঁপিয়ে পড়ছে দিঘিতে, ঝরনার মতো মোটা ধারায়। সেখানে মাছেদের গাদাগাদি। বড়ো বড়ো পুঁটিগুলো লাফিয়ে উঠছে ঝরন্ত জলের গায়ে। লোভী মানুষগুলো ওঁত পেতে ছিল জাল নিয়ে। কত ধরা পড়ল, তবু বিরাম নেই। অন্ধকারেও খামতি হয়নি তাদের খেলায়। উলটে আরও উদ্দাম। একেবারে নির্ভয়।

রাস্তার দিকের ঢাল বেয়েও জল ঢুকছে ক্রমাগত। এদিকে সারাদিন লোকেদের যাওয়া-আসা। রাত নির্জন হলে কই মাছের ঝাঁক এসে জড়ো হয় জল নামার মুখে। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। জলের তোড়ে আনন্দের বান ডাকে মাছেদের দলে। কইগুলো স্রোত ঠেলে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। একটা-দুটো-তিনটে, তারপর অনেক। বদ্ধ জল ছেড়ে বাইরে পাড়ি। বুকে হেঁটে খলবল করতে করতে ডাঙায় চলে আসে। একের পিছনে এক, পাশাপাশি ঠেলাঠেলি। ওরা এগিয়ে চলে। এই আদ্যিকালের দিঘিতে আর মন টিকছে না।

ঘর পালটানো কি এতই সহজ? কত বাধা, কত বিপত্তি!

বড়ো শত্রু মানুষেরাই। এই ঝড়জলের মধ্যেও ঠিক হাজির। মাথায় বর্ষার টুপি। দু-হাতে দস্তানার মতো জড়ানো চট, খপাখপ্ ধরছে আর পাশের টিনে ভরছে। কাঁটা উঁচিয়েও রেহাই নেই। ওইটুকু পথে তিন তিন জন। মাঝে মাঝে টর্চের আলো। জল ছেড়ে বেরোনোই সার। নতুন গন্তব্য শেষ পর্যন্ত মানুষের রান্নাঘর।

সবে বড়ো হওয়া কইটা কোনওরকমে পার পেয়ে গেল। তিনজনের কেউ ওকে দেখেনি। দেখলেও আকারে বড়ো নয় দেখে ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম মানুষটার তো এদিক-ওদিক দেখারই সময় নেই। ধরে শেষ করতে পারছে না। তার হাত গলে পরের জনের নাগালে। সে ফসকালে আর একজন।

কচি কইটা যখন দু-নম্বরকে পেরোচ্ছে, পেছন থেকে এক নম্বরের আর্ত চিৎকার। ব্যাঙ ধরার জন্য সাপেরাও জমা হয়েছে ওদের পিছু পিছু। ভুল করে কারও গায়ে হাত দিয়েছে নিশ্চয়ই। বাকি দু-জন সাবধান হল। হাত থেমে গেছে।

কচি কই রাস্তায় উঠে এল। সামনে পিছনে আরও অনেকে। খুব ফুর্তি হচ্ছে। বড়োদের সঙ্গে কানকো ফুলিয়ে সামনে এগিয়ে চলল। রাস্তাতে মানুষের ভিড়। টর্চের আলো ঘুরছে এদিক ওদিক। মাথার ছাতা মাটিতে পেতে তুলে নিচ্ছে কইগুলো।

একজন চেঁচিয়ে বলল, 'কী সাইজ রে! একটাই দুশো হবে। তেল-কই যা দাঁড়াবে না! ওই যে! ধরধর, আরে! তোর পায়ের গোড়াতে। ওই আরেকটা। ধরে নে চটপট। কাঁটার ভয় করবে চলবে নাকি! হাতে রুমাল জড়িয়ে নে।'

আলো ফেলছে একজন, ধরছে অন্যজন। কই ধরার কসরত চলছে রাস্তা জুড়ে। কচি কই চলা থামিয়ে পাশের ঘাসে লুকিয়ে পড়ল। ঘাসের ভেতর দিয়ে দিয়ে পৌঁছাল একটা তালগাছের গোড়ায়। গাছটা হেলে দিঘির ওপর বেঁকে রয়েছে। কচি গাছটাকে চেনে। দেরি না করে খরখরিয়ে গাছ বেয়ে উঠতে লাগল। চড়তে চড়তে একেবারে পাতার গোড়ায়। চওড়া কানা উঁচু জায়গা। কচি হাঁপিয়ে গেছিল, কাঁটা মুড়ে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। ওপর থেকে ঝরঝর

বৃষ্টির শব্দ পাতায় পাতায়। তালের কাঁদি বেয়ে গড়াচ্ছে গাছের তলায়। কই মাথা ঝুঁকিয়ে নীচে দেখতে লাগল।

সাপে কাটা মানুষটাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন। একজন বলল, 'হাসপাতালে পৌঁছানো পর্যন্ত জাগিয়ে রাখতে হবে, বুঝলি?'

আরেকজন বলল, 'এত রাতে ডাক্তারবাবুকে আবার পেলে হয়।'

জলের ধার ফাঁকা। রাস্তাতেই যে-কজন নাচানাচি করে মাছ ধরছে। বৃষ্টি কমের দিকে, জল নামার তোড় কমে গেলে কইয়েরাও আর জল ঠেলে উঠে আসবে না।

পাতার চওড়া বোঁটায় শুয়ে শুয়ে কচি কই ভাবল, খুব জোর বেঁচে গেছে, মানুষের হাতে পড়া মানেই শেষ! কেটেকুটে রান্নাকরে পেটে না-পোরা পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি নেই।

হঠাৎ পাশে আরেক কই। কচির গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। তার গোটা গা থরথর করে কাঁপছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে কচি জিজ্ঞেস করল, 'খুব কষ্ট পেয়েছ বলে মনে হচ্ছে?'

কাঁপতে কাঁপতে পাশের কই বলল, 'রাস্তার ওপরে ছাতার রড দিয়ে চেপে ধরেছিল আমাকে। কোনওরকমে পালিয়ে এসেছি। ছাল-চামড়া উঠে গেছে অনেকটা। খুব জ্বলছে।'

কচির মায়া হল। বলল, 'আহা, তুমি ভালো করে শোও। আকাশের জলে আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যাবে।'

কচি সরে গিয়ে ওকে জায়গা করে দিল। ঘায়েল কই বলল, 'ভুল করেছি, অন্যের দেখাদেখি কেন-যে জায়গা ছাড়তে গেলাম!'

কইটার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। লাল লাল চোখ দিয়ে কচিকে ঘাড় উঁচিয়ে দেখল ভালো করে। দেখে কী বুঝল সে-ই জানে।

বলল, 'তুমি তো খুবই ছোটো। তুমি বেরোলে কেন? বাইরে কত বিপদ দেখেছ তো!'

'দেখেছি। বিপদ কোথায় নেই বলো তো? আমাদের তো সব সময়ই বিপদ। ভাবলে বেরোতে পারব না কোথাও।'

'তা বলছি না। এপাশে না-এসে ওদিক দিয়ে বেরোতে পারলে মনে হয় ঠিক ছিল। এখন ওখানে লোকজন নেই। সেটাই ভালো হত।'

'ভালো কোথায় দেখলে? পুরো জায়গাটা তো সরপুঁটিদের দখলে। খালি লাফাচ্ছে আর লাফাচ্ছে। পড়ছে সেই জলেই। কীসের এত পুলক জানি না।'

'ওটা ওদের আনন্দের খেলা। ওরা বোকা খুব, দেখছে জাল ছুঁড়ে ধরে নিচ্ছে ঝুড়ি ঝুড়ি। তবুও পালায় না। এখনও খেলে চলেছে।'

'তুমি কি ওখানেও চেষ্টা করেছিলে?'

'হুঁ। কিন্তু জলের যা জোর, মাটি বেয়ে ওঠাই গেল না। কেবল ভাসিয়ে ফেলে দিচ্ছে।'

'ওদিক দিয়ে যেতে কোথায়?'

'কেন? পাড় ডিঙিয়ে অন্য জলায়।'

'ওদিকে আবার জলা আছে নাকি?'

'ধানখেত আছে। বড়োরা বলেছে উঁচু আল দেওয়া সব খেত। সেই সব এখন তো জলে ভরতি।

'সে আর ক-দিন! শুকিয়ে গেলেই মানুষরা নেমে পড়ে ধরে নেবে। তার থেকে এই ভালো। জল ছেড়ে একেবারে গাছে।'

দু-জনে বেশ কথা বলছে। হঠাৎ পাশে সরসর শব্দ। বিকট চেহারার এক বিছে পাতার গোড়া থেকে বেরিয়ে কাছে এগিয়ে এল। ছাড়ানো পাকা তেঁতুলের মতো কালচে লাল চেহারা। ওদের দু-জনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বিছে কই মাছ চেনে। এরা তার খাদ্য নয়। ধরতে গেলে কাঁটা উঁচিয়ে ঝটাপটি করবে। হুল ফোটানোর সুযোগ দেবে না। বিছেটা এখানে অনেকদিন আছে। ছানাপোনা প্রচুর, সেটাই ভয়। খুদেগুলোকে ধরে ধরে এরাই বরং খেয়ে নিতে পারে। বিছের নির্ঝঞ্ঝাট বাসায় অশান্তির একশেষ! এগুলোকে এক্ষুনি বিদেয় করতে হবে।

বিছে কড়া গলায় বলল, 'তোরা এখানে কীজন্যে এসেছিস? এটা আমার বাসা। শিগগির পালা। নইলে একেবারে শেষ করে দেব।'

কই দু-জনের কেউই আগে বিছে দেখেনি। দেখেই ভয় পেয়েছে। কিলবিলে পাগুলো, সামনের মোটা মোটা দাড়া আর লেজের লকলকে হুল, সবই ভয়ংকর। রাগী গলা শুনে আরও চুপসে গেল।

কচি কই বলল, 'ভাববেন না, আমার এই সঙ্গীটি একটু সুস্থ হলেই দু-জনে চলে যাব।'

ঘাঁটাল না দেখে বিছে খুশি। মুখে বলল, 'বেশ, এই

কুয়োতে কচি একা। ওইটুকু জায়গায় কত আর ওপর নীচ করে ঘোরা যায়! ভেসে থাকাও মুশকিল। যখন তখন ঝপাং করে লোহার বালতি এসে জলে পড়ে। তিন দিনেই কচি হাঁপিয়ে উঠল।

বেরোবার একটাই পথ। একদিন টুক করে ভরা বালতির ভেতর ঢুকে পড়ল একেবারে তল ঘেঁষে। বালতি উঠছে, কচিও উঠছে। একটা মেয়ে জল তুলে কলসি ভরছিল। ছোটো গোল মুখ, কচি কানায় ঠোক্কর খেয়ে বাঁধানো চাতালে ছিটকে পড়ল।

আমি এখানে পাহারায় রইলুম। বেগড়বাই দেখলে হুল ফুটিয়ে দেব।'

একেবারে গায়ের ওপরেই বলতে গেলে বিছেটা লম্বা হয়ে শুয়ে। পাতা বেয়ে নামতে গেলে ওকে ডিঙোতে হবে। ভরসা নেই।

বৃষ্টি ধরেছে। আকাশে ফিকে জোছ্না। কচি দেখে নিল একটু টেরচা করে লাফ দিলে হেলা-তালগাছের মাথা থেকে সোজা দিঘির জলে পড়া যায়।

যা ভাবা তা-ই কাজ। আগে ঝাঁপাল বড়ো। ঝুপ্ করে জলে পড়ার আওয়াজ হতেই কচি লাফাল। লাফটা ঠিকই দিয়েছে, কিন্তু জলে আর পৌঁছাল না। মাঝপথে একটা প্যাঁচা তাকে ধরে নিল। আচমকা আটকে পড়ে কচি ভয়ে কাঠ। ছটপটানিও ভুলে গেল। সাঁই সাঁই করে উড়তে উড়তে প্যাঁচাটা কোথাও একটা গিয়ে বসল। এবার কচিকে খাবে। পায়ের তলায় জুত করে ধরে রাখছে। কচি কাঁটা ফুলিয়ে ঝটকা দিল, প্যাঁচা পা সরিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা লাফ। সেটা ছিল একটা কুয়োর উঁচু দেওয়াল। কচি কই অল্প একটু ধাক্কা খেয়ে জলে পড়ল। প্যাঁচা বোকা বনে গিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল।

কচি কই এখন কুয়োর বাসিন্দা। পাটের খাঁজে বসে থাকে। খাওয়ার কষ্ট নেই, কিন্তু ঘোরাফেরার জায়গা কম। নীচ থেকে আকাশটা একটা গোল চাকতির মতো দেখায়।

মেয়েটা ছুটে এসে ধরতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল, 'মা, ও-মা! শিগ্‌গির এসো, কী সুন্দর একটা কই মাছ।'

পরিষ্কার জলে ক-দিনেই কচি বেশ ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। রোদ লেগে গায়ে নীল-সবুজের জেল্লা। সেই গায়ে গরম সানের ছ্যাঁকা লাগছে। কচি কান ফুলিয়ে বুকে হাঁটতে লাগল। নালির মুখে পড়তেই খলবল করে ছুট। মেয়েটাও নাছোড়। পাশে পাশে চলছে। ধরার সাহস নেই।

মা এসে গেল। হাতে একটা ছোট ঝুড়ি, চাপা দিয়ে ধরে নেবে। কচি শরীরটা দুমড়ে মস্ত এক লাফ দিল। পড়বি তো পড় ফ্যান-ঢালা জাবনার গামলায়। গরুটা সবে মুখ ডুবিয়েছে। নাকে লাগল কাঁটার ঝাপট। মুখ তুলে নিয়ে গরুটা বিষম শোরগোল শুরু করে দিল, রেগে গিয়ে পিছনের পায়ে চাঁট মারছে সমানে।

মা-মেয়ে দুজনেই হাজির। নিরুপায় কচি ধরা পড়ে গেল। মা বলল, 'এ তো ছোটো রে! একে জিইয়ে রেখে দিই, কাল বাজার থেকে আরও আনতে বলব।'

কচির নতুন বাসা হল একটা কানা-ভাঙা হাঁড়ি। মাটির সরা দিয়ে ঢাকা। আজকের বাকি দিন আর রাতটুকু যা সময়। ছটপট না করে কচি বুদ্ধি ভাঁজতে লাগল। ভেবে ভেবে কিছুই আসছে না মাথায়।

একটা হুলো লক্ষ্য রাখছিল—গন্ধে ঘোর সন্দেহ। বারে

বারে হাঁড়ির কাছে এসে নাক লাগাচ্ছে। দু-চার বার থাবাও দিল। একবার হাঁড়ি দুলে উঠল। কচি খলবল করে জানান দিল ভেতরে সে আছে। আর দেখতে হল না, হুলোর থাবায় হাঁড়ি উলটে টুকরো টুকরো। জল ছিটকাতে হুলো কয়েক পা পিছিয়ে গেল। সেই ফাঁকে কচি চটপট একটা প্যাঁটরার তলায়।

হুলো নাক ঠেকিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। নাগাল পাচ্ছে না। ঘরে ঢুকে কাণ্ড দেখে মায়ের মাথা গরম। মাছটা হুলোর পেটে গেছে ভেবে মেরে তাড়াল। মেয়ে ইস্কুলে। ফিরে এ মেন খারাপ করবে, সেটা ভেবে মায়েরও কষ্ট হল।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল বাক্সের একচিলতে ফাঁকে। ধুলো-নোংরায় দম বন্ধ হবার অবস্থা। নেহাতই কইয়ের প্রাণ। খিদেও পাচ্ছে খুব। কাছেই একটা উচ্চিংড়ে ঠ্যাং নাচিয়ে আওয়াজ করছিল। সেটাকে পেটে পুরল।

ঘরটা পুরো অন্ধকার, মানুষের আওয়াজ নেই। কচি আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল। পালাবার পথ খুঁজছে এদিক ওদিক। দরজা বন্ধ। নালির মুখে কাঠ গোঁজা। কচি হাল ছাড়ার পাত্র নয়। বাইরে বেরোতেই হবে।

হঠাৎ কার একটা পা কানকোর পাশে। চাপা পড়ার ভয়ে কচি ছিটকে সরে এল। তক্ষুনি তীক্ষ্ণ এক চিৎকার— ধপাস্ করে ভারী কিছু পড়ার শব্দ। একটা মানুষ।

সবার ঘুম ভেঙে গেল। হইহই কাণ্ড গোটা বাড়িতে। গরাদ কেটে চোর ঢুকেছিল। কচি পড়েছে তার পায়ের ওপর। কীসে কামড়াল ভেবে চিৎকার করে ভিরমি খেয়েছে চোরটা। কচি এক কোনায় লুকিয়ে।

হই হই করে চোর ধরা পড়ল। কচি কইও রক্ষা পেল না। ঝুলটুল মেখে কিম্ভুত চেহারা হয়েছে তার।

কর্তা বললেন, 'এটাই তোমাদের সেই কই! এর জন্য চোর কাজ সারতে পারেনি। মাইনের পুরো টাকাটাই ছিল অফিসের ঝোলায়। কী করে খবর রেখেছিল চোরটা কে জানে? একে যত্ন করে রাখো। বেচারা কাহিল হয়ে পড়েছে।'

কচিকে বড়ো পাত্রে পরিষ্কার জলে ছেড়ে রাখা হল। জলের ওপর মুড়ি। অত রাতে মেয়েটা এসে টর্চ জ্বেলে জ্বেলে তাকে দেখছে।

পরের দিন সকালে সবাই মিলে তাকে দিঘিতে ছেড়ে দিয়ে এল। এতদিনে কচি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঘুরতে ঘুরতে দেখা— চেনা মাছেদের সঙ্গে। ওমা! এটাই তো তার পুরোনো জায়গা। ক-টা দিন বাইরে থেকে ঘুরে আবার আগের দিঘিতে ফিরে এসে কচি এখন কইদের চোখের মণি। গল্প শোনার জন্যে সবাই তাকে ঘিরে ধরল।

ছবি: নীতিশ মুখোপাধ্যায়

সন্দেশী রাকা দাশগুপ্ত পেয়েছেন কৃত্তিবাস পুরস্কার

সন্দেশের বেশ কয়েকজন গ্রাহকগ্রাহিকা 'হাতপাকাবার আসর'এ লেখা এবং আঁকায় হাত পাকিয়ে পরবর্তী জীবনে লেখক এবং শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন রাকা দাশগুপ্ত। খুদে সন্দেশী হিসেবে হাতপাকাবার আসরে গল্প-কবিতা দিয়ে রাকার যাত্রা শুরু। সতেরো বছর পর রাকা ওই গণ্ডি পার করে সাধারণ বিভাগে লিখেছে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-ছড়ানাটিকা ইত্যাদি। প্রশংসা কুড়িয়েছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো প্রবীণ সাহিত্যিকদের। জনপ্রিয় হয়েছে সন্দেশের দরবারে। কিশোর সাহিত্যের পাশাপাশি রাকা বড়োদের জন্যও কলম ধরেছে এবং সূচনাতেই পেয়েছে স্বীকৃতি। গত বইমেলায় কৃত্তিবাস পত্রিকার ভাস্কর দত্ত পুরস্কার পেয়েছে, ওর কবিতার বই 'অলক্ষ্মীর ঝাঁপি'র জন্য। পুরস্কার হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে সন্দেশকেও। সব সন্দেশীরাও দারুণ খুশি রাকার এই সাফল্যে।

অভিনন্দন রাকা।

প্রবাল সেন

দামোদরের বালুতীরে

জীবন সর্দার

এ-বাংলায় দামোদর একটা বিখ্যাত নদ। তার কাছেই একটা অখ্যাত ছোটো রেলস্টেশন। তারও নাম দামোদর। দামোদর নদ সেখানে দুই জেলাকে ছুঁয়েছে। পুবে বর্ধমান। পশ্চিমে পুরুলিয়া। এই জেলার প্রান্তে দাঁড়িয়ে অন্য জেলার প্রান্তদেশকে কেমন দেখায়, কী আছে ওই তীরে, তা নিয়ে আমাদের ছিল মাথাব্যথা। এটা একটা প্রকৃতি-পড়ুয়ার পড়ার বিষয় হতে পারে নাকি? চারজন প্রকৃতি-পড়ুয়া বললে, 'সে জায়গাটি না দেখে কিছু বলা যাবে না।' অর্থ, চলো যাই দামোদর রেলস্টেশন।

চৈত্র মাসের এক সকাল। প্রকৃতি-পড়ুয়ারা নামল রেলগাড়ি থেকে দামোদর স্টেশনে। হাওয়া ছিল নরম, কিন্তু রোদের তেজ আছে। তাতে পরোয়া নেই তাদের। যেতে হবে পায়ে হেঁটে পাঁচ কিলোমিটার দূরে সূর্যনগর। তার পাশেই আছে দামোদরের এক বিচিত্র বালুতীর।

পাকা রাস্তা ছেড়ে উঁচুনীচু ডাঙার উপর পায়ে চলার পথটা বেছে নিল তারা। পথের পাশে গাছগাছালি দেখে চিনতে চিনতে তারা চলেছে। দেখছে গাছের ডালে, ঝোপে, পাখি-পোকাদের। শুনতে পেল বসন্তবৌরি, কোকিলের ডাক। সেটা হল উপরি পাওনা।

পথে নেমে প্রথম যে সুন্দর ফুলের ঝালর দোলানো দেখা পেল সেটা অমলতাস। সোনালি ফুল ঝুলছে ডালে ডালে। কেউ বললে, 'ওটার নাম সোঁদাল।' সে গাছ চেনে, দোয়েল তার নাম। ঈশা বললে, 'না, ওটার নাম—বাঁদরলাঠি। কেন-না ফুল ফোটা শেষ হলে সজনে ডাঁটার মতো ফল ঝোলে, দেখতে যেন বাঁদরের লেজ। কুণাল বললে, 'প্রথম নামটাই ভালো—অম৬ ,।' অয়ন বললে, 'নাম যা-ই হোক, আমি জানি ফুলগুলি বড়া করে ভেজে খেতে বেশ ভালো।' তর্ক থামিয়ে তারা পথ এগোল। ঢেউয়ের মতো নামা আর ওঠা। একবার উঠেই দেখা পেয়ে গেল একদল দেবদারু গাছের ছায়া। চেনা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তলায় ঝরা কয়েকটা জাম রঙের ফল কুড়িয়ে বুঝতে পারল রাতের বেলায় বাদুড় খেয়ে গিয়েছে ওগুলো। দাঁতের দাগ কয়েকটা ফলের গায়ে। কিন্তু দেবদারু ফুলের দেখা না পেয়ে নামল আবার নীচু পথে। ফের উঠে পেয়ে গেল পাকা রাস্তার দেখা। সে রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে এসে বিস্ময়ে দাঁড়াতে হল। পথের পাশে পাথর চাপা একটা গর্ত থেকে ধিকিধিকি আগুনের শিখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক রহস্য। পাথুরে জমির ভেতর থেকে গ্যাস বেরোচ্ছে, তাতে কেউ আগুন দিয়ে মজা করেছিল। এখন জ্বলন্ত শিখা নিভছে না আর।

জ্বালামুখটার কাছে কয়েক মিনিট কেটে গেল। ওদের দেখে বই বগলে কয়েকটা ছেলেমেয়ে ভিড় করে দাঁড়াল। মিশুক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথায় কথায় জানা গেল ওপর পথে সহজেই দামোদরের কাছে যাওয়া যাবে। ওদের দেখানো পথটি ধরে যেতে যেতে বোঝা গেল এককালে এ-পথের দু-পাশে সার সার গাছ ছিল। এখন তাদের গুঁড়িগুলো মাটিতে গাঁথা, গাছপালা কাটা গেছে। চেনার উপায় নেই তাদের, তবে দামি কাঠের গাছ হবে—মেহগনি, সেগুন। নইলে কাটা পড়বে কেন? তবে কাটা পড়েনি এমনও গাছ রয়েছে—পলাশ, শিমুল, লাল ফুলে ঢাকা পথ থেকে খানিকটা দূরে। সেখানে অমলতাস ফুলের ঝালর ঝুলিয়ে একা দাঁড়িয়ে—

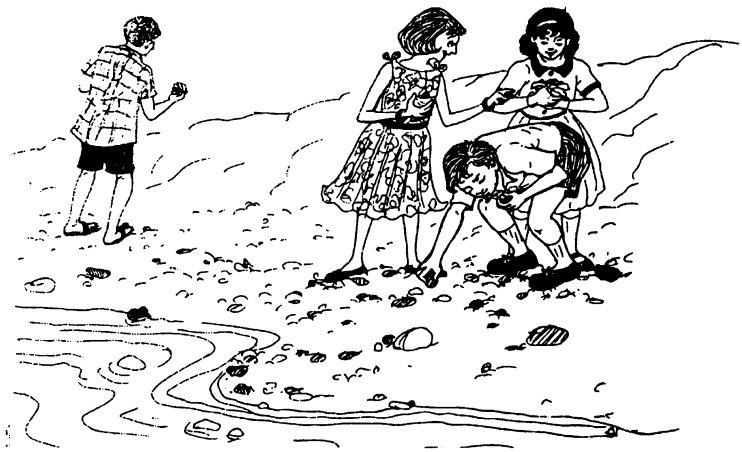

অয়ন দেখতে পেয়েছে আগে। সে অন্যদিকে একটা গাছের দিকে নজর ফেরাতে বলল।

একটা মহুয়া। নতুন ঝলমলে বেগনি রঙের পাতায় ছাওয়া। গাছটা নিয়ে অনেক কথা হল চারজনের। কুণাল বললে, 'এখন তো মহুয়ার ফুল ফুটবে। তা পাতা কেন?' দোয়েল বললে, 'রাতে ফুল ফোটে, সকালে ঝরে পড়ে। তবে এ গাছের তলায় খুঁজে একটাও ফুল পেল না। অয়ন বললে, 'পাতা যখন রয়েছে, ফুলও হবে, ফলও হবে। তবে মহুয়ার ফল হবে বর্ষাকালে। মহুয়ার ফুল, ফল দুটোই মিষ্টি।' এখন তার আশা কোরো না। চলো আগে।'

কিন্তু ঈশা ছিল না দলে। দূরে একটা বাংলোবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কী দেখছে। বাকি তিনজন ওর কাছে যেতেই বললে, 'বিদেশি ঢং-এ তৈরি বাড়িটা। পুরোনো হলেও দেখতে বেশ।' একটা জানালা খোলা দেখে অয়ন-কুণাল সেদিকে গেল। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েই চমকে উঠল — একটা বুনো খরগোশ ওদের দেখে উলটো দিকে ছুট। ঈশা ও দোয়েল এসে দেখল ওটা হাওয়া। আর তখনই সবাইকে চমকে দিয়ে ময়ূরের ডাক—'পিঁয়াও'। কোথায় বসে সে ডাকছে? ওদের নিরাশ হতে হল না। কাছের এক ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে, ওদের দেখা দিয়ে দূরের এক ঝোপে আড়াল হল সে। পুরোনো বাংলো, ভেতরে খরগোশের আস্তানা। পাশের ঝোপে ময়ূর, পথের ধারে সারি দেওয়া গুঁড়ি—বেশ গা ছমছম করা জায়গা। এমন করে দোয়েলই বলতে পারে। নিঁখুত বর্ণনা। ঈশা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিল। একটা নীল ফুলে ডাল ভরা গাছের দিকে তার নজর আটকে গেল।

গাছটি ছিল বাংলো বাড়িটার পশ্চিম ধারে। ঘন সবুজ ঝিরঝিরে পাতায় ছাওয়া। ফার্ণ বা পর্ণাঙ্গ গাছের পাতার মতো। ডালের ডগায় গুচ্ছ গুচ্ছ নীল ফুল। সঙ্গীদের ডেকে এনে গাছটি দেখিয়ে ঈশা বললে, 'কী নাম এটার?' এত বড়ো গাছ, তাতে অমন নীল ফুল। কিন্তু কারও মনে পড়েও পড়ছে না কী নাম গাছটির। পশ্চিমে গাছটি দেখেছে। কিন্তু এ-বাংলায় এই প্রথম দেখা। তবে কি এটা জাকারান্ডা—কুণালের বিশ্বাস। 'রাইট,' অয়ন বললে, 'গাছটি যদিও ব্রাজিলের, ওটার দেশি নাম নীল গুলমোহর। মনে পড়েছে। ফুল ফোটার আগে পাতা ঝরে যায়।' দোয়েল বললে, 'তাহলে এই গাছটির আর একটা নাম জানি—ফল যখন পেকে শুকিয়ে যায়, তামা-রং হয়ে ঝরে পড়ে। তাই হয়তো পশ্চিমে ওটাকে বলে তামাঝুরি।' তবে আর কী, গাছ তো চেনা হল। এবার চলো দামোদরের বালুতীরে।

আবার নীচে নামা অসমতল জমিতে। ছোটো ধানের খেতে। তার পাশ দিয়ে এসে পৌঁছল নদীর বাঁধের কাছে। কষ্ট করে বাঁধের উপর উঠতেই দামোদরের ঝিকিমিকি জল দেখে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই কিছুক্ষণ। দূরে ছায়া ছায়া পুরুলিয়ার নীল পাহাড় দাঁড়িয়ে। বাঁধের নীচে ওদের পায়ের কাছ থেকে শুরু হয়েছে নদের চওড়া বালুতীর। তাতে অসংখ্য নুড়ি বিছানো। সকলের নজর গেল সেদিকে। তার কাছে যাবার আগে একটু বসে নিল গাছের ছায়ায়। বসে বসে দুপুরের নাস্তা। আর কথা। আশ্চর্যের কথা, ওপারে বালুতীর সমতল। সবুজ ঘাসে ঢাকা। এপাড়ে গড়ানে ঢাল, নুড়ি ছড়ানো। নুড়ি পাথর কুড়িয়ে ওরা কী করবে? দোয়েলের মতে, পাথর দেখে বিজ্ঞানীরাই তার নাম ঠিক করবে। আমরা তাদের অনুকরণে কিছু করতে পারি। আমরা প্রকৃতি-পড়ুয়া।

আমরা নুড়ি-পাথরের রং, গড়ন, ওজন, গন্ধ এই লক্ষণ গুণে দেখতে পারি। শিখতে পারি নতুন কিছু দেখে দেখে। বালুতীর ঢুঁড়ে অনেক কাল আগের অনেক নমুনাও পেয়ে যেতে পারি। তাহলে, আলোচনার শেষে কুণাল বললে,

'দু-এক টুকরো নুড়ি পাথর ভেঙে দেখতে হবে ভেতরটা কেমন। জলে ভিজিয়ে কোনও গন্ধ পাওয়া যায় কি না বুঝতে হবে। আর সবাই ভিন্ন ভিন্ন রকমের নমুনা কুড়োব। এক রকমের একটাই একজনের কাছে থাকবে। বোঝা বাড়াতে চাই না। চলো নামি।' বলে সবাই বাঁধ থেকে বালুতীরে নামল।

চোখ ধাঁধানো দুপুর রোদে, বালুতীরে, নুড়ি পাথর খোঁজা আরামের কাজ নয়। কাজটা সহজে করতে চার জন বালুতীরটা চার ভাগ করে নিল কল্পনায়। তারপর ছড়িয়ে গেল যে যার পথ ধরে। ধীর পায়ে মাটিতে নজর রেখে রেখে নমুনার রং-গড়ন দেখে ঝোলায় ভরে নিল কুড়োনো পছন্দের জিনিস। এমন করে চলতে চলতে নদের ধারে পৌঁছে গেল এক সময়। তখন জুতো খুলে জলে পা ভিজিয়ে, ঝোলার পাথর বের করে ধুয়ে, ফের ঝোলায় ভরে তৈরি হল। সবুজ ছায়া ঢাকা তাদের সাময়িক আস্তানায় ফিরে যেতে। এবার একটু অন্য পথে। যদি নতুন নমুনা পেয়ে যায়, এই আশায়। অনেকটা সময় গেছে এই করে। ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, রোদে তপ্ত মুখ নিয়ে উঁচু সবুজ ডাঙায় উঠে এসে বসল একে একে। এবার নমুনা বাছাই আর তা নিয়ে আলোচনা।

ভূ-বিজ্ঞানী নয় তারা। তারা প্রকৃতি-পড়ুয়া। শুরুতেই বুঝে গেছে, যা-কিছু নমুনা তারা পেয়েছে তা নদে বয়ে এনেছে। হাজার কোটি বছর ধরে নদের জলে থিতিয়ে পড়া পলি পাথরের নমুনা তাদের ঝোলায়। সেগুলো মাটিতে ঢেলে সাজিয়ে নেবার পর বিস্ময়ের পালা।

কোন পাথরের কী নাম, সে কথা বলবেন ভূ-বিজ্ঞানীরা। তারা জানে না। তবে, কোনও নুড়ি-পাথরের গায়ে স্তরের পর স্তর জমার চিহ্ন তাদের চোখ এড়ায়নি। পলি থিতিয়ে পাথর হয়েছে। নদের স্রোতে সে পাথরের খণ্ড গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এসেছে এখানে। তাতে মসৃণ হয়েছে তার গা, তা বোঝা কঠিন নয়। ভিন্ন ভিন্ন রং ধরা পড়েছে তাদের চোখে নানা নুড়িখণ্ডে। একটি স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো, প্রায় গোল বিশেষ নুড়ি ঈশার বিশেষ পাওয়া। কুণাল তার পাওয়া একটি ভাঙা নুড়ির ভেতরটা দেখাল। সেটা বালুকণায় ঝিকমিক করছে। অয়ন দেখাল বিশেষ কয়েকটি নুড়ি, যার গায়ে গভীর ভাবে সেঁটে শামুকের খোল। সব শেষে দেখাল দোয়েল, তার পাওয়া একটা বড়ো নুড়ি, যার গায়ে অসংখ্য ছোটো ছোটো নানা রঙের, নানা গড়নের, টুকরো পাথর জড়িয়ে রয়েছে। সে ওটার নাম দিয়েছে 'মিশেল'।

শ-খানেক নুড়ি থেকে বিস্তর বাছাবাছি করে, সেগুলোই সঙ্গে নিলে যেগুলোর কোনও বিশেষত্ব রয়েছে। বাকিগুলো বালুতীরেই ছড়িয়ে দিয়ে, ঝোলা পিঠে ফেরার জন্য সেদিকে গেল যেদিকে ছোট্ট স্টেশন দামোদর।

শেষ কথার আগে এ-যাত্রায় প্রকৃতি-পড়ুয়াদের পরিচয় :

দোয়েল—ইতিহাসের অধ্যাপক হয়েছে,

অয়ন—হয়েছে বিদ্যুৎ যন্ত্রবিদ,

কুণাল—বৈদ্যুতিন যন্ত্রবিদ

আর *ঈশা—জনপালন শাসনের দায়িত্বে রয়েছে এক মহকুমায়।*

ছবি: রাহুল মজুমদার

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে সম্মানিত শ্যামল চক্রবর্তী

বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখকের অতি ক্ষুদ্র লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক শ্যামল চক্রবর্তী বিজ্ঞানে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। এ-বছর জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে (২৮শে ফেব্রুয়ারি) দিল্লীতে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বিজ্ঞান চর্চায় সামগ্রিক অবদানের জন্য শ্রী চক্রবর্তীকে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করেছে (National Award for Outstanding Efforts in Science & Technological Communication through Print Media including Books and Magazine)। বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ে অজস্র গ্রন্থ রচনা করেছেন শ্যামল চক্রবর্তী। সন্দেশ সহ বহু সাময়িক পত্রপত্রিকাতে নিয়মিত লেখেন তিনি। সন্দেশীদের তরফে রইল ওঁর জন্য অভিনন্দন।

প্রবাল সেন

বই চেনো

মহাকাশের মৃত্যুদূত

লেখক : রাজেশ বসু
প্রকাশক : পারুল প্রকাশনী
দাম : ১২৫ টাকা

বছর সাতেক আগে 'সন্দেশ'-এর পাতায় (বর্ষা সংখ্যা ১৪১২) এক নতুন লেখকের জীবনের প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। '৩১ ইলিয়ট স্ট্রিট' নামের ওই গল্পটির লেখক ছিলেন রাজেশ বসু। আবির্ভাবেই ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন রাজেশ। দারুণ সাড়া জাগিয়ে ছিল তাঁর সেই গল্পটি। পরের সাত বছরে বাংলার প্রায় সব কিশোরপত্রিকায় (বড়োদের জন্যও লেখেন রাজেশ) প্রচুর গল্প-উপন্যাস লিখে রাজেশ এখন কিশোরসাহিত্যের সাড়া-জাগানো নাম। গত বছর উপেন্দ্রকিশোর স্মৃতি পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। কিশোরসাহিত্যের সব ধরণের শাখাতেই রাজেশের অবাধ বিচরণ। ভূতের গল্প, রহস্য গোয়েন্দা, কল্পবিজ্ঞান...ইত্যাদি। সম্প্রতি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে ওপরে উল্লেখিত ওঁর দুটি বই।

'মহাকাশের মৃত্যুদূত' গ্রন্থে রয়েছে তিনটি কাহিনি। প্রথম দুটি কাহিনি 'মহাকাশের মৃত্যুদূ' ও 'মমি রহস্য'—প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশেই। তৃতীয় কাহিনি ইন্যুয়িতের দেশে সরাসরি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

তিনটি কল্পবিজ্ঞানের কাহিনির ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি। প্রথম কাহিনিতে চারজন মহাকাশচারী এবং একটি মানবেতর প্রাণী মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিশোর উপযোগী কাহিনির শর্ত অনুসরণ করে তারা সফল অভিযানের শেষে পৃথিবীতে ফিরে আসে। যদিও ভয়ংকর শত্রুর মোকাবিলা করতে হয় ওদের। এইখানে বড়ো ভূমিকা নেয় মানবেতর প্রাণীটি। লেখক এই প্রাণীটির ক্ষেত্রে কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিশিয়েছেন রূপকথাকে। যদিও সেই রহস্যটি ফাঁস হয় গল্পের শেষদিকে। 'মমি রহস্য'তেও কল্পবিজ্ঞান অলৌকিক রহস্য মিলেমিশে জমিয়ে তুলেছে কাহিনির গতি। তৃতীয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সমস্যা দিয়ে কাহিনি শুরু হলেও ঘটনা মোড় নেয় নতুন দিকে।

সেন্ট রহস্য ও গোমসসাহেবের হত্যা রহস্য

লেখক : রাজেশ বসু
প্রকাশক :
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ
দাম : ১০০ টাকা

রাজেশের লেখার মূল আকর্ষণ তাঁর ভাষা—ঝরঝরে-ঝকঝকে 'স্মার্ট' ভাষায় গল্প এগিয়ে চলে তরতরিয়ে। আর কাহিনিগুলি কল্পবিজ্ঞানের হলেও বিজ্ঞানের ছোঁয়া রয়েছে প্রবলভাবেই।

বিখ্যাত শিল্পী সমীর সরকারের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ অসাধারণ। তবে রূপকথার যে-চরিত্রটি লেখক রহস্যাবৃত রেখেছিলেন, শিল্পী সেটি প্রচ্ছদে না-দিলেই বোধহয় ভালো হত।

'সেন্ট রহস্য' ও 'গোমস সাহেবের হত্যা রহস্য', এই দুটি গোয়েন্দা কাহিনি নিয়েই দ্বিতীয় গ্রন্থটি, অনেকটা ফেলুদা এবং তোপসের আদলেই তৈরি সন্দর্শন রায় ওরফে ইন্দ্রদা এবং টুকান। 'আনন্দমেলা'য় প্রকাশিত 'সেন্ট রহস্য' উপন্যাসটিতে সত্যজিতের লেখনীর প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট। লেখকজীবনের শুরুতে সত্যজিতভক্ত রাজেশের লেখনীতেও যেন রয়েছে সত্যজিতের অদৃশ্য ছোঁয়া। ব্যাপারটি অস্বীকার করেননি রাজেশও। কিন্তু পরবর্তী দিনের রাজেশ স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। 'সেন্ট রহস্য'র বেশ কয়েক বছর পর রাজেশ লিখেছিলেন 'গোমস সাহেবের হত্যা রহস্য'। প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিক ভাবে 'সন্দেশ'-এর পাতায়। দুটি কাহিনীই জমজমাট রহস্যের। জটিল রহস্য পাকিয়ে তোলা এবং এক এক করে রহস্যের জাল উন্মোচনে সফল লেখক। কাহিনির গতি অত্যন্ত দ্রুত, সঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য, ঝরঝরে ভাষা। ইন্দ্রদা পেশায় ডাক্তার হবার দরুন বাড়তি পাওনা ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছু আকর্ষণীয় তথ্য যেগুলি এসেছে কাহিনীর স্বার্থেই।

সব মিলিয়ে বলা যায় ডাক্তারি এবং গোয়েন্দাগিরি—দুটো পেশাতেই ইন্দ্রদার পসার জমবে ভালোই।

বাহনের বায়নাক্কা

লেখক : দীপান্বিতা রায়
প্রকাশক : পারুল প্রকাশনী
দাম : ৬০ টাকা

কয়েক বছর আগের কথা। সন্দেশের শারদীয়া সংখ্যায় লেখার জন্য নবনীতা দেবসেনের কাছে গিয়েছিল এক সন্দেশী। নিজের লেখাটির সঙ্গে নবনীতাদি আর একটা লেখাও দিয়েছিলেন সেই সন্দেশীর হাতে। নতুল লেখিকা দীপান্বিতা রায়ের একটা গল্প। লেখাটা দেওয়ার সময় নবনীতাদি বলেছিলেন, 'তোমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরকে বোলো লেখাটা পড়ে দেখতে। খুব ভালো রূপকথা লিখেছে দীপান্বিতা, আমার চেয়েও ভালো লিখেছে।'

সেই গল্পটি-ই খুব সম্ভবত দীপান্বিতা রায়ের প্রথম গল্প। পরবর্তী কয়েক বছরে লেখিকা নবনীতা দেবসেনের বক্তব্যের মর্যাদা রেখেছেন। অল্প কয়েক বছরেই শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছোটো বড়ো গল্প লিখে ছোটোদের মন কেড়ে নিয়েছেন তিনি। প্রকাশিত হয়েছে একাধিক গ্রন্থও। শুধু রূপকথাই নয়, সবধরণের লেখাই লিখছেন তিনি। আলোচ্য গ্রন্থটি অবশ্য রূপকথা বা বলা ভালো অপরূপকথারই সামিল।

বাহনের বায়নাক্কা গল্পে রয়েছে মোট ছয়-টি গল্প। আলাদা গল্প হলেও একসুরে বাঁধা রয়েছে সবকটি গল্প। শিব, দুর্গা এবং তাঁর চার ছেলেমেয়েদের বাহন কারা তা আমরা সবাই জানি। লেখিকা এখানে শুনিয়েছেন সিংহ, ষাঁড়, ইঁদুর, প্যাঁচা, ময়ূর আর হাঁস কী করে ওই দেবদেবীদের বাহন হল। একটু বোধহয় ভুল বলা হল, লেখিকার কলমে ওরা কিন্তু দেবদেবী নয়, ঠিক আমাদের নিজেদের লোক। গণেশ লুকিয়ে ভাঁড়ারঘর থেকে খাবার চুরি করে, কার্তিক পাঠশালায় গিয়ে দুষ্টুমি করে, লক্ষ্মীর রঙিন শাড়ির শখ, সরস্বতীর রোজ রোজ পড়াশোনা করতে বিরক্তি আসে ইত্যাদি—গল্পগুলি পড়তে পড়তে মনে ভালো হয়ে যায়। খুব ছোটোদের যেমন এই গল্পগুলি পড়তে বা শুনতে ভালো লাগবে, বড়োরাও তেমনই মজা পাবে প্রত্যেকটি গল্পে।

—গ্রন্থবিমুখ গোস্বামী

With best Compliments

from

A
WELL
WISHER

বার্ষিক সূচি

তৃতীয় পর্যায়

মে ২০১২ - এপ্রিল ২০১৩ ● বৈশাখ ১৪১৯ - চৈত্র ১৪১৯

● বৈ : বৈশাখ (নববর্ষ সংখ্যা) ● শা : শারদীয়া সংখ্যা ● ব : বইমেলা সংখ্যা

বিশেষ আকর্ষণ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আঁকা চাররঙা ছবি / শা-৩০৪
ছোটদের বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / পিনাকী ঠাকুর ব-৯
জাদু সম্রাট / অমিতাভ চৌধুরি ব-৩
বোনবিবি / শানু লাহিড়ী ব-২৬
'যাদুসম্রাট'/ পি. সি. সরকার (জুনিয়র) ব- ৪

বিভাগীয়

চিঠিপত্র ব-৯৬
নববর্ষের চিঠি বৈ-৪
পুজোর চিঠি শা-৮৮
বইমেলার চিঠি ব-১৪
বইচেনো ব-৮৯
হাতপাকাবার আসল শা-২৯৫

লিয়র ২০০

আজগুবি গল্প / গৌর বৈরাগী শা-১২৭
এক যে রাজা/ সুনীল জানা শা-১২১
কোন গ্রহের প্রভাব/ পবিত্র সরকার শা-১২০
মাঠ চোর / সুখেন্দু মজুমদার শা-১২০
লিয়রের লিমেরিক /
অশোককুমার মিত্র, শৈলশেখর মিত্র শা-১১৪
লিয়রসাহেব বড়ই মজার / প্রণব মুখোপাধ্যায় শা-১১৫
লিয়রের লিমেরিক / রতনতনু ঘাটী শা-১২০
লিমেরিক / রূপক চট্টরাজ শা-১২৬
লড়াই / অপূর্ব দত্ত শা-১২৬
সমব্যথী / চন্দন নাথ শা-১২৬

শঙ্কু ৫০ +

শঙ্কুর ধাঁচ, লিমেরিক পাঁচ/ভবানীপ্রসাদ মজুমদার বৈ ৩
শঙ্কু পর্দায় আসবেই / সন্দীপ রায় বৈ ৫

সুকুমার ১২৫

সুকুমার রায়-এক আশ্চর্য্য শিল্পী / দেবাশিষ দেব শা - ২২৯

সন্দেশ ১০০

কাগজের সন্দেশ-অন্য পাঠশালা /শুভেন্দু দাশমুন্সী শা ১৮

ধারাবাহিক উপন্যাস

নীল পাথর / শুভ্র দত্ত বৈ ৭৫, শা - ৫৭, ব-৩৪
পেন ড্রাইভ রহস্য/অনির্বাণ বসু শা--২২২, ব- ৫৫
বুরুন্ডির সবুজ মানুষ /
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত বৈ ২৯, শা- ৯৫, ব-১৫

উপন্যাস

অর্কিড রহস্য/ সৈকত মুখোপাধ্যায় শা- ২৪
মেজদার গপ্তধন/দীপঙ্কর বিশ্বাস শা--১৭৫
রাজলক্ষণ/ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য শা- ১৩৪

কল্পবিজ্ঞান

ওই আকাশে / সলিল বিশ্বাস বৈ ৭
"কল্পবিজ্ঞান প্রতিশব্দটি আমারই সৃষ্টি"/
অদ্রীশ বর্ধন বৈ-১৫
গজুমামার বেড়াল / ভাস্কর দত্ত বৈ -১১০
ঠিক সকাল ৯টায় / অমিতানন্দ দাশ বৈ-১৩৭
পলাতকের প্রার্থনা / সৈকত মুখোপাধ্যায় বৈ- ৯৭
যন্ত্রের ষড়যন্ত্র / তাপস মৌলিক বৈ-১০৮
রোমান যুগে কিছুক্ষণ / রাজেশ বসু বৈ- ৯১

গল্প

অলক্ষ্যে হাসে মহাকাল /স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় শা-৬৯

আয়রে পাখি লেজঝোলা/ উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় ব-৭৯
আয় আয় টিয়ে / লায়লী দাশ শা-২৫৬
কাকস্য বেদনা/ তাপস মৌলিক ব- ৮৫
কেউই তুচ্ছ নয়/ অনন্যা দাশ বৈ-৪৮
কুমায়ুনের দেবতার জন্মকথা/ সঞ্জয় কর্মকার বৈ-৪৫
কুসংস্কার / অনন্যা দাশ শা-২৭৮
খোলা জানালা / অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী বৈ-১৭
গগনবাবুর কপাল / শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য শা-৮৯
গভীর রাতের রিক্সা / নন্দিতা সেনগুপ্ত শা-২৮৬
চঞ্চুমামা / লায়লী দাশ বৈ-১০৩
চাঁদির টাকা / সুনির্মল চক্রবর্তী ব-৯১
ছায়াবতী / সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ব - ৯৩
ছুঁচোদের গান / সুনন্দা রায়চৌধুরী শা-২১৬
ট্রফি জিততে হলে / প্রসাদরঞ্জন রায় শা-১৬৩
ডাকবাংলোর অন্ধকারে / ইন্দ্রনীল সান্যাল শা-২৬২
ডাস্টবিন / ইন্দ্রানী চক্রবর্তী বৈ-৬০
নতুন জামা / ভাস্কর দত্ত শা-২৮২
নতুন বছরের প্রতিজ্ঞা/ শিবানী রায়চৌধুরী বৈ-১২০
নতুন গাঁয়ের বিশে ঠাকুর/ দেবদত্ত ঘোষাল বৈ-৪১
নিষ্কৃতি / মঞ্জিল সেন শা-১৪
পরমায়ু / চম্পক সৌরভ শা-১৯৪
পাইন সিগন্যাল / সুকুমার রুজ বৈ-১৩০
বসজ্যেঠু / কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বৈ-২৩
বদুবাবুর বেল / সলিল চট্টোপাধ্যায় শা-১৪৭
বইয়ের গুঁতো / রমেন গাঙ্গুলী শা-১৬৮
বিষ্টিবিষ্টি, চাঁপাফুল আর তিন্নি /
নবনীতা দেবসেন শা-১০
ব্ল্যাক ফ্রাইডে / দীপক মুখোপাধ্যায় ব-৩০
ভূতের অটোগ্রাফ / যশোধরা রায়চৌধুরী শা-৪১
ভূত মানেই চান্স / অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী শা-২৪২
মশগুল / শিবানী রায়চৌধুরী শা-২০১
মামাবাড়ির গল্প / অরুণিমা রায়চৌধুরী শা-১০১
মাদুরদহের ঈল/ শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য বৈ-৫৫
মিষ্টির দুষ্টুমি / দীপান্বিতা রায় বৈ-১৪১
ম্যাঙ্গো ট্রি / স্বাতী চট্টোপাধ্যায় ব-৫১
মেসি, রোনাল্ডো আর শরৎশশী স্মৃতি ফাইনাল/
দেবাশিস সেন ব-৭১
মৌমাছিদের নাচ / দীপান্বিতা রায় শা-১৫৩
লালকমল / সুনেত্রা ঘটক শা-৫০
লাস্ট প্যাসেঞ্জার / শিশির বিশ্বাস শা-৭৪
লোলো ডাকাত / সঞ্জয় সাহানা ব- ৮২
সেই ছেলেটা / রাজেশ বসু শা-১০৮
হাতির চশমা / বলরাম বসাক শা-২০

প্রবন্ধ ফিচার

অজানা কথা / অশোক বেরা বৈ-৫১
আমিও একজন সন্দেশী /অনীক দত্ত শা-৪৬
উটের সঙ্গে ওঠা বসা/ প্রসাদরঞ্জন রায় ব-১০
ইউরোপের রেলগাড়ি /অমিতানন্দ দাশ শা-২৩৩
কাননে কুসুলকলি.../কিন্নর রায় শা-২১৮
ক্রিকেট, চায়ের জল আর আকাশভরা সূর্য-তারা /
আশীষ লাহিড়ী শা-১৫১
জঙ্গলে ছবি তোলা /সব্যসাচী চক্রবর্তী শা-৭৮
পিসার টাওয়ার কি হেলেই থাকবে? /
মনোজ ঘোষ ব-৪৬
ফ্যান্টম্, আমাদের অরণ্যদেব/ দেবাশিস সেন বৈ-১৫০
ব্ল্যাক ডেথ/বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শা-১৯৭
বাঙলায় নারী প্রগতির পথিকৃৎ / রমেন গাঙ্গুলী বৈ-১১৫
বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেলেন মঞ্জিল সেন /
প্রবাল সেন বৈ-১২
মারিও মিরান্ডার মজার জগত/
বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় শা-২৪৬
মৌটুসী খুব খুশি / ধীরা পালিত ব-৪৮
রবিকথা ও জোড়াসাঁকোর ইতিকথা /
অমলেন্দু মিত্র বৈ-১২৫
রাণীদি /অমিতাভ চৌধুরী শা-৮৫
শীতলতম তাপমাত্রার খোঁজে /রাকা দাশগুপ্ত শা-২৬৮
সার্ভেটাসের পাঁচশো বছর/শ্যামল চক্রবর্তী শা-১৯০
হাইফেন /দেবাশিস সেন শা-২৭৫
হাসির কথা/ প্রসাদরঞ্জন রায় বৈ-১০

ছড়া কবিতা

আঁকন বাঁকন / শৈলেনকুমার দত্ত ব-৭৮
আসবে সুদিন স্বপ্ন রঙিন /ভবানীপ্রসাদ মজুমদার শা-৭৩
একলা পাখির গান /রাখাল বিশ্বাস শা-২১১
গাঁয়ের কথা / বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী ব-২৯
গ্রাম মানে তো/ পার্থ বসু বৈ-১৩
গুলঞ্চ ভোর/হান্নান আহসান শা-২৭৩

ঘটমপুরে/ বিদ্যুৎ ভৌমিক বৈ-৭৪
চতুর্দোলা /সোমনাথ চক্রবর্তী শা-২৭৭
চায়ের মজা / শ্রীকর নন্দী বৈ-২২
জন্ম বিষয়ে /সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শা-২৩
জাদু বাস্তবতা / শান্তি সিংহ ব-৭৭
টাপুরটুপুর/দীপ মুখোপাধ্যায় শা-২৪৫
ডাকঘর /সরল দে শা-২৪৫
তালেগোলে / সংঘমিত্রা কর ব-৫৪
দুইবন্ধু / অমলকান্তি ঘোষ ব-৫৪
দুখু মিঞা /রঞ্জন প্রসাদ শা-২৩
নতুন খেলনা লিখতে পারি /পিনাকী ঠাকুর শা-১৫০
নির্দোষ/ শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ব-৭৭
নির্ভীক /শঙ্খ ঘোষ শা-১৬
পরী মন্তর / অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় বৈ-৭৪
পুরনো রূপকথা /মন্দাক্রান্তা সেন শা-২৪০
পূর্ণ রেখো/ প্রণব মুখোপাধ্যায় বৈ-২২
প্রশ্ন /আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় শা-২১১
বদল / মহুয়া ভট্টাচার্য গোস্বামী ব-৭৮
বাজনা বাজে/ দেবাশিস বসু শা-২৭৩
ভোর আসুক/ অপূর্বকুমার কুণ্ডু শা-২৫৯
মহাকাশের বন্ধু /নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শা-৯
রবিশঙ্কর / প্রণব মুখোপাধ্যায় ব-৮
রূপান্তর / পার্থ সিন্‌হা ব-২৯
রূপকথা সব/আরণ্যক বসু শা-২৪০
লোকটি উঠেছে টঙে /শ্যামলকান্তি দাশ শা-১৫০
সবজি সফর / আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বৈ-১৩
সবুজ ঘাসের বনে / দীপ্তি দাশগুপ্ত শা-২৭৭
'হলদে-গুঁড়ি' পাখির ডাকে/শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় শা-২৫৯
হবে না বড়ো /মৃদুল দাশগুপ্ত শা-১০৭

নাটক

চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ/ স্যেমিত্র বসু শা-২৫০

ভ্রমণ

দ্রিঘাংচুর দেশে / চরকিবাজ শা-৫৫

খেলা

এবারের ছয় /বল বয় শা-২৬০
ওয়েস হলের মুখে সেই ম্যাচটি / আত্রেয় মুখোপাধ্যায় শা-১৬০
বৃষ্টিভেজা মারাদোনা, ঘামে ভেজা ভিভ / দেবাশিস দত্ত শা-২১০
ফ্রি কিকের আরেক নাম শৈলেন মান্না / বলবয় বৈ-১১৮
ভারতের ক্রিকেটের শেষ নবাব/ চিরঞ্জীব বৈ-৭১
মহাত্মা গান্ধী—ফুটবল হিরো /সুরজিৎ সেনগুপ্ত শা-৬৭
লেসলি ওয়াণ্টার ক্লডিয়াস / সুনন্দনকুমার সেন শা-১৫৮
শের-ই বাংলায় শচীনের শততম শতক/ থার্ড আম্পায়ার বৈ-১৪৬

কমিক্‌স্/কার্টুন

ঋণশোধ / ময়ূখ চৌধুরী বৈ-১৩৪
কার্টুন/অমল শা-৪৯
নন্দগুপীর মন্দ কপাল /দিলীপ দাশ শা-২১২
মাছধরা / ঋতুপর্ণ বসু ব-২৫

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

ঝড়ের পরে নদীর দ্বীপে / বল বয় শা-২৮৯
প্রকৃতি পড়ুয়াদের সঙ্গে দিনভর দাবুতে / জীবন সর্দার ব- ৮৭
রাঙামাটির বনপথে / অনির্বান রায় শা-২৯২
সুখচরে এক শীতে / জীবন সর্দার বৈ-১৫৭

ভালোমন্দ সন্দেশ / পাদপূরণ

প্রথম বাঙালী অলিম্পিয়ান / বল বয় শা-৯৪
থেমে গেল কর্নেলের অভিযান / প্রবাল সেন শা-১৬৭
রবীন্দ্র-উপেন্দ্র পুরস্কার দুই সন্দেশীর / প্রবাল সেন শা-১০৭
কল্পবিজ্ঞানের গল্প অল্প বৈ-৪৪, ৪৭, ৫০, ৭০ ব- ৪৫, ৬৯-৭৬

কুইজ

সুকুমার ১২৫/সুগত রায় শা-২৭২

সম্পাদক : সন্দীপ রায়
সন্দেশ কার্যালয়-১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০২৯ থেকে
স্বত্বাধিকারী : সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড

সোলার ফটোভোল্টিক ও থার্মাল সরঞ্জাম এবং বিকল্প জ্বালানী বায়োগ্যাস

সৌরলণ্ঠন

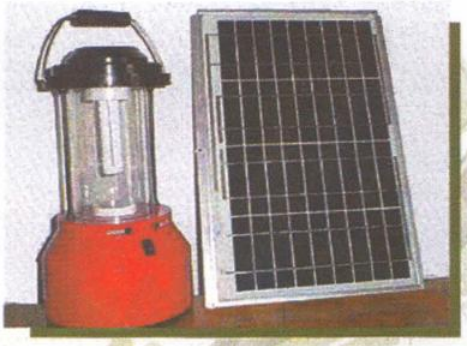

১২ ভোল্ট ৭ এ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি ১০ ওয়াট মডিউলে চার্জ হয়। সঙ্গে মোবাইল চার্জারও থাকবে।

সোলার হোম লাইটিং সিস্টেম

নানা মডেলের হোম লাইটিং সিস্টেম পাওয়া যায়, যা থেকে লাইট, পাখা, টিভি ইত্যাদি চালানো যায়।

সোলার ওয়াটার হিটিং সিস্টেম

সোলার কুকারে
রান্না করুন
বাঁচবে
জ্বালানীর খরচ
অক্ষুণ্ণ থাকবে
নির্মল পরিবেশ

সোলার কুকার

বিকল্প জ্বালানী বায়োগ্যাস

এলাকা	সিস্টেমের ক্ষমতা	খরচ	ভর্তুকির পরিমান
দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকা এবং সুন্দরবন অঞ্চল	১ ঘনমিটার	১০,০০০/- থেকে ১২,০০০/-	৪,০০০/-
ঐ	২ ঘনমিটার	২০,০০০/- থেকে ২৪,০০০/-	১০,০০০/-
অন্যান্য এলাকায়	১ ঘনমিটার	৮,০০০/- থেকে ১০,০০০/-	৪,০০০/-
ঐ	২ ঘনমিটার	১৬,০০০/- থেকে ২০,০০০/-	৮,০০০/-

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ সিস্টেম,তাদের দাম ও ভর্তুকীর পরিমান

সিস্টেম	কার্যকারিতা	দাম(টাকা)	ভর্তুকীর পরিমান (টাকা)
সৌরলণ্ঠন	প্রতিদিন ৪/৫ ঘন্টা আলো পাওয়া যায়	২১৭৮/-	৫০০/-
সৌর হোম লাইটিং সিস্টেম	প্রতিদিন ৪/৫ ঘন্টা আলো, পাখা, টিভি চালানো যায়।	২৭০/- প্রতি ওয়াটপিক্	সিস্টেমের দামের ৩০ শতাংশ
সৌর পথ আলোক ব্যবস্থা	প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে ভোর পর্যন্ত আলো পাওয়া যায়।	২০,০০০/-	৯৬০০/-
সৌর গরম জল ব্যবস্থা	প্রতিদিন ১০০ লিটার গরম জল পাওয়া যায়।	২৩,৩৫০/-	৫০০০/-
সোলার কুকার	৮-১০ জনের জন্য যেকোন রান্না ৩০/৪০ মিনিটে করা যায়।	৫০০০/-	৫০০/-
ব্যাটারী চালিত বাইক	সরকার নানারকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন।		

সাবসিডি এবং স্কিম সময়ে সময়ে বদলে যায় সঠিক এবং সাম্প্রতিকতম তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট দেখুন ঃ এবং ভর্তুকীর অনুমোদন পাওয়ার আগেই সিস্টেম বসিয়ে/কিনে নিলে; ভর্তুকী পাওয়া যাবে না।

সরকারী অনুদানপ্রাপ্তির নিয়মাবলী, যাবতীয় কারিগরী তথ্যাদি ও বিশদ অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা

জে-১/১০, ইপি ও জিপি ব্লক, সেক্টর-৫ সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১, ফোন ঃ ০৩৩-২৩৫৭-৫০৩৮ / ৫৩৪৮ / ৬৫৬৯

R.N.I. 12007 / 64 SANDESH May-2013 Rs. 30/-

With Best Compliments

Since 1760
Lewis
Berger
Paint your imagination

BERGER PAINTS INDIA LIMITED

Berger House, 129 Park Street, Kolkata 700 017
Phone : 2229 9724-28, 2229 6005-06 Fax : 91-33-2249 9009 / 9729
www.bergerpaints.com